
BOIGHAR.COM
সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
পাতকিনী
কাজী আনোয়ার হোসেন
BOIGHAR

মাসুদ রানা

পাতকিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

কাছে-পিঠে প্রমোদতরী নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছিল ওরা, ভয়ানক ভূমিকম্পের খবর পেয়েই ত্রাণ নিয়ে ছুটে গেল মেক্সিকোর দুর্গম এক পার্বত্য এলাকায়। ওখানে আকস্মিকভাবেই পেয়ে গেল মায়ান এক রাজপুরুষের মামি আর মহামূল্যবান মায়ান কোডেক্স। চুরি-ডাকাতি এড়িয়ে চলে এল রানা-সোহানা যুক্তরাষ্ট্রে। খবরটা জানাজানি হতেই শুরু হয়ে গেল জটিল খেলা। লোভী এক ব্রিটিশ যুবতীর ওটা চাই-ই চাই। যেমন করে হোক। কিন্তু রানা-সোহানা ওকে দেবে না কিছুতেই। হারিয়ে যাওয়া বিপুল মায়ান ঐশ্বর্যের লোভে কৌশলে কব্জা করে নিল মেয়েটা ওই দুষ্প্রাপ্য বইটি। এখন প্রতিযোগিতা রানা-সোহানা ও এলেনা হিউবার্টের মধ্যে। ওই কালনাগিনী শেষ করে দেবে ওদেরকে, নাকি ওরাই দেখিয়ে দেবে তাকে সাপের পাঁচ পা? দেখা যাক কী হয়! তবে, প্রিয় পাঠক, সেটা জানতে হলে যেতে হবে আপনাকে সুদূর গুয়াতেমালায়!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ৪৩৮

পাতকিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7438-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০১৫

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়াব হোসেন
সেগুনবাগান
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-438
PATOKINEE
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

একশ' বত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক *পার্শিয়ান ট্রেজার*বাউন্টি হান্টার্স*মৃত্যুদ্বীপ*জাপানি টাইকুন।

এক

নিশুতি রাত।

মোমবাতির হলদে কাঁপা আলোয় চুপচাপ বসে কাজ করছেন ফ্রায়ার বার্তোলোমে দে লাস কাসাস।

র‍্যাবিনাল অঞ্চলের মায়ান মিশন।

গুয়াতেমালা, পনেরো শ' সাঁইত্রিশ সাল।

প্রতিরাতের মতই আজও বিশপ ম্যারোকুইনের উদ্দেশে রোজনামচা লিপিবদ্ধ করছেন ফ্রায়ার কাসাস। গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় যাতে বাদ না পড়ে, তাই নিখুঁত শব্দ বাছাই করে সাদা পার্চমেণ্ট কাগজের বুকে কালো কালিতে তুলে ধরছেন কেমন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে গুয়াতেমালার ডোমিনিকান মিশনগুলো।

কিছুক্ষণ পর লেখা শেষ করলেন কাসাস, গা থেকে খুলে ফেললেন কালো আলখেল্লা, উঠে গিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন ওটা দরজার পেরেকে। কয়েক মুহূর্ত ওখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলেন নিঝুম রাতের আওয়াজ। পাখি ও পোকামাকড়ের মৃদু শব্দ জঙ্গলে, এ ছাড়া থমথম করছে চারপাশ।

এগিয়ে গিয়ে এক দেয়ালে বসানো কাঠের কেবিনেটের সামনে থামলেন লাস কাসাস, ওটা থেকে বের করলেন নির্দিষ্ট বইটি। রাজবংশীয়, প্রাজ্ঞ লোক চুকুলমান, তাঁর কাছ থেকেই এসেছে মূল্যবান এই বই। এ ছাড়াও আরও দুটি বই লাস কাসাসকে দিয়েছেন তিনি।

বইটি টেবিলের উপর রাখলেন লাস কাসাস। কয়েক মাস হলো ওটা নিয়ে কাজ করছেন। আর আজ কপি করবেন সবচেয়ে জরুরি অংশ। টেবিলে পার্চমেন্ট কাগজ রেখে চেয়ারে বসে খুললেন চমকপ্রদ বইটি।

নির্দিষ্ট পাতা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেখানে আঁকা হয়েছে ভয়ঙ্কর দর্শন মানুষ আকৃতির ছয়টি জন্তু। প্রতিটি জন্তু বামদিকের ছয়টি পিলারের দিকে চেয়ে আছে। এসব পিলারের বুকে কালো কালিতে লেখা জটিল সব সিম্বল। সর্দার চুকুলমান জানিয়েছেন, ওগুলো তাঁদের লিখিত মায়ান ভাষা। এ ছাড়া পাতাটি ধবধবে সাদা, আর জন্তু, দানব বা দেবতাদের ছবি আঁকা হয়েছে লাল, সবুজ, হলুদ ও নীল বর্ণে।

পালকের কলমের নিব অত্যন্ত তীক্ষ্ণ করেছেন কাসাস, ছয়টি পিলারের মত করে ভাগ করেছেন তাঁর পার্চমেণ্ট— এবার পূর্ণ মনোযোগ দিলেন সিম্বলগুলোয়। কাজটা খুবই কঠিন, যাতে কোনও ভুল না হয়, সেজন্য সতর্ক আছেন। নানা কারণেই তাঁর ধারণা হয়েছে: ডোমিনিকান চার্চের যাজক হিসাবে এসব বইয়ের প্রতিলিপি তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি জানেন না, কী বোঝানো হয়েছে এসব সিম্বলে, বা পৌরাণিক দানব অথবা দেবতার নামই বা কী— কিন্তু বুঝতে পারছেন, এসবের ভিতর লুকিয়ে আছে গভীর জ্ঞানের কথা। নতুন এ দেশের ধর্মান্তরিত মানুষগুলোকে বা তাদের হৃদয়কে বুঝতে চাইলে ভবিষ্যতে এসব জ্ঞান কাজে আসবে চার্চের।

মিষ্টি ব্যবহার ও ধৈর্যের মাধ্যমে মায়ান ইণ্ডিয়ানদেরকে যিশুর ধর্মে আনবার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন লাস কাসাস। এ আসলে তাঁর প্রায়শ্চিত্তই বলা চলে। প্রথম যখন এদেশে এলেন, শান্তির বাণী প্রচারে আসেননি, হাতে ছিল উদ্যত তলোয়ার। পনেরো শ' দুই সালে গভর্নর নিকোলাস দে ওভাণ্ডোর সঙ্গে স্পেন

ত্যাগ করেন হিসপ্যানিওলার উদ্দেশে। দখল করে নেয়া নতুন এই বিশাল দেশের মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছিলেন তাঁরা। বিনা দ্বিধায় স্থানীয়দেরকে বাধ্য করেন ক্রীতদাসত্ব বরণ করতে। পনেরো শ' তেরো সালে, এক যুগ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কমেনি তাঁদের অত্যাচার। কিউবার ইণ্ডিয়ানদের গোটা দেশ কেড়ে নেয়ার সময়েও হামলাকারীদের সঙ্গেই যাজক হিসাবে ছিলেন, এবং লুটপাটের পর রাজকীয় পারিতোষিক হিসাবে পেয়েছিলেন প্রচুর জমি ও অসংখ্য ইণ্ডিয়ান ক্রীতদাস। অতীতের সেসব কথা ভাবলে আজও লজ্জায় মাথা নত হয় তাঁর, অসুস্থ বোধ করেন মানসিকভাবে।

প্রথম যখন অন্তরে উপলব্ধি করলেন, জড়িয়ে গেছেন মস্ত এক পাপের যজ্ঞে, তখন থেকেই বদলাতে শুরু করেছিলেন নিজেকে। আজও তাঁর মনে পড়ে পনেরো শ' চোদ্দ সালের সেই দিনটির কথা। ওই দিন ঘুরে দাঁড়িয়ে সোচ্চার হয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন: এ দেশে এসে যত পাপ করেছেন, সেজন্য তিনি মহান স্রষ্টার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, এবং আজই তাঁর ইণ্ডিয়ান ক্রীতদাসদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন গভর্নরের কাছে। সেদিনের কথা ভাবলে তাঁর মনে হয়, পুরনো কোনও পুড়ে যাওয়া ক্ষত স্পর্শ করছেন। এরপর আবারও জাহাজে চেপে স্পেনে ফিরেছিলেন, ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী মানুষের কাছে আকুল আবেদন করেছিলেন, যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয় অসহায় ইণ্ডিয়ানদের। তাও তো তেইশ বছর আগের কথা। তারপর থেকে একটি দিনের জন্য বিশ্রাম নেননি, নিজ লেখার মাধ্যমে চেয়েছেন প্রায়শ্চিত্ত করতে।

গভীর মনোযোগে কয়েক ঘণ্টা প্রতিলিপির কাজ করলেন কাসাস। এর ফলে শেষ হলো মাত্র একটি পৃষ্ঠার ছবি ও লেখা। পার্চমেন্ট পাতাটা নিয়ে গেলেন সারমনের বাক্সের সামনে, ঢাকনি খুলে ধর্মীয় বক্তৃতার কাগজগুলোর নীচে রেখে দিলেন আজকের

প্রতিলিপি।

তিনি ছোট্ট ঘরে নড়াচড়া করছেন, তাই কাঁপছে মোমবাতির হলদে শিখা। ফিরে এসে টেবিলের উপর আরেকটা নতুন পার্চমেণ্ট কাগজ রাখলেন। দুলতে থাকা শিখার নাচুনি থামবার জন্য চেয়ারে বসে অপেক্ষা করলেন, তারপর আবারও শুরু করলেন নতুন প্রতিলিপির কাজ। ভরা কালিদানীতে চুবিয়ে নিলেন কলমের নিব, নতুন পাতার শুরুতে লিখলেন: তেইশ জানুয়ারি, পনেরো শ' সাঁইত্রিশ সাল।

তারিখ ও সাল লিখবার পর কাগজের উপর থেমে গেল তাঁর কলম। অতি পরিচিত কিছু শব্দ এসেছে। কিন্তু এসব শব্দ এখানে কেন? রেগে গেলেন তিনি।

মার্চ করে আসছে একদল সৈনিক, ভেজা মাটিতে ধুপ-ধুপ শব্দ তুলছে বুট। বুকের লোহার বর্মের নীচের অংশে ঝনঝন আওয়াজে লাগছে তলোয়ারের বাঁট, ঝুনঝুন করছে জুতোর স্পার।

'না,' বিড়বিড় করলেন লাস কাসাস। 'হায়, ঈশ্বর, আবারও?' বুঝে গেছেন, মিথ্যা বলা হয়েছে তাঁকে, সেই সঙ্গে করা হয়েছে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা।

নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন গভর্নর মাল্ডোনাডো!

ডোমিনিকান ফ্রায়াররা স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের ধর্মান্তরিত করলে এ কলোনিতে এসে ইচ্ছামত ক্রীতদাস পাবে না স্প্যানিশরা। তার চেয়েও বড় কথা, নিজ রাজত্ব গড়তে সহায়তা পাবে না সৈনিকদের কাছ থেকে। এ অঞ্চলের স্থানীয়দেরকে যুদ্ধে হারিয়ে ক্রীতদাসত্বে বাধ্য করতে পারেনি সৈনিকরা, তার আগেই এখানে এসেছেন ফ্রায়াররা। তাঁরা বন্ধুত্বের মাধ্যমে জয় করে নিয়েছেন মানুষের হৃদয়। এখন যদি ইণ্ডিয়ানদের উপর হামলা করে সৈনিকরা, কারও কাছে মুখ থাকবে না লাস কাসাসের।

খড়-খড় আওয়াজ তুলে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন লাস কাসাস, কয়েক কদমে চলে গেলেন দরজার কাছে, কালো আলখেল্লা পরে নিয়েই বেরিয়ে এলেন দীর্ঘ করিডোরে। ইঁটের মেঝেতে চটাশ্-চটাশ্ আওয়াজ তুলল তাঁর চামড়ার চটি। একটু দূরেই দেখলেন স্প্যানিশ অশ্বারোহী সৈনিকবাহিনী। তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি, সঙ্গে তলোয়ার ও বর্শা। তাদের একদল আগুন জ্বেলেছে চার্চের মস্ত চত্বরে। দাউ-দাউ শিখার লাল-হলুদ আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে ইস্পাতের বর্ম ও ক্যাবাসেট।

দৌড়াতে শুরু করে চিৎকার ছাড়লেন লাস কাসাস, 'অ্যাই! তোমরা এখানে কী করছ? মিশন প্রাঙ্গণে আগুন জ্বালার সাহস কোত্থেকে পেলে? তোমরা জানো না এসব বাড়ির ছাত খড়ের তৈরি!'

ছুটন্ত লাস কাসাসের বক্তব্য শুনতে পেয়েছে সৈনিকরা। তাদের কেউ কেউ ভদ্রতা করে কুর্নিশ করল তাঁকে। ওরা পেশাদার যোদ্ধা, অসীম সাহসী, বিজয়ী বাহিনীর লোক; ওদের জানা আছে ডোমিনিকান মিশনের প্রধান যাজকের সঙ্গে তর্ক করে ক্ষমতাশালী বা বড়লোক হতে পারবে না।

লাস কাসাস দৌড়ে যেতেই জায়গা ছেড়ে সরে গেল তাদের অনেকে, কেউ বা এক পা পিছিয়ে গেল। অস্ত্র তুলে বাধা দিল না কেউ।

'তোমাদের নেতা কে?' ক্রুদ্ধস্বরে জানতে চাইলেন লাস কাসাস। 'আমি ফাদার বার্তোলোমে দে লাস কাসাস।' সাধারণত যাজকের পদমর্যাদা ব্যবহার করেন না তিনি, কিন্তু এ-ও ঠিক, তিনিই নতুন এ জগতে আসা প্রথম যাজক। আলাদা দাম দেয়া হয় তাঁকে। 'এক্ষুনি তাকে বলো আমার সামনে আসতে।'

যাজকের সামনের দুই সৈনিক ঘুরে গেল আরেক লোকের দিকে। সে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। লোকটা দীর্ঘদেহী, গালে

কালো চাপদাড়ি। লাস কাসাস খেয়াল করলেন ওই লোকের বর্ম অন্যদের চেয়ে অনেক জমকালো। সোনা দিয়ে কারুকাজ করা ফিলিগ্রি।

লাস কাসাস সামনে বাড়তেই নির্দেশ দিল সে, 'লাইনে দাঁড়াও সবাই!'

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে চারটি লাইনে নেতার সামনে দাঁড়িয়ে গেল সৈনিকরা।

তাদেরকে পাশ কাটিয়ে দলের নেতার সামনে এসে মুখোমুখি হলেন লাস কাসাস।

ক্লান্ত চোখে তাঁকে দেখল চাপদাড়ি। 'আমাদেরকে জরুরি কাজে পাঠানো হয়েছে, ফ্রায়ার। আপনার কোনও আপত্তি থাকলে গভর্নরকে তা জানাতে পারেন।'

'তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন কখনও সৈনিক পাঠাবেন না এখানে।'

'তা বোধহয় আগের কথা, যখন জানা যায়নি এদিকে আছে শয়তানের বই।'

'আরে, গাধা, বইয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই শয়তানের। আর তোমাদের কোনও অধিকারও নেই এখানে থাকার।'

'হতে পারে, কিন্তু গভর্নরই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। ফ্রা টোরিবিও দে বেনেভেন্টে গর্ভনরকে জানিয়েছেন, এখানে শয়তানের বই দেখা গেছে।'

'বেনেভেন্টে? আমাদের উপর কোনও ক্ষমতা দেয়া হয়নি তাকে। সে তো ডোমিনিকানও নয়, ফ্রান্সিসকান।'

'আপনাদের কামড়া-কামড়ি আপনাদেরই থাকুক, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে ওসব অশুভ বই খুঁজে বের করে পুড়িয়ে দিতে।'

'সেসব বই মোটেও অশুভ নয়। সেসবে আছে এ দেশের

মানুষের হাজার হাজার বছরের অর্জিত জ্ঞান ও জরুরি তথ্য। এদের বাপ-দাদার ইতিহাস; এদের প্রতিবেশী, দর্শন, ভাষা বা সৃষ্টিতত্ত্বের বহু কিছু আছে এসব বইয়ে। হাজার হাজার বছর এখানে বাস করেছে এরা, এদের এসব বই হতে পারে আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয়। বইগুলো দেবে অনেক জ্ঞান, যেগুলো অন্য আর কোনওভাবেই পাব না আমরা।'

'আপনাকে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে, ফ্রায়ার। আমি নিজ চোখে তেমন কিছু বই দেখেছি। সেগুলোর ভিতর শয়তানের ভয়ঙ্কর সব ছবি আর অশুভ চিহ্ন ছিল। সন্দেহ নেই এরা শয়তানের উপাসনা করে।'

'কাদের কথা বলছ তুমি, বেয়াদব?' ফুঁসে উঠলেন লাস কাসাস। 'ভণ্ড ফ্রান্সিসকানদের মত এক কথায় দশ হাজার মানুষকে ধর্মান্তরিত করিনি, আমি নিজ হাতে এক এক করে ওদের প্রত্যেককে যিশুর ধর্মে দীক্ষা দিয়েছি। পুরনো সেসব মায়ান দেবতার কোনও ক্ষমতা নেই ওদের ওপর। ছবিগুলো আছে বড়জোর কিছু প্রতীক হিসেবে। অল্প দিনের ধর্ম প্রচারে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা, এখন নিজেদেরকে অসভ্য হিসেবে প্রমাণ করে এত কষ্টের সব অর্জন নষ্ট করে দিয়ো না।'

'কী বললেন? আমরা অসভ্য?' দাঁত কিড়মিড় করল কমাণ্ডার।

'নিজেদেরকে অসভ্য বলে প্রমাণ কোরো না। অসভ্যরা নষ্ট করে শিল্প, পুড়িয়ে দেয় বই, যেসব মানুষ নিজেদের মত নয়, তাদেরকে খুন করে, তাদের শিশুদের বাধ্য করে ক্রীতদাস হতে।'

নিজ লোকদের নির্দেশ দিল কমাণ্ডার, 'অ্যাই, এঁকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

যতটা সম্ভব আলতো হাতে লাস কাসাসকে চত্বর থেকে সরিয়ে নিল তিন সৈনিক। তাদের একজন বলল, 'দয়া করুন, ফাদার, আমি মাফ চাইছি আপনার কাছে। দয়া করে কমাণ্ডারের

কাছ থেকে দূরে থাকুন। তাঁকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর তিনিও কথা দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করতে না পারলে নিজ জান দেবেন।' লাস কাসাসকে ছেড়ে দিল তিন সৈনিক, ঘুরে এক দৌড়ে ফিরে গেল চত্বরে।

শেষবারের মত সৈনিকদের দেখলেন লাস কাসাস। প্রাঙ্গণে বড় আগুনের চারপাশে জড় হয়েছে তারা। একদল ছোটাছুটি করছে, কাঠের কিছু পেলেই এনে ফেলছে লেলিহান আগুনে। এখন অনেক উজ্জ্বল হয়ে আকাশ চাটছে কমলা শিখা, যেন মায়ানদের বইয়ের অশুভ কোনও দেবতা নাচতে শুরু করেছে।

ঘুরে দাঁড়ালেন লাস কাসাস, হাঁটতে শুরু করে চলে এলেন দালানের পিছনে মিশনের অ্যাডোবিতে। ছায়ার ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। দালানের আড়াল থেকে বেরিয়ে পা রাখলেন জঙ্গুলে পথে। ঘন গাছের সব ডালপালা ও ঝোপঝাড় চারপাশ থেকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে কাঁচামাটির সরু রাস্তা। কাসাসের মনে হলো তিনি হাঁটছেন কোনও গভীর গুহার মাঝ দিয়ে।

নিচু পথ সোজা গেছে নদীর দিকে।

কিছুক্ষণ পর নদীর কাছে পৌঁছে গেলেন লাস কাসাস।

মায়ান গ্রামের সব কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাসিন্দারা। জ্বলছে মাঝারি আগুন। এরই ভিতর সবাই জেনে গেছে অচেনা সৈনিকদল হাজির হয়েছে এ এলাকায়। পরিস্থিতি বুঝতে জড় হয়ে আলাপ শুরু করেছে বয়স্করা।

এ অঞ্চলের মানুষ 'কিশে' ভাষায় কথা বলে, কাজেই তাদের উদ্দেশে কিশেয় বললেন কাসাস, 'আমি ব্রাদার বার্তোলোমে। আমাদের মিশনে হাজির হয়েছে সৈনিকরা।'

চুকুলমানকে দেখতে পেলেন তিনি।

নিজ কুঁড়েঘরের সামনে বসেছেন রাজবংশের লোকটি। ডোমিনিকান মিশনে আসবার আগে কোব্যান এলাকার গুরুত্বপূর্ণ

সর্দার ছিলেন। এখন নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁর প্রতি চেয়ে আছে সবাই।

চুকুলমান বললেন, 'আমরা ওদেরকে আসতে দেখেছি। ওরা কী চায়? সোনা? ক্রীতদাস?'

'ওরা চায় আপনাদের বইগুলো। একদল লোক ওদেরকে বুঝিয়েছে মায়ানদের বই অশুভ ও কালো জাদুর। কাজেই ওরা কোনও বই পেলেই তা পুড়িয়ে ফেলবে।'

বিড়বিড় করে আপত্তি তুলল সবাই, অভিশাপ দিচ্ছে। কেউ মানতে পারছে না পুড়িয়ে দেয়া হবে ওদের বই।

বই বিনষ্ট করা যেন ফলবান গাছ বিনষ্ট করবার মত, বা ভাল পানির কূপ মাটি দিয়ে বুজে দেয়া, অথবা কালি দিয়ে আঁধার করে দেয়া সূর্যটাকে।

এ যে সত্যিকারের অশুভ কর্ম, তা বুঝতে কারও বাকি নেই। আর এসব থেকে ক্ষতি ছাড়া আসলে কিছুই পাবে না কেউ।

'আমাদের এখন কী করা উচিত, ভাই বার্তোলোমে?' লাস কাসাসের দিকে চাইলেন চুকুলমান। 'আমরা কি লড়াই করব?'

'প্রথম কাজ হওয়া উচিত জরুরি বই রক্ষা করা। ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে কোথাও, যেখানে সৈনিকদের চোখ পড়বে না।'

ছেলের দিকে ঘুরে চাইলেন চুকুলমান। তাঁর ছেলে কুকুলমানের বয়স ত্রিশ, কিন্তু এরই ভিতর ভাল যোদ্ধা হিসাবে অর্জন করেছে যথেষ্ট সম্মান। ফিসফিস করে আলাপ শুরু করল বাপ-ব্যাটা। একটু পর আস্তে করে মাথা দোলাল কুকুলমান।

লাস কাসাসের দিকে ফিরলেন চুকুলমান। 'মিশনে আপনাকে যে বইটা দিয়ে এসেছিলাম, ওটা আগে সরাতে হবে। ওটা আর সব বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জঙ্গুলে পথে মিশনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন

লাস কাসাস। টের পেলেন তাঁর পিছু নিয়েছে কুকুলমান। যুবক বলল, 'ওরা ওই বই পাওয়ার আগেই মিশনে যেতে হবে। আমার পিছু নিন।' দেরি না করে দৌড়াতে শুরু করল কুকুলমান।

যেভাবে ত্রস্ত হরিণের মত ছুটছে, মনে হতে পারে পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছে ঘুটঘুটে আঁধারেও। সামনে আবছাভাবে তাকে দেখলেন লাস কাসাস। তাতে অনুসরণ করতে সুবিধা হলো, গতিও বাড়ল। খাড়াই পথে মিশনের দিকে উঠছে দু'জন ঝড়ের গতিতে। ঢালু পথ থেকে সমতল জমিতে উঠে দেখা গেল একদল সৈনিক। বড় রাস্তা ধরে ইণ্ডিয়ান গ্রামের দিকে চলেছে।

এরপর তারা কী করবে বুঝতে দেরি হলো না লাস কাসাসের। হিসপ্যানিওলায় আসবার পর থেকেই তো দেখছেন স্প্যানিশদের অত্যাচার, নির্যাতন ও খুন। ওই সৈনিকদলের প্রথম সারির লোকগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দেবে মায়ান ইণ্ডিয়ানদের কুঁড়েঘর। বাড়ির মালিক আপত্তি তুললে তাকেও মেরে ফেলবে। রক্ষা পাবে না তার স্ত্রী-সন্তানও।

কয়েক মুহূর্ত পর দূর থেকে চিৎকার শুনলেন লাস কাসাস। মায়ান গ্রামে পৌঁছে গেছে স্প্যানিশ সৈনিকরা।

'না, ওই বই কোপ্যান শহর থেকে বাঁচিয়ে এনেছি আমি!'

বুম্ করে উঠল আরকুয়েবাস, থরথর করে কাঁপল গোটা জঙ্গল। মস্ত সব গাছ থেকে উড়াল দিল এক ঝাঁক টিয়া পাখি, কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে। লাস কাসাস বুঝে গেলেন কুঁড়েঘরের মালিক এখন মৃত।

ওই একই সময়ে মিশনের পিছনে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। আবছা আলোয় ঢুকে পড়লেন দালান বাড়িতে। কুকুলমানের পরিবারের কথা ভাবছেন লাস কাসাস। জ্ঞানী মানুষ চুকুলমান, আগে ছিলেন তাঁদের ধর্মের যাজক। রাজ পরিবারের লোক। শেষ রাজা অসুখে ভুগে মারা যাওয়ার পর তাঁকেই রাজা করতে

চেয়েছিল মায়ানরা। কিন্তু রাজি হননি চুকুলমান, পাখির পালকের মুকুট চাই না তাঁর, ক্ষমতাও চাই না, শান্তিতে জীবন কাটাতে চেয়েছেন, কাজেই ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছেন এখানে। অবশ্য এখনও কুকুলমানের কানে গাঢ় সবুজ জেড দুল, হাতে বালা, কণ্ঠে নেকলেস— জানিয়ে দিচ্ছে কুকুলমান আসলে অভিজাত বংশের লোক।

লম্বা দালান পেরিয়ে ডোমিনিকান কোয়ার্টারের দিকে চলেছেন দু'জন। মিশনের স্থানীয় নানান জিনিস বের করে এনে আগুনে ফেলছে সৈনিকরা। কারও কারও হাতে মায়ান বই, অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও কাঠে খোদাই করা কারুকার্যময় শিল্প— সবই যাচ্ছে লেলিহান আগুনের কমলা পেটে।

মায়ানদের বই বলতে বুনো ডুমুর গাছের ভিতরের দিকের ভাঁজ করা বাকল। পাতার একদিকে পাতলা করে স্টাকো লেপে সাদা রং করা হয়েছে। কালি বলতে স্থানীয় গাছ থেকে আহরণ করা রং। মিশনে কোনও মায়ান বই পেলেই আগুনে ফেলছে সৈনিকরা। পুরনো বই সম্পূর্ণ শুকনো, অনায়াসেই দপ করে জ্বলে উঠছে, তখন ক্ষণিকের জন্য বাড়ছে শিখার তেজ। পঞ্চাশ বা এক শ'টি পাতার বই শত শত বছরের সঞ্চিত জ্ঞান নিয়ে মুহূর্তে ছাই হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে চিরকালের জন্য। লাস কাসাস জানেন, এসব বইয়ে ছিল নানান জ্ঞানের কথা। চুকুলমান তাঁকে বলেছিলেন বইগুলোর কোনোটা অঙ্কের, কোনোটা নক্ষত্র বিষয়ে গবেষণাপত্র, অথবা হারিয়ে যাওয়া শহরের খোঁজ, বা বিলুপ্ত ভাষা, রাজাদের কীর্তি ইত্যাদি। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ওগুলোর ভিতর। অনেক ধৈর্য নিয়ে লেখা এবং আঁকা। সব এখন ফুলকি তুলে ধোঁয়ার সঙ্গে উধাও হচ্ছে রাতের আকাশে।

আঁধারে বিড়ালের মত নিঃশব্দে চলছে কুকুলমান, লাস কাসাসের আগেই চার্চের মস্ত কাঠের দরজার কাছে পৌঁছে গেল।

কবাট সামান্য ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ডোমিনিকান কালো আলখেল্লা পরনে বাড়তি সুযোগ পাচ্ছেন লাস কাসাস, আঁধারে মিশে আছেন ছায়ার ভিতর। কয়েক সেকেণ্ড পর চার্চের ভিতরে কুকুলমানের পাশে পৌঁছে গেলেন লাস কাসাস।

চার্চের ভিতর দিয়ে পথ দেখালেন তিনি। মস্ত ঘরের দু' পাশে দুই সারি বেঞ্চ, সেগুলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। সামনেই পড়ল মঞ্চ। জানালা দিয়ে আসা ম্লান চাঁদের আলোয় দেখা গেল বামপাশে দরজা। পাশেই দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে বেশ কিছু আলখেল্লা। নীচে বন্ধ সিন্দুকের ভিতর ধর্মীয় পোশাক—গুয়াতেমালার জঙ্গলের ভেজা পরিবেশ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। মস্ত ঘরের আরেক পাশের ছোট এক দরজার কাছে কুকুলমানকে নিয়ে এলেন লাস কাসাস। চার্চ পেরিয়ে পা রাখলেন লম্বা করিডোরে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে ডোমিনিকান যাজকদের কোয়ার্টার। কোনও আওয়াজ না করে খালি পায়ে ইঁটের প্যাসেজে হাঁটছেন দু'জন। কোয়ার্টারের শেষে এসে লাস কাসাসের ব্যক্তিগত কক্ষে ঢুকলেন।

কুকুলমান চলে গেল যাজকের টেবিলের পাশে, ওখানে দেখতে পেয়েছে বইটি। খুব সাবধানে তুলে নিল ওটা। এত ভালবাসা ও সম্মানের সঙ্গে স্পর্শ করছে, যেন হাজির হয়েছে জীবিত, মহা সম্মানিত কারও সামনে। তিনি এমন কেউ, যাঁকে ধরে নেয়া হয়েছিল হারিয়ে গেছেন চিরতরে।

ঘরে চোখ বোলাল কুকুলমান। একটা হাঁড়ির উপর চোখ পড়ল। ওটা সংগ্রহ করেছেন লাস কাসাস। হাঁড়ির গায়ে আঁকা মায়ান এক রাজার দৈনিক কাজের চিত্র। একদিকে খানিকটা কাত করে রাখা হাঁড়ি। অন্যদিকের চিত্র দেখা গেল না। ওখানে প্রজাদেরকে মানুষ বলি দিতে আদেশ দিচ্ছেন রাজা। এই হাঁড়ির ভিতর খাবার পানি রাখেন ফ্রায়ার। ওটার সঙ্গে রয়েছে চামড়ার

ফিতা, ভারী কিছু সরিয়ে নেয়ার সময় ওগুলো ব্যবহার করে ইণ্ডিয়ানরা।

লাস কাসাসের ওয়াশ বেসিনে পানি ঢেলে দিল কুকুলমান, এক টুকরো শুকনো কাপড় নিয়ে মুছল হাঁড়ির ভিতর দিক। এবার সম্মানের সঙ্গে বইটি রাখল ভিতরে।

এদিকে কাবার্ডের সামনে চলে গেছেন লাস কাসাস, দেরাজে রয়েছে আরও কয়েকটি বই। ওগুলোর উপর কাজ করছিলেন তিনি। আরও দুটো মায়ান বই আনলেন তিনি, কুকুলমানের হাতে ধরিয়ে দিলেন। 'যত বেশি সম্ভব বই সরিয়ে ফেলতে হবে।'

মাথা নাড়ল কুকুলমান। 'এগুলো আঁটবে না। আর প্রথমটা এক লাখ বইয়ের সমান দামি।'

'অন্যগুলো কিন্তু চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে।'

'এই বই আমি এত দূরে নেব, সৈনিকরা এর হদিসও পাবে না,' বলল কুকুলমান।

'সতর্ক থেকো। ধরা পড়লে মরতে হবে। ওরা মনে করে তোমার কাছে যা আছে, তা এসেছে শয়তানের কাছ থেকে।'

'জানি, বাবা,' বলল কুকুলমান। হাঁটু গেড়ে বসল। 'এবার আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

কুকুলমানের মাথায় হাত রাখলেন লাস কাসাস, ল্যাটিন ভাষায় বললেন, 'হে দয়াময় ঈশ্বর, এ যুবককে সঠিক পথ দেখান। সে নিজের জন্য কিছুই চাইছে না। নিজ দেশের জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজ করছে। আমেন।' আবারও কাবার্ডের সামনে গেলেন তিনি, ওটা থেকে তিনটে সোনার টুকরো নিয়ে ফিরে এসে কুকুলমানের হাতে দিলেন।

'আমার যা ছিল তা-ই দিলাম। যাত্রাপথে এই সোনা তোমার কাজে আসবে।'

'ধন্যবাদ, বাবা,' উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল

কুকুলমান।

'একটু দাঁড়াও, বাছা,' বাধা দিলেন লাস কাসাস। 'এখনই বেরিয়ে যেয়ো না।' দরজার কাছে গেলেন তিনি, কবাট খুলে বাইরে চাইলেন। বাতাসে ভাসছে পোড়া গন্ধ। চিৎকার এল নদীতীরের গ্রাম থেকে। বেরিয়ে এসে দরজা আড়াল করলেন লাস কাসাস। এইমাত্র তিন ডোমিনিকান সন্ন্যাসীকে ঠেলে আশ্রমে ঢুকেছে চার সৈনিক। গুদামের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকল তারা। সার্চ করবে গোটা দালান।

চোখের কোণে লাস কাসাস দেখলেন বেরিয়ে এসেছে কুকুলমান। তার পিঠে এখন পানির হাঁড়ি। কোমর বেষ্টন করেছে ওটার ফিতা। আরেকটা ফিতা যুবকের কপালে। এখন আর ফস্কে পড়বে না হাঁড়ি। ওটার ওজন ফিতার উপর। চিতার গতিতে উঠান পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল কুকুলমান। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড তাকে দেখা গেল, তারপর হারিয়ে গেল আঁধারে।

দুই

মেক্সিকোর দ্বীপ গুয়াডালুপের সুনীল সাগরের নীচে ভেসে আছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মাসুদ রানা ও তার বান্ধবী-সহকর্মী সোহানা চৌধুরী। যেন অদৃশ্য কারও ইঙ্গিতে ওদের পাশ কাটিয়ে রুপালি ঝিলিক তুলে চলে গেল ছোট মাছের বড়সড় একটা ঝাঁক, ড্যাম কেয়ার, নিশ্চিন্ত। স্বচ্ছ, নাতিশীতোষ্ণ, আরামদায়ক পানিতে ঝুলে আছে রানা ও সোহানা। আছে মাঝারি আকারের ঘরের সমান একটা ইস্পাতের খাঁচায়। অনেক দূরে

চোখ।

না, আপাতত কোনও শ্বেতহাঙর নেই আশপাশে।

রানার হাতে তিন ফুটি অ্যালিউমিনিয়ামের বর্শার মাথায় তীক্ষ্ণ কাঁটা। ওটার সাহায্যে ট্যাগ করা হচ্ছে শ্বেতহাঙর।

অফিসে ওদের জরুরি কোনও কাজ নেই বলে দু'সপ্তাহ আগে ছুটি পেয়েছে রানা ও সোহানা। আগেই ঠিক ছিল এবার ছুটি কাটাবে মেক্সিকোর কাছের সাগরে। আর ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্টা বারবারা ইউনিভার্সিটির মেরিন বায়োলজির বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে ওদের জন্য জুটে গেল একটা কাজও। সাগরে নেমে চিহ্নিত করতে হবে শ্বেতহাঙর। এই কাজে ঝুঁকি রয়েছে প্রচুর, সেটাই ওদের মূল আকর্ষণ—খরচপাতি যা হয় সব দেবে ইউনিভার্সিটি।

কাজটা সাগ্রহে নিয়েছে রানা ও সোহানা।

অপরূপা সোহানাকে একবার দেখে নিল রানা, তারপর আবারও চোখ রাখল দূরে।

ওদিক থেকে আসছে ছায়া মত কী যেন। কয়েক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল সত্যি ওটা হাঙর। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। হওয়ারই কথা, খাঁচার কাছে জড় হয়েছে অসংখ্য মাছ। দেখে থাকলেও মনে হলো না রানা বা সোহানাকে পাত্তা দেবে হাঙর বাবাজি।

ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট নীল হাঙর নয়, সত্যিকারের রাক্ষস—শ্বেতহাঙর। সারাজীবন চলার ওপর থাকতে হবে ওকে, নইলে শ্বাস আটকে মরবে। সারাশরীর ভরা নার্ভ, কারও দেহের কম্পন টের পায় বহু দূর থেকে, দেখে বহু দূরে, শুনতে পায় মাইল কে মাইল দূরের আওয়াজ, ঘ্রাণশক্তিও অবিশ্বাস্য। সাগরের কোনও প্রাণীকে সেরা শিকারী বলে মানতে হলে নিঃসন্দেহে এরই নাম উচ্চারণ করতে হবে। পানিতে কোনও শিকারের সামান্যতম ইলেকট্রিকাল ডিসচার্জ থাকলেই তেড়ে আসে জন্মের ক্ষুধা নিয়ে।

অলসভঙ্গিতে লেজ নেড়ে রানা ও সোহানার কাছে এল। স্বচ্ছ

সাগরতলে পরিষ্কার দেখা গেল ওটাকে। যত কাছে আসছে, আয়তন আরও বাড়ছে যেন।

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা। ওদেরকে বলা হয়েছে এদিকের সাগরে থাকবার কথা পঁচিশ ফুটি শ্বেতহাঙর। এটা অত বড় না হলেও, মনে হচ্ছে বাইশ ফুটের কম হবে না। একটু কাছে আসতে রানার মনে হলো, এ ব্যাটা পঁচিশের বেশি ছাড়া কম নয়।

অসংখ্য ছোট মাছের মাঝ দিয়ে আসছে, যেন রাজার আগমন। সামনে থেকে সাঁৎ-সাঁৎ করে সরে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ছোট মাছ। শ্বেতহাঙর পেরিয়ে গেলে আবারও দল বাঁধছে ওরা। কোনও দিকে খেয়াল নেই মহারাজের। আরেকবার লেজ দোলাল। পিছলে এগিয়ে এল রানাদের দিকে। নাকটা চ্যাপ্টা, তার নীচে চার ফুট চওড়া হাসি-হাসি মুখ। রানা ও সোহানার কাছে এসে আবারও ঘুরে গেল। খাঁচার পাশ দিয়ে চলেছে। ইচ্ছা হলে ওটাকে স্পর্শ করতে পারবে রানা-সোহানা। ইচ্ছা হলো সোহানার। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর হাত টেনে নিল খাঁচার ভিতর। খসখসে ত্বক পছন্দ হয়নি ওর।

ওদের চেয়ে উঁচু ওটার ডরসাল ফিন। এলাকা ছেড়ে চলে গেল না। আবারও ঘুরে এল খাঁচার সামনে। একদম স্থির হয়ে ভাসছে রানা ও সোহানা। আগেও বহুবার এসব খাঁচা নিয়ে ডাইভ দিয়েছে, কিন্তু শ্বেতহাঙর হাজির হলে একটা চিন্তাই মনের মাঝে ঘুরতে থাকে: খাঁচার শিকের ঝালাই ঠিক আছে তো? ঝালাইকারী জানত কত ভয়ঙ্কর শক্তিশালী প্রাণীকে ঠেকাতে হবে?

গুয়াডালুপ দ্বীপের এলিফ্যান্ট সিল ও টিউনাগুলো সাবাড় করে এসব হাঙর, ভাবছে সোহানা। আমাদেরকে আদর্শ খাবার ভাবার কথা নয়। অবশ্য ওদের পরনের কালো ওয়েট সুট দেখে ক্যালিফোর্নিয়ার সুস্বাদু সি লায়নও ভেবে নিতে পারে।

আর কিছু ভাবতে পারল না সোহানা, হঠাৎ করেই ভীষণ

চমকে গেল শ্বেতহাঙর। পিঠে বেদম এক খোঁচা খেয়েছে। সাঁই করে ঘুরে গেল, পরক্ষণে রাজকীয় ভঙ্গি ভুলে লেজের ঝাপটায় বিদ্যুতের গতি তুলে উধাও হলো।

অবাক হয়ে রানার দিকে চাইল সোহানা।

ভুরু নাচিয়ে হাতের ট্যাগ করবার স্টিক দেখাল রানা।

ওই হাঙরকে আবারও দেখা গেলে হলুদ ট্যাগের কারণে ঠিকই চেনা যাবে।

কিন্তু ট্যাগ না থাকলেও রানা বা সোহানা ওটাকে চিনবে।

কারণ, উধাও হয়নি প্রকাণ্ড দানব!

ঝড়ের বেগে ঘুরে এসেই ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মারল খাঁচার গায়ে। মস্ত হাঁ করে শিক কামড়ে ধরল সারি সারি ত্রিকোণ দাঁত দিয়ে, তারপর জোর এক ঝাঁকি দিল। খাঁচার অপরদিকে গিয়ে বাড়ি খেল রানা ও সোহানা। বিড়াল যেভাবে আহত ইঁদুরকে মুখে তুলে ঝাঁকায়, খাঁচা নিয়ে ঠিক তাই শুরু করেছে শ্বেতহাঙর। গোটা খাঁচা মুখে পুরতে চাইল, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আরও রেগে গেল, ঠেলে নিয়ে চলেছে খাঁচা। ভিতরে হুটোপুটি খাচ্ছে রানা ও সোহানা, নানাদিকের শিকে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। তারই ফাঁকে সোহানাকে নিজের কাছে সরিয়ে আনল রানা। আরেকহাতে সিগনাল রোপে পরপর তিনবার টান দিল।

এক সেকেণ্ড পর পানিতে ছড়িয়ে পড়ল শক্তিশালী মোটরের গুঞ্জন। হাঙরের মুখ থেকে ছুটে গেল খাঁচা, রওনা হয়েছে উপরের দিকে।

রানা দেখল, ঘুরে গেল হাঙরটা। যান্ত্রিক আওয়াজটা বোধহয় পছন্দ হয়নি, অলসভঙ্গিতে চলল আরেক দিকে।

আধ মিনিট পর সাগর থেকে সোনালী রোদের জগতে হাজির হলো খাঁচা। ইয়টের ডেকে তুলে নেয়া হলো।

মাস্ক ও মাউথপিস খুলেই রানার দিকে চাইল সোহানা। 'কয়

ফুট?'

'ভুল না হয়ে থাকলে পঁচিশই।' ওয়েট সুট খুলতে শুরু করেছে রানা। খাঁচার দরজা খুলে কেবিনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সোহানা। ওয়েট সুট পাল্টে শাড়ি পরবে।

দু'মিনিট পর থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরনে বেহায়ার মত ওই কেবিনের দিকে চলল মাসুদ রানা।

ওদের চার্টার ইয়ট একাশি ফুটি, নাম মার্ভেল অভ মার্লিন। গতি তুলতে পারে চব্বিশ নট। কিন্তু কখনোই টুইন ক্যাটারপিলার সি৩০ ডিজেল ইঞ্জিনের পূর্ণ গতি তোলেন না ক্যাপ্টেন কার্লোস হুয়ারেজ। কোনও তাড়াও নেই যাত্রীদের, সাগরের নানা জায়গা বেছে নিয়ে শ্বেতহাঙরের জন্য ডাইভ দিচ্ছে তারা। মাঝে মাঝে থামছে মেক্সিকোর চমৎকার সব বন্দরে রিফিউয়েলিং, খাবার ও প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসের জন্য।

আসলে ছোট জলযান ভাড়া করতে না পেরে অনেক বড় এই ইয়ট মার্ভেল অভ মার্লিন ভাড়া নিয়েছে রানা ও সোহানা। এই ইয়টে রয়েছে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত তিনটি স্টেটরুম এবং সেই সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ। ক্রুদের জন্য তিনটি আলাদা কোয়ার্টার।

ক্যাপ্টেন কার্লোস হুয়ারেজ, মেট জিম গার্ভেইস ও রাঁধুনি অ্যালফ্রেডো মণ্টেয এসেছে আকাপুলকো থেকে। ওই বন্দর-নগরী থেকেই চার্টার করেছে রানা এই ইয়ট। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে, আইলা গুয়াডালুপ থেকে শুরু করে বাজা ক্যালিফোর্নিয়া তক এই এক শ' ষাট মাইল সাগরে মস্ত সব শ্বেতহাঙরের খোঁজে ঘুরবে ওরা।

দিনদুপুরে বিশেষ পাত্তা না পেয়ে দশ মিনিট পর ইয়টের ফোরডেকে এসে দাঁড়াল রানা, অবশ্য সঙ্গেই রয়েছে সোহানা। স্যাটালাইট ফোনে এবারের শ্বেতহাঙরের ট্যাগ নম্বর ইউনিভার্সিটির মেরিন বিজ্ঞানীকে জানিয়ে দিল রানা। সেই সঙ্গে

বর্ণনা করতে হলো ওটার আকার ও আকৃতি।

খোলা সাগরে বেরিয়ে বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশে অনায়াস ভঙ্গিতে চলেছে প্রকাণ্ড ইয়ট।

দামাল হাওয়ায় উড়ছে সোহানার রেশমি কালো, সুগন্ধী চুল।

বুক ভরে সে সুবাস নিল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'এখনও ভাল লাগছে সাগরে?'

'হ্যাঁ, পাশে তুমি আছ, তাই,' মিষ্টি করে হাসল সোহানা। 'আর সায়েন্টিস্টরা বলেছিলেন দশটা হাঙর ট্যাগ করাই কঠিন হবে। আজকেরটা আঠারোতম। আমরা কিন্তু আমাদের কাজ ঠিক ভাবেই শেষ করেছি।'

'তার মানে এবার তীরের দিকে?' ভুরু নাচাল রানা।

'কেন নয়?'

'যো হুকুম, চলো তা হলে!'

দু'দিন পর ইয়ট নোঙর করল স্যান ইগন্যাসিয়ো লেগুনে।

পানিতে প্লাস্টিকের ওশন্ কায়াক ভাসিয়ে ইয়ট ত্যাগ করল রানা ও সোহানা। ওদেরকে হালকা বৈঠা দিয়েছে মেট জিম গার্ভেইস।

এ লেগুন বিখ্যাত ধূসর তিমির প্রজননের জন্য।

আর সত্যিই একটু পর ওদের সামনে ভেসে উঠল এক ধূসর তিমি, মাথার উপরের দুই নল দিয়ে আকাশে ছুঁড়ল পানি ও গরম ফেনায়িত বাষ্প। তাকে সন্তুষ্ট মনে হলো, হুইশ্ আওয়াজ তুলে তলিয়ে গেল আবারও। পানির উপর রয়ে গেল লেজের তৈরি ফেনা। আস্ত একটা বাসের সমান বিশাল প্রাণীটা উধাও হলেও টলমল করছে কায়াক।

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল রানা-সোহানা।

সারাদিন কায়াক নিয়ে ধূসর তিমির পিছনে ঘুরল ওরা।

কখনও কখনও খুব কাছে যেতে দিল দুয়েকটা কৌতূহলী তিমি, মাথা-গা চাপড়ে দিলেও আপত্তি করল না। একটু পর খুশি মনে রওনা হয়ে গেল নিজের পথে।

শেষ বিকেলে ইয়টে ফিরল রানা ও সোহানা, বসল পিছনের ডেক টেবিলে। ওদের সঙ্গে রয়েছে ক্রুরা। ছোট শহর স্যান ইগন্যাসিয়ো থেকে আনা হয়েছে সুস্বাদু মেক্সিকান মাছের ডিশ, একই সঙ্গে বসে ডিনার সারল ওরা।

কাজ নেই কারও, আঁধার নামবার পরেও গল্প চলল সাগর এবং তার ভয়ঙ্কর সব প্রাণীর বিষয়ে। ওরা শোনাল কারকারোডন মেগালোডনের কথা। ওদের একটা রয়েছে টয়োডা সিনোসুকা মেমোরিয়াল লেগুনে, বড় হয়ে উঠছে। এখনই দৈর্ঘ্যে তিরিশ ফুট। চোখ বড় বড় করে শুনল রানা ওদের গল্প, ভুলেও উচ্চারণ করল না এ ব্যাপারে নিজের অবদানের কথা। নানা গল্পে পেরোল সময়। আকাশ জুড়ে জ্বলতে লাগল কোটি কোটি নক্ষত্র। মৃদু ঝিরঝিরে হাওয়া জুড়িয়ে দিল মন।

অনেকক্ষণ পর আড্ডা ছেড়ে উঠে পড়ল ক্লান্ত রানা ও সোহানা, ফিরল নিজেদের কেবিনে। আঁধারে শোনা গেল তিমির শ্বাস ছাড়বার আওয়াজ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানল না ওরা।

পরদিন ভোরে দক্ষিণ উপকূল লক্ষ্য করে রওনা হলো ইয়ট। ওদিকেই আকাপুলকো শহর।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই ওই বন্দরে পৌঁছেও গেল মার্ভেল অভ মার্লিন।

রাতে সৈকতের কাছেই এক হোটেলে উঠল রানা ও সোহানা। ডিনার শেষে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়েছে ওরা, এমন সময় টের পেল শুরু হয়েছে ভূমিকম্প। কয়েক সেকেণ্ড থরথর করে কাঁপল দালান, সেই সঙ্গে গুড়-গুড় আওয়াজ, তারপর থেমে গেল সব।

রানার কানে কানে বলল সোহানা, 'আমাদেরকে ভয় দেখিয়েছে, এসো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি!'

'সত্যিই, খুবই ভয় লাগছে, আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো,' বলল রানা। নিজেই জড়িয়ে ধরল সোহানাকে।

ওদিক থেকে সামান্যতম আপত্তি এল না।

পরদিন হোটেল থেকে চেক আউট করে আবারও জেটিতে ফিরল ওরা। ইয়টে পা রাখবার আগেই টের পেল, কোথাও রয়েছে ছন্দপতন।

চুপ করে ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন কার্লোস হুয়ারেজ, জোর ভলিউমে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন রেডিয়োর খবর।

আওয়াজটা ট্যাক্সি থেকেও শোনা গেল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ইয়টের দিকে পা বাড়াতেই রানা ও সোহানা দেখল, মার্ভেল অভ মার্লিনের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মেট জিম গার্ভেইসের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা।

ডেকে পা রেখে রানা শুনল রেডিয়োর দুটি শব্দ: 'সিসমো টেম্বলর' ও 'ভলকান'।

'কোথাও ভূমিকম্প?' মেট গার্ভেইসের কাছে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। মাত্র দশ মিনিট আগের কথা। ক্যাপ্টেন বোধহয় আরও ভাল বলতে পারবেন।'

গার্ভেইসের পর পর ব্রিজে উঠল রানা ও সোহানা।

ওদেরকে দেখে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ। 'টাপাচুলার উপকূলে আঘাত হেনেছে। জায়গাটা গুয়াতেমালা আর মেক্সিকোর সীমান্তে।'

'কত মাত্রার?' জানতে চাইল সোহানা।

'ওরা বলছে আট দশমিক চার,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'এদিকে

শহরের উত্তরদিকের আগ্নেয়গিরি টাকানার চূড়া থেকেও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শহরে যাওয়ার উপায় নেই, মাইল কে মাইল ভূমিধসে বুজে গেছে প্রতিটা রাস্তা। আহত হয়েছে অসংখ্য মানুষ, মারা গেছে অনেকে। রেডিয়োতে বলছে, আহত-নিহতদের সংখ্যা আঁচ করতে পারছে না কেউ।' আবারও আস্তে করে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ। 'আমাদের কিছু করার উপায় থাকলে ভাল হতো।'

সোহানার চোখে চোখ রাখল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহানা, ওর আপত্তি নেই।

'ইয়ট ছাড়ার জন্যে তৈরি থাকুন, ক্যাপ্টেন,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'সব গুছিয়ে নিন। আমরা ত্রাণ নিয়ে যাব ওই এলাকায়। তার আগে কয়েকটা কাজ সেরে নেব।'

প্যান্টের পকেট থেকে স্যাটালাইট মোবাইল ফোন বের করল রানা, ফোরডেকে এসে দাঁড়াল। ব্যবহার করল স্পিড ডায়াল। ওদিকে কেউ রিসিভ করতেই বলল, 'আমজাদ সাহেব?'

'জী, মিস্টার রানা,' জবাব দিলেন বাংলাদেশ এমব্যাসির সেকেণ্ড অফিসার। 'বলুন?'

সংক্ষেপে রানা জানাল, মেক্সিকো ও গুয়াতেমালার সীমান্তে জোর আঘাত হেনেছে ভূমিকম্প। এখনও জানা যায়নি কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। তবে ভূমিকম্পের মাত্রা থেকে ধারণা করা হচ্ছে, মস্ত বিপদে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। কোনও এয়ারপোর্ট আস্ত নেই। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় পৌঁছবার উপায় নেই সড়কপথে। এ অবস্থায় মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দেয়া দরকার জরুরি খাবার ও মেডিকেল চিকিৎসা। রানা জানতে চাইল বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে কোনও সাহায্য করা সম্ভব কি না।

'আমি অ্যামবেসেডরকে জানাচ্ছি,' বললেন সেকেণ্ড অফিসার

আমজাদ হোসেন। 'পাঁচ মিনিট পর যোগাযোগ করব।' ফোন কেটে দিলেন তিনি।

এবার আমেরিকার কয়েকটি নামকরা কোম্পানির এমডির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল রানা।

এঁরা নানা সময়ে উপকার পেয়েছেন রানা এজেন্সি থেকে।

সংক্ষেপে প্রত্যেককে পরিস্থিতি জানাল রানা।

'সহায়তা না দেয়ার কথাই থাকতে পারে না,' বললেন সান ফ্লাওয়ার কোম্পানির এমডি। 'আর আপনি নিজে যখন ওখানে যাচ্ছেন, কিচ্ছু ভাবতে হবে না আমাদের, ঠিকই ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ত্রাণ পৌঁছবে। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে এক লাখ ডলার পৌঁছে যাবে, মিস্টার রানা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই।'

'এক ঘণ্টার ভেতর আমার লোক ত্রাণের টাকা পৌঁছে দেবে আপনার হাতে, মিস্টার রানা,' বললেন টেক্স কিং কোম্পানির চেয়ারম্যান। ভুলে যাননি দু'বছর আগে একমাত্র সন্তানকে কিডন্যাপারদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল এই মস্ত-হৃদয়, বাঙালি যুবক।

আরও চারটি কোম্পানির সর্বোচ্চ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলল রানা, তাঁদের প্রত্যেকেই কথা দিলেন ডোনেশন দেবেন। এবং যত শীঘ্রি সম্ভব।

কিছুক্ষণ ধরে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন বাংলাদেশ হাই কমিশনের সেকেণ্ড অফিসার আমজাদ হোসেন, এবার রানাকে পেলেন।

'মিস্টার রানা, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন অ্যামবেসেডর। প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিয়েছেন আপনার অ্যাকাউণ্টে যেন আড়াই লাখ ডলার ট্রান্সফার করা হয়। কাজটা করা হয়েছে।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল রানা। ফোন রেখে যোগাযোগ করল ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগোর রানা এজেন্সির শাখা প্রধান

সালমা আলীর সঙ্গে। দু'চার কথায় জানিয়ে দিল সাউল শিপিং কর্পোরেশন ম্যানেজমেন্ট থেকে টাকা তুলে কী করতে হবে।

মারা যাওয়ার আগে ওই মস্ত ব্যবসায়ীক সংগঠনের সবই রানাকে লিখে দিয়েছিল রেবেকা সাউল। প্রতি বছর বিপুল মুনাফা করে ওই জাহাজ কোম্পানি, কিন্তু মালিক হয়েও নিজের জন্য এক পয়সাও নেয় না রানা, তবে প্রয়োজন পড়লে মানুষকে সহায়তা করতে দেরিও করে না। ওর নিজের খরচ চলে বিসিআই-এর বেতনে।

'বুঝতে পেরেছি, মাসুদ ভাই, যেহেতু এয়ারপোর্ট ব্যবহার করতে পারব না, আমরা ত্রাণের জিনিস আকাশ থেকে ড্রপ করব,' বলল সালমা আলী।

'এদিকে ইয়টে মাল তুলেই আমরা রওনা হব দক্ষিণে,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই, যোগাযোগ থাকবে,' বলল সালমা।

ফোন রেখে আবারও ইয়টের ব্রিজে ফিরল রানা। ক্যাপ্টেন হুয়ারেজের উদ্দেশে বলল, 'হাঙর ট্যাগ করার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ এখন সামনে।'

'কী করতে চান, মিস্টার রানা?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'টাপাচুলার রাস্তাগুলো তো বন্ধ, তাই না?'

'জী। রেডিয়োতে তাই বলছে। একমাসের বেশি লাগবে সড়কপথ পরিষ্কার করতে।'

'এই ইয়ট দুর্গত এলাকা থেকে খুব একটা দূরে নেই, কাজেই খাবার ও পানি নিয়ে ওদিকে যাব আমরা। সকালে নিশ্চয়ই ফিউয়েল ট্যাঙ্ক ভরে রেখেছেন? ...গুড। মালপত্র ইয়টে তুলে রওনা হলে এক দিন লাগবে ওই উপকূলে পৌছতে।'

'বড়জোর দেড় দিন,' বললেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ। 'কিন্তু ওই ট্রিপের জন্য ফিউয়েল দেবে না ইয়ট কোম্পানি।'

‘ও নিয়ে ভাবছি না,’ বলল রানা। ‘আমরা লাখ কয়েক ডলারের দরকারী জিনিস কিনব।’

‘কত লাখ ডলার, মিস্টার রানা?’

‘ধরুন দু’তিন লাখ?’

সোহানা জানে, দুর্গত প্রতিটি এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেবে রানার লোক। সেজন্য যথেষ্ট টাকাও জোগান দেয়া হবে।

অন্য চোখে রানাকে দেখছেন ক্যাপ্টেন। একটু আগেও ভেবেছেন, সামান্য এক বাঙালি যুবক কয় পয়সা জোগাড় করবে! মনে মনে নিজের কান মলে দিয়ে ভাবলেন, কারও চেহারা দেখেই তার ওজন বোঝা যায় না, গাধা!

রানা, সোহানা, ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ, গার্ভেইস ও মন্টেয ব্যস্ত হয়ে উঠল দেরি না করেই। কিছুক্ষণের ভিতর টেক্স কিং কোম্পানির লোক নগদ এক লাখ ডলার পৌঁছে দিয়ে গেল।

বড় একটা ভ্যান-গাড়ি ভাড়া নিল রানা, ওটাতে চেপে আকাপুলকো শহরে হাজির হলো ওরা, নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল পকেট ভরা টাকা নিয়ে। কেনা হলো শত শত বোতল ভরা পানি, ক্যান করা খাবার, কম্বল, স্লিপিং ব্যাগ, ফার্স্ট এইড কিট, মেডিকেল সাপ্লাই, প্রচুর অকটেন, পনেরোটি অগযিলারি জেনারেটার, ফ্ল্যাশলাইট, ব্যাটারি, রেডিয়ো, তাঁবু, নানা আকারের পোশাক ইত্যাদি। ভ্যানে করে বেশ কয়েকবার মালপত্র পাঠানো হলো ইয়টে। প্রায় ভরে ফেলা হলো ইয়টের লিভিং কোয়ার্টার, হোল্ড ও ফো’ক্যাসল। এমন্ কী ব্রিজও বাদ পড়ল না। ডেকে রেলিঙের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো পানি, গ্যাসোলিন ও খাবার। ঝড়-তুফানেও এখন আর ভেসে যেতে পারবে না ওগুলো।

মালপত্র রাখবার ফাঁকে আকাপুলকোর কয়েকটি হাসপাতালে যোগাযোগ করেছে সোহানা। ওখান থেকে ওকে বলা হলো, তাঁরাও দুর্গতদের জন্য সাহায্য দিতে চান। হাসপাতাল থেকে

পাঠানো হলো নানান ওষুধ। সেগুলোর ভিতর আছে পেইন কিলার, অ্যান্টিবায়োটিক, স্প্লিন্ট ও হাড়ভাঙা মেরামতের ব্রেস। একটি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি রুমের তিনজন বাড়তি ডাক্তার রয়েছেন, কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাঠাতে চাইলেন। এঁরা টাপাচুলায় গিয়ে চিকিৎসা দিতে পারবেন।

খুবই খুশি হয়ে রাজি হলো রানা ও সোহানা।

মাঝ দুপুরে মেডিসিনের সাপ্লাইসহ হাজির হলেন তিন ডাক্তার, তৈরি হয়ে এসেছেন যাত্রার জন্য। ডক্টর ভেলেসকেয, ডক্টর হার্নেন্দেয ও ডক্টর সেবাস। তাঁদের প্রথম দু'জন তরুণী, অন্যজন সার্জন, বয়স ষাট বছর।

এঁরা নিজ নিজ মেডিকেল কিট রেখে রানা, সোহানা এবং ইয়টের ক্রুদের সঙ্গে কাজে হাত লাগালেন, ভ্যানের শেষ মালপত্র ডক থেকে নিয়ে ডেকে তুললেন। সবার কাজ শেষে তিন ডাক্তার চলে গেলেন ডেকের নীচের দুই কেবিনে।

বিকেল চারটের সময় শেষ পর্যন্ত বন্দর ছাড়ল ইয়ট, রওনা হলো পাঁচ শ' দশ মাইল অভিযাত্রায়। প্রথমবারের মত ইঞ্জিনগুলোর সর্বোচ্চ গতি তুললেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুল স্পিড ধরে রাখলেন। গভীর সাগর চিরে ইয়ট চলেছে দুর্গত এলাকা লক্ষ্য করে। পালা করে হেলমে রইল রানা, সোহানা ও ক্রুরা। ইয়টের কাজ ও সামান্য ঘুম ছাড়া অন্য সময় ওরা সাহায্য করল তিন ডাক্তারকে। তাঁরা মেডিকেল সাপ্লাই ভরলেন বেশ কিছু কিটে। ওগুলো পৌঁছে দেয়া হবে ছোট ছোট সব ক্লিনিক, ইমার্জেন্সি রুম ও ডাক্তারদের কাছে।

পরদিন বিকেলে বহু দূরে দেখা গেল উপকূল। সবাই বুঝে গেল প্রায় পৌঁছে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। আরও কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার সময় উপকূলের এক মাইল দূর থেকে দেখা গেল তীরে জনপদ। কিন্তু কোথাও বৈদ্যুতিক বাতি নেই। হেলমে গিয়ে চার্ট

দেখল রানা।

'আমরা কোথায়?' জানতে চাইল সোহানা।

'স্যালিনা ক্রুয,' রানা কিছু বলবার আগেই বলল মেট জিম গার্ভেইস। 'ছোট শহর, দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ নেই।'

'আরও কাছে যেতে হবে,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ। 'সৈকত আছে, কিন্তু ওখানে বালির বাঁধও আছে। ইয়ট মালে ভর্তি, কাজেই ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'যতটা পারা যায় কাছে যাব আমরা,' বলল রানা। 'ইয়ট নোঙর করার পর লাইফবোটে মালপত্র তুলে রওনা হব।'

একটু পর তীর থেকে সিকি মাইল দূরে ইয়টের নোঙর ফেললেন ক্যাপ্টেন। 'ব্যস, আর এগোতে পারব না।'

লাইফবোট গুছিয়ে নেয়ার কাজে হাত লাগাল রানা, সোহানা ও ক্রুরা। ডেকে উঠে এল তরুণী ডক্টর ভেলেসকেয, দেখল একের পর এক জেনারেটারে অকটেন ঢালছে রানা ও জিম গার্ভেইস। কিছু ফিউয়েল ও একটা জেনারেটার নিয়ে তুলল লাইফবোটে।

ডাক্তার ভেলেসকেয বলল, 'আমার জন্যে সামান্য জায়গা রাখবেন। সঙ্গে ব্যাগ নেব।'

'কয়েকবার আসা যাওয়া করতে হবে,' কাজের ফাঁকে বলল রানা।

ইয়টের স্টার্ন থেকে সাগরে বোট নামাল ওরা।

সোহানা, রানা, ডক্টর ভেলেসকেয এবং জিম গার্ভেইস চেপে বসল লাইফবোটে।

আউটবোর্ড মোটর চালু করে রওনা হলো মেট। সৈকতের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর বন্ধ করল মোটর, পানি থেকে তুলে নিল প্রপেলার।

ভাসতে ভাসতে তীরের কাছে পৌঁছে গেছে বোট, ঢেউয়ের শেষ কয়েকটা ঠেলা খেয়ে ঘ্যাস্ আওয়াজ তুলে আটকে গেল বালিতে।

বো থেকে লাফিয়ে ডাঙায় নামল রানা ও সোহানা, টেনে তীরে তুলল বোটের সামনের অংশ। এবার নেমে এল ডক্টর ভেলেসকেয ও গার্ভেইস, হাত লাগাল কাজে। টেনে তুলে ফেলা হলো বোট। এখন আর সহজে ভেসে যাবে না জোয়ারে।

মালপত্র নামাতে শুরু করেছে ওরা, এমন সময় সৈকতে এসে পৌঁছল স্থানীয় অনেকে, বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত। গার্ভেইস ও ভেলেসকেয তাদের সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলল।

জানা গেল, ছোট জখম থেকে শুরু করে মাঝারি ইনজুরি হয়েছে বেশ কয়েকজনের। তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে কয়েক ব্লক দূরের একটা স্কুল ভবনে। ওটার ছাত এখনও অক্ষত।

দু'জন স্থানীয় মহিলার সঙ্গে রওনা হলো ডক্টর ভেলেসকেয। সাথে করে ফ্ল্যাশলাইট ও মেডিকেল কিট নিয়েছে।

অন্যরা ব্যস্ত হাতে কেস ভরা সব পানির বোতল নামাল। গার্ভেইস জিজ্ঞেস করতে এক লোক বলল, 'আমি স্থানীয় মেডিকেল ক্লিনিকে কাজ করি। বুঝলাম এটার নাম জেনারেটার, কিন্তু বুঝতে পারছি না ওটা দিয়ে কী হবে।'

'ওটা দিয়ে বাতি জ্বালব,' বলল রানা স্প্যানিশে। একটু দূরে বাচ্চাদের লাল রঙের এক ওয়্যাগন নিয়ে এসেছে এক লোক, ওটার উপর চোখ পড়ল ওর। খুশি হয়ে উঠেছে। রানার কথায় ওয়্যাগনের উপর তোলা হলো জেনারেটার। ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো শহরের মাঝের ক্লিনিকে। পাঁচ মিনিটের ভিতর বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলল দালানে। ধক-ধক আওয়াজ তুলে বাইরে চলছে জেনারেটার।

ক্লিনিক খুলে দেয়া হয়েছে জানতে পেরে অসুস্থরা হাজির

হলো। তার কিছুক্ষণের ভিতর আরও কয়েকজন রোগী নিয়ে ক্লিনিকে পৌঁছে গেল ভেলেসকেয। কপাল ভাল, গুরুতরভাবে আহত নয় কেউ।

'কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিদায় করে দিয়েছি,' বলল ভেলেসকেয। 'শুনলাম এখানে কারেন্ট এসেছে, তাই অন্যদের নিয়ে চলেই এলাম।'

'কেউ কি জানেন এপিসেন্টারের কাছে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা?' জানতে চাইল সোহানা।

'শুনেছি টাপাচুলার অবস্থা খুবই খারাপ,' বলল ডক্টর ভেলেসকেয। 'আহতদের নিয়ে এখানে এসেছে কয়েকটা বোট। ত্রাণসামগ্রী পেলে ওগুলো ফিরতি পথ ধরবে।'

'ত্রাণ দেয়া হবে ওদেরকে,' বলল রানা। 'এখানে মাল নামিয়ে দেয়ার পর আমরা নিজেরাও ওদিকেই যাব। আপনি কি আপাতত এখানে রয়ে যাবেন, ডক্টর?'

'তাই বোধহয় ভাল,' বলল ডাক্তার। 'চিকিৎসা দিতে পারব।'

'তো আপনি ডক্টর ভেলেসকেযের সঙ্গে থাকুন, গার্ভেইস,' বলল রানা। 'আমাদেরকে বোটে মাল তুলতে সাহায্য করতে পারবেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ আর স্টুয়ার্ড মন্টেষ।'

সৈকতে টেনে তোলা বোটের কাছে ফিরল রানা ও সোহানা।

বোটে নোঙর তুলে সোহানাকে বলল রানা, 'তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও?'

'কবে তোমার পাশে থাকিনি?' হাসল সোহানা।

'নইলে হারিয়ে যেতাম?'

'তা ছাড়া আবার কী!'

কবি-কবি ভাব ধরে বলল রানা, 'তবে দেরি কীসের, প্রিয়া, উঠে পড়ো মোর তরীতে!'

'আনাড়ি মাঝি, আবার ডুবিয়ে দিয়ো না সাগরে!'

সোহানা উঠতেই হেঁইয়া-হো হাঁক ছেড়ে ভারী বোট সাগরে নামাল রানা। কিন্তু ওকে ফেলে ওটা আরেক দিকে রওনা দিতেই তাড়াতাড়ি ব্যাঙের মত লম্বা এক লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

বৈঠা মেরে প্রথম ঢেউ পেরিয়ে গেল, তৃতীয় ঢেউ ডিঙিয়ে টের পেল, পানির গভীরতা এখানে দু'ফুটের বেশি। বৈঠা রেখে প্রপেলার পানিতে নামিয়ে চালু করল মোটর। সামনের ঢেউ চিরে বেশ গতি তুলে রওনা হলো লাইফবোট। দূরে দুলছে ইয়ট। কিন্তু ওখানে কী যেন বেখাপ্পা।

হ্যাঁ, ইয়টের পাশে এখন আরেকটা বোট। ওটা ছোট কেবিন ক্রুযার। ইয়টের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। ইয়টের ব্রিজে তিনজন লোক, এ ছাড়া ইয়টের পিছনের ডেকে আরও দু'জন।

লাইফবোট নিয়ে অনেকটা কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর রানা দেখল, আগন্তুকদের একজন নেমে গেল ডেকের নীচের কেবিনে।

আউটবোর্ড মোটর বন্ধ করে দিল রানা।

ইয়টের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে সোহানা, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, থামলে যে?'

'ওই কাজল কালো চোখে চেয়ে দেখো প্রেম-তরীর দিকে, ওখানে অনাহূত অতিথি,' বলল রানা। 'কিন্তু ওরা পছন্দ করবে না আমাদেরকে। এখন বাধ্য হয়ে চোরের মত উঠতে হবে ইয়টে। চোখ রাখো ওদের ওপর, আমি বৈঠা বাইছি।'

ঘুরে লাইফবোটের বো-তে বসল সোহানা। পিছনে বৈঠা নিয়ে বসেছে রানা। একটু পর ইয়টের দেড় শ' ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল। ইয়টের আরেক দিক লক্ষ্য করে চলেছে রানা।

কেবিন ক্রুযার যেখানে, তার উল্টো দিকে ইয়টের স্টার্নে নিঃশব্দে থামল বোট।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'সতর্ক থেকো, সোহানা। আমাদের সঙ্গে কিন্তু অস্ত্র নেই।'

সিটে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, কান পেতে রইল। ইয়টে স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করছে কেউ। গলার আওয়াজটা চেনা চেনা। স্টার্নের মই বেয়ে মাঝপথে থামল রানা। চোখ রাখল ইয়টের ডেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর চট্‌ করে নামিয়ে ফেলল মাথা।

'ওরা তিনজন। ক্যাপ্টেন হুয়ারেয ব্রিজে। মেঝেতে শুইয়ে বেঁধে রেখেছে মণ্টেযকে। একজন ঘুষি মেরেছে ক্যাপ্টেনের গালে। তাঁকে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ইয়ট।'

'কী করবে ভাবছ?' জানতে চাইল সোহানা।

'লাইফবোটের সেফটি কিটে কী আছে দেখো,' চাপা গলায় বলল রানা। 'আমি দেখছি ইয়টের পিছনের ইমার্জেন্সি লকার।'

মই বেয়ে ইয়টে উঠছে রানা, এদিকে লাইফবোটের কিট খুলল সোহানা। ফিসফিস করে বলল, 'পুরনো একটা ভেরি পিস্তল আছে।' ওটা উঁচু করে দেখাল।

পিস্তলটা প্রাচীন আমলের ফ্লেয়ার গান। প্লাস্টিকের প্যাকেটে ফ্লেয়ারও রয়েছে। প্যাকেট খুলে একটা ফ্লেয়ার নিল সোহানা, লোড করল অস্ত্রে। অন্যসব ফ্লেয়ার গায়েব হয়ে গেল ওর জ্যাকেটের পকেটে।

'শুরু হচ্ছে অভিযান,' চাপা স্বরে বলল রানা। 'দেখা যাক আমার কপালে কী জোটে।' নীরবে চোরের মত ইয়টে উঠল ও, এক ছুটে পৌঁছে গেল ব্রিজের সিঁড়ির কাছে। খুলে ফেলল বিল্ট-ইন স্টিলের চেস্ট। ভিতরে কয়েকটা লাইফ জ্যাকেট ছাড়াও পাওয়া গেল আরেকটা ফ্লেয়ার গান। ওটার ভিতর ফ্লেয়ার লোড করল রানা, ফার্স্ট এইড কিটে পেয়ে গেল ছোট একটা ফোল্ডিং নাইফ, ওটা রেখে দিল পকেটে।

ওর কনুইয়ের কাছে চলে এসেছে সোহানা, হাতের ইশারা করে ব্রিজের সিঁড়ি দেখাল রানাকে, 'লেডিয ফার্স্ট।'

'আর আমি পুওর ডগ ফলোয?' মাথা নাড়ল রানা। 'ওসব

হবে না। আমিই আগে যাব।' ধাপ টপকাতে শুরু করেছে।

এক কদম পিছনে সোহানা। তবে ব্রিজের মেঝে ছাপিয়ে উঠল না ওর মাথা। থেমে গেছে সিঁড়িতে। ডানদিক কাভার করছে।

বামদিকে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল রানা। চুপ করে অপেক্ষা করছে কথা শুনবার জন্য।

ব্রিজের সিলিঙে নড়ছে ছায়া। ভুতুড়ে আলো ফেলছে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল। ঘুষি মেরে ক্যাপ্টেন হুয়ারেজকে মেঝেতে ফেলে দিল এক লোক। ক্যাপ্টেনের পাশেই পড়ে আছে মন্টেয, তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

যথেষ্ট হয়েছে, সোজা হয়েই ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি ভাঙল রানা, তেড়ে যাওয়া ষাঁড়ের মত ঢুকে পড়ল ব্রিজে। কিন্তু থামল ওখানেই, ডাকাত দলের নেতার দিকে তাক করল প্রাচীন পিস্তল। কঠিন সুরে বলল, 'ভাল চাইলে অস্ত্রটা ফেলে দাও!'

বিচ্ছিরি ভেংচি কাটল লোকটা। 'আরে, শালা, ওটা ফ্লেয়ার গান!'

'আমারটাও তাই,' মৃদু স্বরে বলল সোহানা, রানার পাশে থেমেছে।

ওর ঠিক সামনে দুই ডাকাত। এইমাত্র ঘুরতে শুরু করেছে তাদের একজন, বোধহয় অস্ত্র তাক করবে সোহানার উপর।

ঝট্ করে এক পা সামনে বাড়ল রানা, ঘুরতে থাকা লোকটার বাহু ধরেই জোর এক হ্যাঁচকা টান দিল, পরক্ষণে ওর হাত পড়ল তার ঘাড়ে, বেজায় এক ধাক্কা দিল ব্রিজের দরজার দিকে।

ভারসাম্য হারিয়ে ব্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। থামতে পারল না খাড়া সিঁড়ির সামনে, উপরের দ্বিতীয় ধাপ থেকে দুই ডিগবাজি দিয়ে গিয়ে নামল নীচের শক্ত ডেকে। পিঠ ও কোমরে এতই ব্যথা, নড়তে পারল না। বেতো রোগীর মত কোঁ-কোঁ করছে।

তার পতনের অপেক্ষা করেনি রানা, কোমরের কাছ থেকে ফায়ার করেছে ফ্লেয়ার গান। সোহানার সামনের লোকটার বুকে লাগল শেল। ওই একই সময়ে ভুস্ আওয়াজ তুলল সোহানার ফ্লেয়ার গান, শেল লাগল দলের নেতার পেটে।

কেবিন ভরে উঠল গন্ধক পুড়বার কটু গন্ধে, সেই সঙ্গে ধূসর ধোঁয়া ছেয়ে ফেলল চারপাশ। লোক দুটোর বুক ও পেটে জ্বলছে অত্যুজ্জ্বল সাদা ফ্লেয়ার, ধাঁধিয়ে দিল চোখ। চড়-চড় আওয়াজে পুড়ছে দুই ডাকাতের পোশাক ও ত্বক।

রানা যার বুকে ফ্লেয়ার ছুঁড়েছে, উদ্দাম নাচ শুরু করতেই তার হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল। দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে সন্তান হারানো মায়ের মত। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তিন লাফে গিয়ে পড়ল নীচের ডেকে। ওখান থেকে উঠেই দেরি না করে ঝাঁপ দিল সাগরে।

দলের নেতা ছুটছে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে নামবে বলে, কিন্তু প্রথম ধাপে পা রাখবার আগেই বাম পা তুলেই বেমক্কা এক লাথি হাঁকিয়ে দিল রানা তার নিতম্বে। রকেটের গতি নিয়ে উড়ে গেল লোকটা, ধুপ্ করে পিঠ দিয়ে পড়ল ডেকে। গা পুড়তে থাকা ফ্লেয়ারের আগুন শুয়ে থাকতে দিল না। 'ওরে বাপরে... বাপরে বাপ!' বলে বিকট এক আর্তনাদ ছেড়ে দুই লাফে রেলিং টপকে গিয়ে নামল সাগরে।

ইমার্জেন্সি কিট থেকে পাওয়া ফোল্ডিং নাইফ সোহানার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'মন্টেযের দড়ি কেটে দাও।' নিজে ব্রিজের সিঁড়ির দুই রেলিঙে ভর দিয়ে সাঁই করে নেমে এল ডেকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দরজার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে সোহানা, হাতে দুই জ্বলন্ত লোকের একজনের পিস্তলটা।

ডাকাত দলের নেতার পিস্তল পড়ে আছে ডেকে। ওটা তুলে নিল রানা, খেয়াল করল এখনও উঠতে পারেনি কোঁ-কোঁ করা

লোকটা। তার পাশে পৌঁছে গেল ও, নীচের কেবিনে যাওয়ার সিঁড়ির কাছ থেকে হাঁক ছাড়ল: 'উঠে এসো! হাত মাথার ওপর! দেরি করলে বিপদে পড়বে!' গোড়ালি দিয়ে খুলে ফেলেছে দুই জুতো। নীরবে চলে গেল স্টেয়ারকেসের উঁচু হ্যাচের পিছনে।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠল এক ডাকাত, ডান হাতে পিস্তল, বাম হাতে সোহানার ল্যাপটপ কমপিউটার। সামনের দিকে চোখ। জানে না পিছনে শত্রু।

'অস্ত্র ফেলে দাও, কিন্তু কমপিউটারটা ছাড়বে না, খবরদার!' বলল রানা। 'ওটা আস্তে করে মেঝেতে নামিয়ে রাখো।'

'কেন তোমার কথা শুনব?'

'কারণ তোমার বন্ধুর পিস্তলটা এখন আমার হাতে, তোমার মাথার পিছনে তাক করা।'

সে বুঝতে পেরেছে কথাটা এসেছে পিছন থেকে, এবার খুব সাবধানে কমপিউটার ও পিস্তল রাখল ডেকে। মাথা ঘুরিয়ে দেখল হ্যাচের পাশে পড়ে আছে সঙ্গী।

'তোমার অন্য বন্ধুরা সাঁতার কাটতে গেছে,' বলল রানা। 'এই ইয়টে কী চাই?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডাকাত। 'আমরা জানতাম এদিকে কোনও বোট এলেই সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্ট আনবে। ভূমিকম্প বলে কথা! নইলে এদিকে আসে কোন্ শালা!'

'বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্যে আনা মালসামান ডাকাতি করবে?'

'জিনিসগুলো তো আমাদেরও দরকার,' বলল লোকটা।

'ওসব দিয়ে কী করবে?'

'বিক্রি করব। টাকা আসবে। সব রাস্তা বন্ধ, ত্রাণ পাঠাতে পারবে না সরকার। বিদ্যুৎ নেই, পচে গেছে সবার ফ্রিযের খাবার। ভূমিকম্পের পর এসব জিনিস ভাল চলে। মানুষ পাগল হয়ে পয়সা দেয়। তীরের কাছের গ্রামে খাবার আর পানি বিক্রি

করেই লাল হয়ে যাওয়া যায়।'

'আপাতত কিছু পাবে না,' বলল রানা।

'হয়তো তাই,' দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রেলিঙে কোমর হেলান দিল লোকটা। 'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, অথবা আমিই ঠিক বলছি।'

নীচের কেবিনের সিঁড়িতে নড়াচড়া দেখা গেল। উঠে এলেন ডক্টর সেবাস। মাথার উপর দুই হাত। পিছনে এল ডক্টর হার্নেন্দেয। এরপর এল এক মেক্সিকান তরুণ। চুল কেটেছে টম ক্রুযের স্টাইলে। পরনে নতুন জিন্স ও শার্ট। পায়ে নকশা কাটা দামি কাউবয় বুট। একহাত তরুণী ডাক্তারের কাঁধে, অন্যহাতে পিস্তলের নল ঠেসে ধরেছে বন্দিনীর মাথায়।

'তোমার পিস্তল নামিয়ে রাখবে,' রানার উদ্দেশে বলল। 'নইলে এই মেয়ের মগজ উড়িয়ে দেব।'

'খুব সাবধান,' উল্টো সতর্ক করল রানা। 'যা বলছ তাতে আমার সঙ্গিনী খেপে যেতে পারে।'

ব্রিজের সিঁড়ির উপর ধাপে সোহানা, অস্ত্র তাক করেছে তরুণের মাথায়।

রেলিঙে হেলান দেয়া লোকটা চট্ করে সোহানাকে দেখে নিল। তার মনে হলো না ওই মেয়েকে পাত্তা দেয়া উচিত। বলল, 'এই শালার পিস্তল কেড়ে নাও।'

ডেক ছেড়ে উঠল কোঁ-কোঁ, দাঁতে দাঁত চেপে রানার দিকে এগোল।

দেরি না করে তার ডান হাঁটুর বাটিতে গুলি করল রানা।

ধুপ্ করে আবারও ডেকে পড়ল লোকটা, ভীষণ ব্যথায় গড়াতে শুরু করেছে এদিক ওদিক। দুই হাতে চেপে ধরেছে ভাঙা হাঁটু।

দামি পোশাক পরনে তরুণ অস্ত্র সরাল ডক্টর হার্নেন্দেযের উপর থেকে, নল তাক করতে চায় রানার বুকে।

'শেষ সুযোগ পিস্তল ফেলার,' বলল সোহানা।

'ও কিন্তু পিস্তলে দারুণ,' বলল রানা। 'এক সেকেণ্ড লাগবে না, তোমার দুই চোখের মাঝে আরেকটা চোখ তৈরি করবে।'

চট্ করে সোহানাকে দেখল তরুণ। দুই হাতে পিস্তলের বাঁট ধরেছে সুন্দরী মেয়েটা। আঙুল ট্রিগারে। কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল তরুণ, তারপর আস্তে করে ডেকে নামিয়ে রাখল পিস্তল। দেরি না করেই ডেকে উঠে এল ডক্টর হার্নেন্দেয।

'ডেকে উঠে বন্ধুদের পাশে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল সোহানা।

অন্য দুই ডাকাতের পাশে থামল তরুণ।

'ঠিক আছে, এবার নেমে পড়ো সাগরে,' বলল রানা।

রেলিঙের লোকটা আপত্তির সুরে বলতে শুরু করল, 'কিন্তু...'

'জীবিত বা মৃত, পানিতে ভিজতেই হবে,' সহজ সুরে বলল রানা।

দুই সুস্থ ডাকাত টেনে তুলল আহত সঙ্গীকে, রেলিং পার করে ফেলে দিল সাগরে। নিজেরাও নেমে পড়ল পানিতে।

শেষ ঝপাস্ শুনে ইয়টের স্টার্নে গেল রানা, ডেক থেকে তুলে নিল এক ক্যান অকটেন। ওটা নিয়ে গিয়ে থামল ছোট কেবিন ক্রুযারের পাশে। ক্যানের মুখ খুলে গলগল করে তেল ঢালল ডাকাতের নৌযানের ডেকে। কাজ শেষে খুলে দিল ক্রুযারের দড়ি। জোর এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল জলযানটাকে।

পাঁচ তস্কর সাঁতার কাটছে কেবিন ক্রুযারে উঠতে।

কিন্তু ওই জলযান তিরিশ ফুট সরতেই ওটার ডেক লক্ষ্য করে ফ্রেয়ার গান তাক করল রানা, স্পর্শ করল ট্রিগার। ধুপ্ আওয়াজ তুলে অকটেনে ভেজা ডেকে গিয়ে পড়ল ফ্রেয়ার, দপ্ করে জ্বলে উঠল কমলা আগুন।

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠলেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ ও মণ্টেয।

এবার তীরে উঠতে চাইলে কয়েক শ' গজ সাঁতরাতে হবে

লুটেরাদের।

'আপনারা কি সুস্থ?' ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল রানা।

'নিশ্চয়ই,' সমস্বরে বলল দু'জন।

'তা হলে ইঞ্জিন চালু করে ওদিকের ওই ডকে ইয়ট নিয়ে রাখুন। ডক্টর ভেলেসকেয আর গার্ভেইসকে তুলে নেব।'

তিন

কয়েক মিনিট পর ডক থেকে ইয়টে উঠল ডক্টর ভেলেসকেয ও মেট গার্ভেইস। একটু আগে ছুটতে ছুটতে সৈকতে এসেছে। কয়েকজনের কাছে শুনেছে সাগরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ওদের ইয়ট। ব্যস্ত হয়ে হাজির হয়েছে, তারপর দেখল ইয়ট চলেছে মিউনিসিপ্যাল ডকের দিকে। আরেক দৌড়ে ওখানে পৌঁছেছে।

পাঁচ মিনিট পর আবারও রওনা হলো ইয়ট। চলেছে দক্ষিণ-পুব উপকূল পাশে রেখে।

রাত নামবার পর বিদ্যুৎহীন আরও তিনটে গ্রামের পাশে থামল ওদের ইয়ট, ওটা থেকে নামিয়ে দেয়া হলো পানির কেস ও ক্যান করা খাবার। আরও দেয়া হলো ফ্ল্যাশলাইট, জেনারেটার ও অকটেনের ক্যান। প্রতিবার প্রথম বোটে করে গ্রামে গেলেন তিন ডাক্তার, সঙ্গে দরকারী মেডিকেল কিট। ইমার্জেন্সি কেসগুলো জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করলেন তাঁরা। যারা ওষুধ দিলেই সেরে উঠবে, তাদেরকে দেয়া হলো দরকারী ওষুধ, বুঝিয়ে দেয়া হলো কীভাবে খেতে হবে বা লাগাতে হবে। রোগী দেখা শেষ হলে ডাক্তারদেরকে প্রায় তাড়িয়ে সৈকতে আনল রানা ও সোহানা,

মেট গার্ভেইসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল ইয়টে। প্রতিবার অন্যদের শেষে ইয়টে ফিরল দুই বিসিআই এজেন্ট। ওরা পৌঁছে গেলেই আবারও ছাড়া হলো ইয়ট। উপকূল ঘেঁষে চলল টাপাচুলার দিকে।

চতুর্থ দিন ভোরে কেবিনে ঘুমাচ্ছে ক্লান্ত রানা ও সোহানা, এমন সময় ওদের কেবিনের দরজায় টোকা দিল মেট গার্ভেইস।

বিছানা ছেড়ে দরজা খুলল রানা। 'বলুন?'

'টাপাচুলা দেখা যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ চাইছেন আপনারা ব্রিজে আসুন।'

মেট চলে যাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই ডেকে পৌঁছে গেল রানা ও সোহানা। ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় দেখল, কেন তোলা হয়েছে ঘুম থেকে। উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে টাকানা, মেক্সিকোর দ্বিতীয় উঁচু চূড়া। উপকূল থেকে অনেক ভিতরে আকাশের জমিতে মাথা উঁচু করেছে গাঢ় নীল পিরামিড। ধূসর সকালে চূড়া থেকে পুবে ভেসে যাচ্ছে কাদাটে ধোঁয়া।

'ওটা টেকনিকালি অ্যাকটিভ, কিন্তু উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের পর আর অগ্ন্যুৎপাত করেনি,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'রেডিয়োতে কি বলেছে লাভা উদ্গিরণ করবে?' জানতে চাইল সোহানা। 'লোক সরিয়ে নিতে বলেছে?'

'কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভূমিকম্প কিছু নাড়িয়ে দিয়ে থাকতে পারে। যখন তখন ফাটল ধরবে জমিতে। রাস্তা সব বন্ধ, তাই বিজ্ঞানীরা আঁচ করতে পারছেন না কী ঘটবে।'

'শহর থেকে আগ্নেয়গিরি কতটা দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'দেখতে যতটা কাছে মনে হয়, তার চেয়ে অনেক দূরে,' বললেন হুয়ারেজ। 'চূড়া চার হাজার মিটার উঁচু, তাই খুব কাছে মনে হয়। ওই আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত না করলেও কাজের শেষ থাকবে না. বিশ মিনিটের ভেতর পৌঁছে যাব টাপাচুলায়।'

ব্রিজ ছেড়ে নীচে গেল সোহানা, টোকা দিল ডাক্তারদের দুই

কেবিনে। 'ডক্টর্স, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি টাপাচুলায়।'

কয়েক মিনিট পর ডেকে জড় হলো সবাই, নাস্তা হিসাবে খেয়ে নিল ডিম ভাজা, হাতরুটি, কয়েক রকমের ফল, সঙ্গে কড়া কফি। বার বার সবার চোখ গেল দূরের চূড়ার দিকে। ওখানে ভলকে ভলকে উঠছে কাদাটে ধোঁয়া, ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। সাগর-পথে শহরের দিকে যাওয়ার সময় ওরা দেখল বিপুল ক্ষতি হয়েছে বাড়িঘরের। ভূমিকম্পে ধসে গেছে অসংখ্য দালান, স্তূপ তৈরি করেছে ভাঙা ইঁট, কাত হয়ে পড়ে আছে অনেক দেয়াল। যেসব বাড়ি এখনও আস্ত, আরেকটা ভূমিকম্প হলেই সেগুলোও ভূমিসাৎ হবে। কোথাও কোথাও একেবারে উপড়ে গেছে ইলেকট্রিসিটি ও টেলিফোন পোল, পার্ক করা গাড়ির উপর অথবা রাস্তায় পড়ে আছে কেব্‌ল্। ইয়টের ডেক থেকে দেখা গেল নানা জায়গায় জ্বলছে আগুন। ওখানে ফেটে গেছে মাটির নীচের প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপ।

এক এক করে টেবিল ছাড়ল সবাই, তীরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিতে হবে। উপকূলে বেশ কিছু গ্রাম ও ছোট শহরে ত্রাণ বিতরণ করে ঢের বেড়ে গেছে ওদের দক্ষতা। ওরা জানে কী করতে হবে দুর্গত এলাকায়।

আগেই মেডিকেল কিট গুছিয়ে নিয়েছেন ডাক্তাররা। প্রত্যেকের জন্য দুটো করে বড় ব্যাকপ্যাক ভরা ওষুধ। আগুনে পোড়া রোগীর চিকিৎসা করতে হয়েছে আগের শহরে, তাই এবার বার্ন মেডিকেশন ও পেইনকিলার বেশি করে নিতে ভুল করেননি তাঁরা। বাড়ি ধস ও দেয়াল ধসের কারণে অনেকেই আহত, তাই যথেষ্ট পরিমাণে নেয়া হয়েছে স্প্লিন্ট, প্লাস্টার ও সুচার। বাধ্য হলে কেটে ফেলতে হতে পারে হাত বা পা, তাই রয়েছে অ্যামপিউটেশন কিট

রানা, সোহানা ও গার্ভেইস ব্যস্ত কেসগুলোতে খাবার ও পানি

গুছিয়ে রাখতে। পাশেই জেনারেটার এবং অকটেনের ভারী সব ক্যান। অভিজ্ঞতা থেকে ওরা জানে, প্রথমবার তীরে নামলেই একদল সৎ মানুষ ব্যস্ত হয়ে উঠবে সাহায্য করতে। তাদের সঙ্গেই থাকবে নানা রোগের রোগী। কাজেই প্রথম ট্রিপের জন্যই রাখা হয়েছে ফ্ল্যাশলাইট ও ফার্স্ট এইড কিট। এ ছাড়া রয়েছে দালান চাপা আহত মানুষকে খুঁড়ে বের করবার যন্ত্রপাতি। বাদ পড়েনি অস্থায়ী ছাউনি তৈরির জন্য তেরপলও।

সকাল সাতটায় শেষ হলো প্যাক করার কাজ। দেখা গেল ইতিমধ্যেই সৈকতে জড় হতে শুরু করেছে মানুষ। প্রথমে ভারী জিনিসগুলো লাইফবোটে সাজিয়ে রাখল ওরা, তারপর সাগরে নামিয়ে দিল বোট। শিকলের মত একটা লাইন তৈরি করে দাঁড়াল, হাতে হাতে বাক্স ও ঝুলি পৌঁছে দিল শেষজনের কাছে। সে মই থেকে নামিয়ে দিল জিনিসপত্র বোটে। কাজ শেষ হতে বোঝা গেল একটু বেশি ভারী হয়ে গেছে নৌকা। কাজেই ভারসাম্য রাখতে খুব সাবধানে নিজেরা নানাদিকে বসল।

লাইফবোটে ওরা ছয়জন— তিন ডাক্তার, রানা, সোহানা ও মেট গার্ভেইস। শেষজনের দায়িত্ব মোটর ব্যবহার করে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেয়া। ঢেউয়ের মতিগতি বুঝে সঠিক অ্যাংগেল অনুযায়ী বোট চালাল সে। তীরের কাছে যাওয়ার পর তুলে নিল প্রপেলার। কয়েক ফুট যাওয়ার পর বালিতে আটকে গেল বোটের তলি। নেমে পড়ল রানা ও সোহানা, টেনে হিঁচড়ে তীরে তুলে ফেলল বোট।

ওরা কী নিয়ে এসেছে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন ক'জন মহিলা। হাততালি দিল পুরুষরা, চোখে কৃতজ্ঞতা।

তিন ডাক্তারকে ঘিরে ফেলল কয়েকজন মিলে, পথ দেখাল কোন্ দিকে স্থানীয় হাসপাতাল। তারাই বহন করছে মেডিকেল সাপ্লাই। অন্যান্য মাল সৈকতে নামাল রানা, সোহানা ও গার্ভেইস।

কাজটা শেষে আবারও সাগরে লাইফবোট ভাসাল ওরা, আরেক দফা মাল আনতে রওনা হলো গার্ভেইস।

তীরে রয়ে গেল রানা ও সোহানা, কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে জেনারেটার ও তেলের ক্যান নিয়ে গেল হাসপাতালে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেয়ার পর আবারও ফিরল সৈকতে। দ্বিতীয় জেনারেটার নিয়ে রওনা হবে, এমন সময় দ্বিতীয় দফা ত্রাণ নিয়ে এল গার্ভেইস। এবারের জিনিসপত্র ও জেনারেটার নিয়ে শহরের আরেক প্রান্তের ক্লিনিকে গেল ওরা।

সারাদিন ও রাতের বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত রইল রানারা। শহরের নানান এলাকায় বাটোয়ারা করা হলো ত্রাণ। ওদের সহায়তার কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ওরা শুনল, ওদের কীর্তি শুনে একদল সাহসী মানুষ শাবল, কোদাল, ট্র্যাক্টর ও ট্রাক নিয়ে কাজে নেমে পড়েছে উপকূলীয় রাস্তা পরিষ্কার করতে। এখনও যাদের বাড়ি আস্ত, তারাও স্থান দিচ্ছে দুর্গতদেরকে। অনেকে মুখ ফুটে বলেই ফেলল, রানাদের কারণেই সহযোগিতার এক মিষ্টি আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে শহরে।

পরবর্তী পাঁচ দিন বার বার আঘাত হানল আফটার শক বা হালকা ভূমিকম্প। প্রথমগুলো বেশ জোরালো, অনেকক্ষণ ধরে কাঁপল জমি। তবে পরের দিনগুলোয় আস্তে আস্তে মৃদু হলো কম্পন।

ষষ্ঠ দিন বিকেলে ইয়টের পিছন ডেকে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ, এমন সময় লাইফবোটে করে পৌঁছল রানা, সোহানা ও অন্যরা। ওরা খেয়াল করল থমথম করছে ক্যাপ্টেনের মুখ।

রানার কানে ফিসফিস করে বলল সোহানা, 'আমরা বোধহয় খারাপ খবর পাব।'

সবাই ইয়টে উঠে জড় হতেই বার কয়েক কেশে গলা পরিষ্কার

করলেন ক্যাপ্টেন হুয়ারেজ, কারও চোখে না চেয়েই বললেন, 'আজ বিকেলে মেসেজ পাঠিয়েছে চার্টার কোম্পানি। জানিয়েছে পরিস্থিতি বুঝেই ধৈর্য ধরেছে তারা, কিন্তু এবার ইয়ট ফিরিয়ে নিতে হবে আকাপুলকো বন্দরে।'

'যেতে হবে কেন?' জানতে চাইল সোহানা, 'যথেষ্ট টাকা রয়েছে, আমরা নিজেরাই তো আবারও ভাড়া নিতে পারি এই ইয়ট। আমরা তো কোনও ক্ষতি করছি না জাহাজের।'

'তারা আর ভাড়া দেবে না,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'আপনারা সাপ্লাই বয়ে নেয়ার জন্যে এটা ব্যবহার করছেন। তারা ভয় পাচ্ছে নষ্ট হবে লাকযারি ইয়ট। এটাও জানে, এ কাজ না করে উপায়ও নেই; কিছু নষ্ট হলে মেরামতের টাকাও আপনারাই দেবেন, কিন্তু মেনে চলতে হবে তাদের শেডিউল। চারদিন পর আকাপুলকোতে পৌঁছবে আরেক পার্টি, তারা আশা করবে ইয়ট তৈরি থাকবে। আগেই চুক্তি হয়ে গেছে।' দু'কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, বুঝিয়ে দিলেন তিনি নাচার।

'কতটা সময় হাতে পাব আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'আজ রাতে ফিরতি পথে রওনা হব। পৌঁছবার পর একদিন লাগবে ডেক পরিষ্কার ও পলিশে, সার্ভিস করতে হবে ইঞ্জিনগুলো, নতুন করে হোল্ডে তুলতে হবে সাপ্লাই। আসলে বাড়তি কোনও সময় দেয়ার উপায় নেই, সরি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'দু'দিন আগেই সব সাপ্লাই নামিয়ে নিয়েছি, কাজেই ইয়ট না থাকলেও মস্ত কোনও ক্ষতি হবে না। ...তুমি কী বলো, সোহানা? তুমি ইয়টের সঙ্গে আকাপুলকো ফিরতে চাও, ওখান থেকে বিমানে করে...'

'কক্ষনো না,' দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিল সোহানা। 'আরও কয়েক দিন থাকা উচিত। কারও কারও মুখে শুনেছি আগ্নেয়গিরির কাছের সব গ্রামে এখনও মেডিকেল সেবা পৌঁছায়নি। ডাক্তার লাগবে

ওদের, সেই সঙ্গে দরকারী ওষুধ, খাবার, পানি।'

'আপনি কি সত্যিই যেতে চান ওদিকে?' বললেন ক্যাপ্টেন। 'শুনেছি খুব দুর্গম এলাকা। কিছু মনে করবেন না, কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেছি আপনাকে, কিন্তু এতটা কি সহ্য করতে পারে কোনও ভদ্রমহিলা? আপনি বরং...'

'আমরা গর্বিত আপনার জন্য, ম্যাম, কিন্তু...' খেই ধরল মেট গার্ভেইস, তবে সোহানার কঠিন মুখ দেখে থেমে গেল। অসহায় চোখে রানার দিকে চাইল সে।

চট্ করে একবার সোহানাকে দেখে নিয়ে বলল রানা, 'চিন্তা করবেন না, আমরা সতর্ক থাকব। পাহাড়ি মানুষগুলোর কাছে রসদ ও ডাক্তারী চিকিৎসা পৌঁছে দিতে হবে। এবার কেবিনে গিয়ে যার যার মালপত্র গুছিয়ে নেব, নইলে রওনা হতে দেরি হবে ক্যাপ্টেনের।'

ডক্টর রিকো সেবাস বললেন, 'আমার বোধহয় ইয়টের সঙ্গে ফিরে যাওয়াই ভাল। হাসপাতালের ছুটি ফুরিয়ে গেছে।'

অন্য দুই ডাক্তারের দিকে চাইল রানা। 'ইয়াং ডক্টর্স?'

তরুণী ডক্টর ভেলেসকেয বলল, 'আরও কয়েকদিনের জন্য থাকছি ডক্টর হার্নেন্দেয আর আমি। আর আপনারা আমাকে অ্যাডোরা বলে ডাকলে খুশি হব। ক'দিন হলো পাশাপাশি কাজ করছি, কিন্তু মনে হয় হাজার বছর ধরে আপনাদেরকে চিনি।'

ডক্টর হার্নেন্দেয বলল, 'আর আমি খুশি হব গ্যাবরিয়েলা নামে ডাকলে।'

দশ মিনিটের ভিতর আবারও পিছনের ডেকে জড় হলো রানা, সোহানা ও দুই ডাক্তার। এখন ওদের সঙ্গে ব্যাকপ্যাক। ওদেরকে লাইফবোটে করে সৈকতে পৌঁছে দিল মেট গার্ভেইস ও স্টুয়ার্ড মন্টেয। ওরা সবাই নেমে পড়বার পর দুই ক্রুকে বিদায় জানাল রানা ও সোহানা, ঠেলে গভীর পানিতে পাঠিয়ে দিল লাইফবোট।

'আমরা সত্যিই আপনাদেরকে খুব মিস করব,' অন্তর থেকে বলল মেট গার্ভেইস।

'কোনও বন্ধুকে মিস করা উচিত নয় অন্য বন্ধুর,' বলল সোহানা। 'আবার যখন দেখা হবে, একে অপরকে জানাব নতুন সব অভিযানের গল্প।'

বিষণ্ন মনে রওনা হয়ে গেল দুই ক্রু, একটু পর পৌঁছে গেল ইয়টে। সোহানা এবং ওর নিজের ব্যাকপ্যাক কাঁধে তুলে নিল রানা। আপত্তি তুলল সোহানা, নিজ ব্যাগ নিজেই বহন করবে। ওরটা ফেরত দিতে হলো। সৈকত পেরিয়ে রাস্তার দিকে চলল ওরা। ওদিকেই রয়েছে স্কুলভবন, অস্থায়ীভাবে ওটা ব্যবহার করা হচ্ছে হাসপাতাল হিসাবে।

'আমরা কিন্তু আটকা পড়ে গেলাম, সোহানা,' বলল রানা।

'এমন এক ট্রপিকাল সৈকতের শহরে, যেখানে আছে পছন্দের মানুষটাও?' মিষ্টি করে হাসল সোহানা। 'বাকি জীবন আটকা পড়তে আপত্তি নেই আমার।'

'যে অপরূপা মেয়ে সারাদিন পাথর বা ইঁট সরাচ্ছে, রানওয়ের ফাটল বুজে দিচ্ছে, তার মুখে এসব?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এ সম্ভব বোধহয় বাঙালি একজন মেয়ের পক্ষেই।'

ধনুক ভুরু নাচাল সোহানা। 'উচিত কাজ করছি কি না সেটাই মূল কথা।'

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'এবার চলো গিয়ে দেখি কোন্ গাছের নীচে দু'জনকে থাকতে দেবে!'

হাঁটতে হাঁটতে বলল সোহানা, 'আগামীকাল পাহাড়ে যাওয়ার জন্যে রিলিফ পার্টি জড় করতে হবে।'

চার

পরদিন দুপুরে বারোজন ভলান্টিয়ার নিয়ে তপ্ত রোদের ভিতর ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে চেপে বসল রানা ও সোহানা। এবড়োখেবড়ো পথে চলল গাড়ি ভলকান টাকানা পাহাড়ের দিকে। ওদের পাশেই দুই ডাক্তার গ্যাবরিয়েলা ও অ্যাডোরা। গত কয়েকদিন একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যাদের সঙ্গে আন্তরিকতা হয়েছে, তাদের কয়েকজন এসেছে ভলান্টিয়ার হিসাবে। তাদের ভিতর রয়েছে বিশ বছর বয়সী দুই যমজ ভাই, নাম জেরি ও রেইম গোমেয। ওরা বড় হয়েছে আগ্নেয়গিরির কাছের গ্রামে। এ ছাড়া রয়েছে চুপচাপ এক যুবক, নাম কোসে তালামেন্তেয। টাপাচুলায় ভূমিকম্প হওয়ার আগে পেশায় ছিল উকিল। তার গোঁফ ঝোপের মত, ঢেকে ফেলেছে দুই ঠোঁট। হাসছে না বিরক্ত, বুঝবার উপায় নেই।

শহর ফুরাতেই শুরু হলো আদিগন্ত ফসলের সবুজ মাঠ। আরও বহু দূরে আকাশের বুকে সুনীল টাকানা পর্বত। ওদিকে চেয়ে রইল সোহানা।

ওকে খেয়াল করেছে অ্যাডোরা ভেলেসকেয, নিচু স্বরে বলল, 'আর কোনও ধোঁয়া নেই। হয়তো নিভে গেছে বুকের জ্বালা। আবার এক শ' বছর পর জেগে উঠবে।'

'অথবা এখুনি আবার আগুনে-লাভা আর ছাই উগরে দেবে,' বলল কোসে তালামেন্তেয। 'হয়তো চাপা দেবে আমাদেরকে। মায়ান ভাষায় টাকানা মানে আগুনের বাড়ি।'

'আশা করি নাম জাহির করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে না,' মন্তব্য করল রানা।

আরও একঘণ্টা পর ওরা পৌঁছে গেল ছোট শহর ইউনিয়ন হুয়ারেজে। সব মিলে সদর রাস্তায় চারটে ইঁটের দালান। দুটো প্রায় বিধ্বস্ত। খসে পড়েছে অন্য দুই বাড়ির ছাতের টালি।

রাস্তায় কয়েকজনকে দেখে ট্রাক থামাল রানা, কথা বলল তাদের সঙ্গে। জানা গেল, সাত কিলোমিটার দূরে ফুরিয়ে গেছে রাস্তা।

'তারপর কী?' রেইম গোমেযের কাছে জানতে চাইল রানা।

'হাঁটা-পথ ওখান থেকে শুরু,' বলল যুবক, 'ওটা থেকে আরও সরু সব পথ গেছে উপরের পাহাড়ি গ্রামে।'

সোহানা জিজ্ঞেস করল জেরির কাছে, 'উপরের অবস্থা কী?'

যুবক জানাল: 'উপরে ভীষণ শীত পড়বে। চূড়া তেরো হাজার ফুট উঁচু।'

'সেজন্য আমরা তৈরি,' বলল সোহানা। 'ইয়টে ওঠার সময় ফ্লিসের লাইনিং দেয়া গরম পোশাক এনেছি। হাওয়া শুরু হলে রাতে বেশ শীত পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে।'

'আমিও গরম পোশাক আনতে ভুলিনি,' বলল ডক্টর অ্যাডোরা। 'গ্যাবরিয়েলাও এনেছে, খোলা আকাশের নীচে ঘুমাতে অসুবিধে হবে না।'

স্থানীয়দের কথা শুনছিল রেইম গোমেয, এবার বলল, 'ভূমিকম্পের সময় অ্যাভালাঞ্চ হয়েছে। এসব গ্রামের জলাশয় এখন বিষাক্ত। ডাক্তারদের জন্যে অপেক্ষা করছে অনেকে। গুরুতর আহতদেরকে আকাশ পথে সরিয়ে নিতে হবে।'

'কোনও গ্রামের কাছে গেলেই দেখতে হবে কোথায় নামতে পারবে হেলিকপ্টার,' বলল রানা।

'আমি ঘুরে আসি চার্চ থেকে,' ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ডক্টর

অ্যাডোরা। আগেই চার্চে গেছে ডক্টর গ্যাবরিয়েলা। ওখানে জড় হয়েছে রোগীরা। 'পাহাড়ি কারও সঙ্গে দেখা হতে পারে, আপনারা কি আমার সঙ্গে যাবেন?'

পাঁচ মিনিট পর চার্চে পৌঁছে গেল ওরা।

জানা গেল পাহাড়ি পাঁচটি পরিবার এসেছে সমতলে। তাদের সঙ্গে কথা বলল রানা।

পিচ্চি দুই ছেলে রীতিমত অধিকার নিয়ে বসে পড়ল সোহানার কোল জুড়ে। অবাক, সুন্দরী আন্টির চুল এত লম্বা কেন? ভক্ত হয়ে গেল বাঙালি ভাষার মিষ্টি, আদুরে গান শুনে। আন্টির থলি থেকে বেরোল প্রোটিন বার, কাজু বাদাম ও চমৎকার চকলেট।

আধঘণ্টা পর চার্চের সামনে ট্রাক রাখল অধৈর্য ড্রাইভার। শেষ কয়েক মাইল আরামে যেতে সবাই চেপে বসল ট্রাকের পিছনের কাঠের পাটাতনে। বেশিক্ষণ লাগল না পথের শেষে পৌঁছে যেতে। ওখানে পাথর স্তম্ভ, পাশ দিয়ে শুরু হয়েছে ফুট ট্রেইল।

ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ভলান্টিয়াররা, মালপত্রের ভারী বোঝা পিঠে একে অপরের লোড স্ট্র্যাপ পরীক্ষা করল, তারপর শুরু হলো অভিযাত্রা।

খাড়া পাহাড়ি পথ। কঠিন শ্রম। উঠবার গতি ওদের ধীর।

প্রথম কিছুদূর ছাঁটা ছিল পথের চারপাশের জঙ্গল, কিন্তু একটু পর দু'পাশ থেকে ওদের দিকে চেপে এল ঘন ঝোপঝাড় ও বড় গাছ। মাথার উপর সবুজ চাঁদোয়া।

অনেকক্ষণ উঠবার পর সন্ধ্যার আগে একটা সমতল জায়গায় থামল ওরা। চারপাশের গাছগুলোয় এক ধরনের ফল, মনে হলো ছোট আকারের অ্যাভোকাডো।

রেইম গোমেয জানাল, ওগুলো ক্রিয়োলো।

ক্যাম্প করে রাতের খাবার সেরে নিল ওরা, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল পরিশ্রান্ত দেহে।

ভোরে সূর্য ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ায় হালকা নাস্তা করেই রওনা হলো। পাহাড়ি পথে আরও উঠবার পর নিচু এলাকার গাছ একে একে বিদায় নিল, সে জায়গা দখল করল আকাশছোঁয়া পাইন।

একাধারে তিনদিন এই রুটিন মেনে চলল ওরা।

প্রতি ভোরে ক্যাম্প গুটিয়ে নিল, থামল গিয়ে পরের গ্রামে।

চিকিৎসা দেয়া হলো আহত বা রোগীদেরকে।

ডাক্তারদের পাশে থাকল সোহানা, ওষুধ ও রসদের দায়িত্ব ওর। ডাক্তার যখন পরের রোগী দেখল, আহতের ব্যাণ্ডেজ বাঁধল, খুলে বলল কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ওষুধ।

এদিকে রানা এবং ভলাণ্টিয়াররা স্থানীয় চাষীদের সঙ্গে মিলে মেরামত করল বাড়িঘর, সারাই করল ভাঙা পাইপ ও ওয়্যারিং, ঠিক করল নষ্ট জেনারেটার, যাতে পাওয়া যায় ইলেকট্রিসিটি।

পাহাড়ে পঞ্চম দিনে একটি গ্রামের ধারে ক্যাম্প ফেলল ওরা। উঠে এসেছে আড়াই হাজার মিটার উপরে।

রাতে শুয়ে পড়বার আগে সোহানাকে বলল রানা, 'আমরা ঠিক কাজই করেছি মানুষগুলোকে সাহায্য করে।'

'হ্যাঁ, আমাদের দেশের গরীব মানুষের মতই এদেরও দেখার কেউ নেই,' বলল সোহানা। 'নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছ বলে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে আমার।'

'তার বড় একটা অংশ তোমাকে ফেরত দিলাম,' হাসল রানা। 'কারও চেয়ে কম করছ না, বরং বেশি।'

পরদিন ভোরে ওরা চলল শেষ গ্রামের দিকে। আগের গ্রামের মেয়র জানিয়েছে, ওটার পর আর কোনও জনপদ নেই।

পাহাড়ি সংকীর্ণ পথ উঠে গেছে প্রায় খাড়াভাবে।

অন্যরা অনেক পিছনে পড়ে গেল, একসময় বাধ্য হয়ে থামল

রানা ও সোহানা।

বিশ মিনিট পর নীচে দেখা দিল ভলাণ্টিয়াররা। ওদেরকে দেখতে পেয়েছে। আবারও রওনা হলো দুই বিসিআই এজেন্ট।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবারও বহু দূরে চলে এল ওরা। একটা ঢালের গোড়ায় পৌঁছে গেছে। এদিক দিয়ে নেমেছে অ্যাভালাঞ্চ। ধুলোবালি ও পাথর ঢেকে দিয়েছে পথের একাংশ।

এখানে পড়েছে মস্ত এক খণ্ড ব্যাসল্ট।

জায়গাটা ঘুরে সাবধানে এগোতে গিয়েও থামল ওরা।

চাপড়া ব্যাসল্ট প্রাকৃতিক নয়। চারকোনা দেয়ালের অংশ।

রানা ও সোহানা কাছ থেকে দেখল, পাথরের বুকে খোদাই করা হয়েছে এক লোকের ছবি। টিয়া পাখির চঞ্চুর মত নাকওয়ালা মানুষ সে। অভিজাত মায়ানদের মতই কপাল ও করোটি। মাথায় পালকের মুকুট। পাশেই পিলারের মত জটিল মায়ান সিম্বল।

'মায়ান লেখা,' বলল রানা।

পরস্পরের চোখে চাইল ওরা, তারপর পাহাড়ের এক পাশে চোখ স্থির হলো ওদের। ওদিকে অনেকটা উপরে ঘন সবুজ ঝোপঝাড়। ওখান থেকেই নেমেছে অ্যাভালাঞ্চ।

'চলো, উপরে গিয়ে দেখি কী আছে,' প্রস্তাব দিল রানা।

রাজি হয়ে গেল সোহানা।

সাবধানে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল সমতল এক জায়গায়। এদিকটা চাতালের মত। দৈর্ঘ্যে তিরিশ ফুট, প্রস্থে বিশ ফুট। গাছ দিয়ে সীমানা করা, কিন্তু ভিতরের অংশে কোনও গাছ জন্মেনি। এক ধারে চাতালের এক অংশ ভাঙা, ওখান থেকেই নীচে পড়েছে ব্যাসল্ট খণ্ডটা।

ছোরা বের করে সামনের জমি খুঁড়ল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর শুনল কর্কশ আওয়াজ। ফলা আটকে গেছে কঠিন কিছুতে।

চারপাশ দেখে নিয়ে সোহানা বলল, 'এটা কোনও প্যাটিও, না কোনও প্রবেশদ্বার?'

পাহাড়ের খাড়া দেয়ালে চোখ স্থির হলো ওদের। নীচে এক জায়গায় জমেছে ধুলোবালি। এসব পড়েছে পাহাড়ের খানিকটা উপর থেকে। জায়গাটা গর্তের মত।

'বড় ব্যাসল্টের খণ্ড পড়ার সময় অমন হয়েছে,' বলল রানা। কয়েকবার ছোরা দিয়ে খোঁচাখুঁচি করল গর্তের মত জায়গায়। তারপর ছোরা রেখে ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল ফোল্ডিং কোদাল। ওটা উঁচু করে পাহাড়ের দেয়াল থেকে কাদামাটি ও ধুলোবালি সরাতে শুরু করেছে। তিন সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল পাথুরে দেয়াল।

'সাবধান,' বলল সোহানা, 'এদিকের আস্ত পাহাড় নেমে আসতে পারে।' কথাটা বলেছে বটে, কিন্তু পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলল ব্যাকপ্যাক। বের করল হ্যাচেট। ওটা দিয়ে জ্বালানির জন্য শুকনো ডাল কাটে। রানার পাশে দাঁড়িয়ে গেল নতুন কাজে। কাদামাটি ও ধুলোবালি সরাবার পর দেখা গেল দেয়ালের মত কালো আগ্নেয়শিলা। বার কয়েক কোদাল দিয়ে ওখানে গুঁতো দিল রানা। ঝুরঝুরে পামিস, ছোট ছোট খণ্ড হয়ে খসে পড়ছে।

'ওটা দেবে?' হ্যাচেট দেখাল রানা।

'নাও।' দিয়ে দিল সোহানা।

আগ্নেয়শিলার উপর হ্যাচেটের হামলা শুরু করল রানা। কাজের ফাঁকে বলল, 'এক সময়ে এদিক দিয়ে পর্দার মত করে লাভা নেমেছে।'

'প্রবেশ পথের উপর দিয়ে?'

'এখনও জানি না,' বলল রানা, 'একটু পর জানব প্রবেশপথ না সাধারণ পাথুরে দেয়াল।' হ্যাচেট ব্যবহার করে পামিস খসিয়ে আনছে। একটু পর পড়ল বড় একটা টুকরো। ওটা যেখানে ছিল,

সেখানে দেখা দিয়েছে কালো গহ্বর।

'জায়গাটা আসলে কী?' আনমনে বলল সোহানা। 'কোনও মায়ান সমাধি?'

'পাহাড়ের এত ওপরে? মনে হয় না। মায়ানদের কোনও মন্দির হতে পারে। সম্ভবত আগ্নেয়গিরির দেবতার জন্যে তৈরি করেছিল।'

গর্তটা বড় করে তুলছে রানা। একটু পর ফ্লাশলাইটের বাতি ফেলল ওই খোঁড়লে। পরের তিন মিনিটে ঢুকবার মত জায়গা তৈরি হলো। সরু পথে রওনা হয়ে বলল রানা, 'এসো, প্রাচীন কোনও বাড়ি মনে হচ্ছে।'

ভিতর অংশ বড় ঘরের মত। নিরেট পাথর দিয়ে তৈরি। দেয়াল সাদা। তার বুকে আঁকা হয়েছে রঙিন ছবি। মায়ান পুরুষ, নারী ও ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত দেবতা। দেবতাদের উদ্দেশে বলি দেয়া হচ্ছে মানুষ। কেউ কেউ জিভ কেটে ভেট দিচ্ছে দেবতাকে। প্রতিটি দেয়ালে একই চিত্র। ওটার গুরুত্ব অনেক বেশি— একটা কঙ্কাল, কোটর থেকে বেরিয়ে ঝুলছে দুই চোখ।

কোনও চিত্রই বেশিক্ষণ দেখল না ওরা। অন্য এক দৃশ্য দেখে ঘরের আরও ভিতরে গেল। পাথুরে সাদা মেঝেতে শুয়ে আছে এক লোক, শুকিয়ে গেছে তার দেহ। কালচে হয়ে উঠেছে ত্বক। পরনে চোগা, পায়ে গাছের আঁশের তৈরি চটি। দুই কানে সবুজ জেডের বড় প্লাগ। কণ্ঠে খোদাই করা জেড ডিস্ক। জীর্ণ দেহটা টর্চের আলোয় মন দিয়ে দেখল ওরা। পাশেই ঢাকনি দেয়া একটা বৃত্তাকার হাঁড়ি।

টর্চের গলা ঘুরিয়ে আলোর বৃত্ত বড় করে নিল সোহানা। 'মানুষটার কাছে যাওয়ার আগেই কয়েকটা ছবি তুলতে চাই।'

মৃদু হাসল রানা। 'আরেকটা ভূমিকম্পে ছাতটা মাথায় পড়ার আগেই ছবি চাই?'

ভ্রূকুটি করে ওর হাতে ফ্ল্যাশলাইট ধরিয়ে দিল সোহানা, মোবাইল ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে প্রতিটি অ্যাংগেল থেকে মৃতদেহের ছবি নিল। বাদ পড়ল না চারদেয়াল ও মেঝের চিত্র। শেষে শুকিয়ে যাওয়া লাশের পাশের হাঁড়ির ছবিও তুলল।

'লোকটা একেবারে মামি হয়ে গেছে। ইনকা পাহাড়ি সমাধিক্ষেত্র অথবা চিলিয়ান উপকূলের মোচে বা চিমুর মত।'

'মিল আছে,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু এটা কোনও সমাধি নয়।'

'তা নয়,' বলল সোহানা। 'মনে হচ্ছে কিছুদিনের জন্যে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল, তখনই মারা যায়। ওর পাশে কাঠের ভেসেলে দানা দেখছ? পাত্রের ফল পচে ছোবা হয়েছে। পাশেই আরেকটা পাত্র, ওটার ভেতর বৃষ্টির পানি ধরত।'

'কোমরের বেল্টে অবসিডিয়ান ছুরি, কাঠের পাত্রে খোদাই করার জন্যে কিছু ফ্ল্যাক।'

সোহানা আরও ছবি নিল হাঁড়ির। ওটার চারপাশে মায়ানদের শহরের দৃশ্য। বর্ম ও গদা তৈরি করছে এক লোক। ভয়ঙ্কর এক দেবতা আকাশ থেকে কঠোর চোখে দেখছে তাকে। দেবতার দেহের নীচের অংশ বিড়ালের, উপরের অংশ জাদুকরের।

'কে জানে হাঁড়ির ভেতরে কী,' বলল রানা।

'যা আছে, ভেতরেই থাকবে। কোনও আঠা দিয়ে ঢাকনি আটকে দিয়েছে। খুলতে চাওয়া ঠিক হবে না, হাঁড়ির ক্ষতি হতে পারে। এবার ছবিগুলো রানা এজেন্সিতে সালমা আলীর কাছে পাঠিয়ে দিলে এমন হয়?'

'গুড আইডিয়া।'

সালমা আলী রানা এজেন্সিতে কাজ নেয়ার আগে আর্কিয়োলজিস্ট হিসাবে বেশ নাম করেছিল। কিন্তু মিশরে একটা অভিযানে হিপ জয়েন্টের হাড় ভেঙে যাওয়ার পর বাধ্য হয়ে ওই

কাজ ছেড়ে দেয়। শাখা প্রধান হিসাবেও দক্ষতা অর্জন করেছে।

ঘরে সোহানাকে রেখে লাভার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। স্যাটালাইট ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে প্রবেশপথ ও পাহাড়ের চারপাশের ছবি তুলল। কাজটা শেষ করে যে পথে এসেছে, সেদিকে চাইল। পথ জুড়ে পড়ে আছে ব্যাসল্টের চাপড়া। ওখানে পৌঁছে গেছে ভলাণ্টিয়াররা।

'অ্যাই, আমরা ওপরে!' গলা ছাড়ল রানা। 'এদিকে!'

এক সারিতে উঠছিল সবাই, মুখ তুলে চাইল। রানা হাত নাড়ছে বলে সহজেই ওকে দেখতে পেল দুই শ' ফুট উপরে। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল তারা, তারপর খাড়া পথে রওনা হলো।

ভলাণ্টিয়ারদের জন্য অপেক্ষা করছে রানা, একটু পর সমাধি থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'কী করছ?'

নীচের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'ওই ঘর দেখতে ওদেরকে ডেকেছি।'

'যেহেতু গোপন করার উপায় নেই,' বলল সোহানা।

'চাউর হবে খবর,' বলল রানা, 'পথের পাশে প্রাচীন সমাধি। আর এদেরকে লাগবে পাহারা দিতে। দেরি হবে কর্তৃপক্ষের আসতে।'

'তাই আসলে। এটা গুরুত্বপূর্ণ কোনও আবিষ্কার হতে পারে। আগে কখনও শুনিনি কোনও মায়ান মামি পাওয়া গেছে।'

কয়েক মিনিট পর ডক্টর অ্যাডোরা, গ্যাবরিয়েলা, দুই যমজ ভাই গোমেয এবং কোসে তালামেন্তেয উঠে এল।

চারপাশ দেখে নিয়ে ডক্টর অ্যাডোরা বলল, 'জায়গাটা আসলে কী?'

'জানি না,' বলল সোহানা। 'মায়ান সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ। কবর হয়ে গিয়েছিল লাভার নীচে। কোনও মন্দির বা পবিত্র জায়গা। হয়তো পাহাড়ি দেবতার জন্যে উৎসর্গ করা।'

'আকাশে এবং মাটির নীচে অনেক দেবতা ছিল মায়ানদের,' বলল রানা। 'আর আগ্নেয়গিরিতেও। একটার নাম ছিল বাকাব। মাটির নীচে আর আগ্নেয়গিরিতে থাকত।'

'সমাধির ভেতরে গিয়েছিলাম,' বলল সোহানা। 'আপনারাও যেতে পারেন, তবে কিছু স্পর্শ করা ঠিক হবে না। ভেতরে একটা মৃতদেহ আছে। মামিফায়েড। প্রাকৃতিকভাবে হয়েছে।'

'পাহাড়ের উচ্চতা আর শুষ্ক পরিবেশে এমন হয়,' বলল রানা। 'একই ধরনের লাশ পাওয়া গেছে পেরু আর চিলিতে। কোনও এক সময়ে ওই ঘরের দরজা ঢেকে দিয়েছিল লাভার স্রোত। সে কারণেই এখনও নিখুঁত আছে লাশ।'

ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে প্রতিবারে একজন একজন করে ওই ঘরে গেল ভলান্টিয়াররা।

অন্যরা অপেক্ষা করছে বাইরের চাতালে। পরিবেশটা এমনই, চাপা হয়ে গেছে সবার কণ্ঠ।

'ওই লাশের কী করব আমরা?' জানতে চাইল রেইম গোমেয।

কোসে তালামেন্তেয বলল, 'বাইরের দুনিয়ায় খবরটা পাঠাতে হবে। ওকে দেখতে আসবে টুরিস্টরা, লাখ লাখ ডলার আয় হবে।'

'আগে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে,' বলল ডক্টর গ্যাবরিয়েলা। 'আর্কিয়োলজিস্টরা...'

'এ মুহূর্তে কিছুই করতে পারবে না আর্কিয়োলজিস্টরা,' বলল ডক্টর অ্যাডোরা। 'সড়ক পথ বন্ধ। আবার যখন চালু হবে, জীবিত মানুষকে হাসপাতালে না নিয়ে একটা লাশ সরানো অন্যায় হবে।'

'কিন্তু এই লাশ তো সাধারণ কোনও লাশ নয়,' বলল কোসে তালামেন্তেয। 'এ তো জাতীয় সম্পদ।'

'ওই লোক কালকে মরল, না নয় শ' শতাব্দীতে মরেছে, তা

বড় কথা নয়— আসল কথা সে মৃত,' বলল ডক্টর অ্যাডোরা। 'ওর আর কোনও বিপদ নেই। কিন্তু জীবিত রোগীর চিকিৎসা এখনই দরকার। আমরা যদি ওই লাশ সংরক্ষণ করি, সেটাই যথেষ্ট।'

আপত্তির সুরে কথা শুরু করেছিল কোসে, কিন্তু বাধা দিল রানা। 'সবাই স্থির হোন। আগে বলার প্রয়োজন পড়েনি, কাজেই বলিনি, কিন্তু আমার সঙ্গিনী সোহানা চৌধুরী আর আমি আগেও এসব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছি। বেশ কিছু দেশে আর্কিয়োলজিকাল এক্সপিডিশন করেছি। আমাদের জানা নেই কবে কোন্ সময়ে ওই লোক এ সমাধিতে এসেছিল। তবে দেখেছি, সে ব্যবহার করেছে অবসিডিয়ান ছোরা, সঙ্গে লোহা বা ইস্পাত ছিল না। তার মানে, এ সাইট ক্লাসিক মায়ান পিরিয়ডের। হতে পারে নয় শ' সাল থেকে ষোলো শ' সালের ভেতর সে এসেছে। আপনারা তার জেডের গয়না দেখেছেন, তাতে বোঝা যায়, সে উঁচু বংশের লোক। হয় যাজক, নয় অভিজাত কেউ। ওই মৃতদেহ থেকে অনেক কিছুই বুঝবেন বিজ্ঞানীরা। আগে কখনও এত সংরক্ষিত মায়ান রিমেইন পাওয়া যায়নি।'

'আমাদের এখন কী করা উচিত?' জানতে চাইল রেইম গোমেয।

'হয়তো বলতাম আবারও প্রবেশপথ বুজিয়ে দিতে, পরে আসবেন আর্কিয়োলজিস্টরা,' বলল সোহানা, 'কিন্তু ভুললে চলবে না এটা বিপর্যস্ত এলাকা। সময় লাগবে কর্তৃপক্ষের লোক আসতে। এদিকে সাইট লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। নীচে রাস্তার ওপর পড়ে আছে খোদাই করা দেয়াল।'

'এই সাইট আজ রাতে পাহারা দিতে হবে,' বলল রানা। 'কালকে গ্রামের মেয়রকে খবর দেব। তাঁকে এই সাইটের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে তিনি প্রতিবেশীদের সাহায্য নেবেন। মেক্সিকো বা সেন্ট্রাল আমেরিকার বহু এলাকা অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা পেয়েছে

আর্কিয়োলজিকাল সাইট থেকে। এই সমাধি দেখতে আসবে অনেকে, তাদের কেউ কেউ চাইবে খোঁড়াখুঁড়ি করতে। আমরা যদি এখনই বাইরের দুনিয়াকে জানিয়ে দিই, বিজ্ঞানীরা আসার আগেই নষ্ট হয়ে যাবে সাইট। ছুটে এসে হামলে পড়বে লুটেরা আর হাঁড়ি শিকারিরা। আপনারা নিশ্চয়ই তা চান না?'

'আপনি মনে হচ্ছে সব বোঝেন?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল কোসে তালামেন্তেয, রেগে গেছে।

'না বোঝার তো কিছু নেই,' বলল রানা। 'এসব ক্ষেত্রে কী হয় দেখেছি। আইডেন্টিফাই করার আগেই লুটপাট হয়ে যাবে মহামূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট, নষ্ট করা হবে বা ভেঙে ফেলা হবে দেয়াল, ফেলে দেবে মৃতদেহ। নতুন পরিবেশে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবে নতুন সাইট।'

'এসব করা হলে আপনি কী করবেন? এ সবই তো আমাদের, আপনাদের নয়। এ দেশের পুরনো আমলের যা কিছু, তার মালিক মেক্সিকোর জনগণ। আইনত এবং নৈতিকভাবেই এসব আমাদের, আপনাদের নয়। আজ যাকে দেখলাম, সে আমাদের পূর্বপুরুষ।'

'ঠিকই বলেছেন,' তালামেন্তেযকে বলল রানা, 'আজ যা পাওয়া গেল, তার মালিক এ দেশের বারো কোটি মানুষ। আমরা শুধু নিশ্চিত করব, যেন বিনষ্ট করা না হয় তাদের অধিকার। তার মানেই, এখানে যা আছে, সব বুঝিয়ে দেব মেক্সিকোর কর্তৃপক্ষের কাছে।'

'গাধার মত কথা বলবেন না, কোসে,' বলল ডক্টর অ্যাডোরা ভেলেসকেয। 'আজ যা পাওয়া গেছে, তা মেক্সিকোর ইতিহাসের অংশ। এসব রক্ষা করতে হবে আমাদেরকেই।'

'আপনি তো মেক্সিকান, অথচ কোথাকার না কোথাকার মাসুদ রানার পক্ষ হয়ে কথা বলছেন,' টিটকারির সুরে বলল কোসে। 'দামি ইয়টে চড়ে ঘুরতে পেরে দারুণ মজা লেগেছে, তাই না?'

'ডাক্তাররা এসেছেন আহত ও রোগীদের সাহায্য করতে,' কড়া সুরে বলল সোহানা। 'আর রাস্তা বন্ধ বলে তাঁদেরকে আসতে হয়েছে সাগরপথে। তাঁদেরকে অপমান করার আগে নিজের দিকে দেখুন, তাঁরা না এলে কীসের ভলান্টিয়ার হতেন?'

দাঁতে দাঁত চেপে স্প্যানিশে দু'চার কথা বলল অ্যাডোরা ভেলেসকেয।

কথা শুনে চমকে গিয়ে লালচে হয়ে গেল উকিলের মুখ।

রানা-সোহানা পরস্পরের দিকে চাইল। কথা সবই বুঝতে পেরেছে। ভয়ঙ্কর নীচ এক লোভী লোক বলা হয়েছে উকিল তালামেন্তেযকে।

'ওসব বলেছি বলে আমি দুঃখিত,' বলল সে। 'আমি ক্ষমা প্রার্থী আপনাদের কাছে। সবাই যা ঠিক করবে, তাই মেনে নেব। এই সাইট পাহারা দিতে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

'ধন্যবাদ, সেন্‌র তালামেন্তেয,' বলল সোহানা। 'এখন প্রথম কাজ হওয়া উচিত রাতের মত ক্যাম্প করা। ওটা করতে হবে এখান থেকে একটু দূরে। নইলে কৌতূহলী হয়ে চলে আসতে পারে যে-কেউ।'

'ভাল কোনও জায়গা খুঁজে বের করছি,' বলল কোসে। একা রওনা হয়ে গেল মালভূমি দেখতে। এক মিনিট পর হারিয়ে গেল পাহাড়ের বাঁকে।

ওদিকে চেয়ে আছে দুই গোমেয ভাই, মনে হলো অনুসরণ করবে। কয়েক সেকেণ্ড পর রওনা হয়ে যেতে চাইল। ভাল কোনও জায়গা নিজেরাই বের করবে।

'আপাতত একা থাকুক কোসে,' বলল রানা। 'মাথা ঠাণ্ডা হলে ফিরবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রেইম গোমেয।

তরুণী দুই ডাক্তারের দিকে চাইল রানা।

'অ্যাডোরা, গ্যাবরিয়েলা, বুঝতেই পারছেন, ওই ঘরের দরজার সামনে থেকে লাভার স্তর সরিয়ে বড় একটা সমস্যার জন্ম দিয়েছি। আগে ঘরের ওই লাশ ছিল বাতাসহীন পরিবেশে। কিন্তু এখন পাল্টে গেছে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা। ফলে ক্ষতি হতে পারে লাশের।'

'ভাল হতো ফ্রিযারে রাখলে, কিন্তু তা পাব না,' বলল ডক্টর গ্যাবরিয়েলা।

ডক্টর অ্যাডোরা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন, রানা। পাহাড়ের এত উপরের পরিবেশেই ঠিক ছিল লাশ। দশ হাজার ফুট উঁচু পাহড়ের শুকনো, ঠাণ্ডা দিন-রাত কাজে এসেছে ওটা ভাল রাখতে। এখানে ওটার কোনও ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। সমস্যা হবে যখন নামিয়ে নেয়া হবে।'

'হয়তো নামাবার সময় ঠাণ্ডা এয়ারটাইট কণ্টেইনার ব্যবহার করতে পারব,' বলল রানা।

'সেটা সম্ভব হলে ক্ষতি হবে না লাশের,' বলল গ্যাবরিয়েলা।

'কাছে কোথায় পাব বরফ?' আনমনে বলল অ্যাডোরা।

'উপরে,' বলল রানা। 'পাহাড়ের বারো হাজার ফুট উপরে বরফের মাঠ আছে। গতকাল দেখেছি। হয়তো ওখানে গিয়ে বরফ নিয়ে আসতে পারব।'

'ধরুন, সঙ্গে নিলেন বডি ব্যাগ,' বলল অ্যাডোরা।

'আমিও তাই ভেবেছি,' বলল রানা।

বিপর্যস্ত এলাকায় কখনও কখনও মৃতদেহ বডি ব্যাগে রাখতে হয়, নইলে ওই লাশ থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে সংক্রামক রোগ। ইয়টে করে রওনা হওয়ার আগে বেশ কিছু বডি ব্যাগ এনেছে রানা ও সোহানা। ওগুলো বাতাস নিরোধক।

রানা ভাবছে: যদি একটা বডি ব্যাগে প্রাচীন লাশ রাখবার পর ওই বডি ব্যাগ রাখা হয় দ্বিতীয় বডি ব্যাগে, আর বাইরের ব্যাগের

ভিতরের অংশে থাকে বরফের কুচি, তাজা থাকবার কথা লাশ।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব,' বলল সোহানা।

মাথা নাড়ল রানা। 'একসঙ্গে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।'

'একা আইস ফিল্ডে যাওয়া বোকার কাজ।'

'হয়তো বদলে পাব অমূল্য স্পেসিমেন।'

'তুমি নিজেও অত্যন্ত মূল্যবান স্পেসিমেন,' বলল সোহানা। 'আর তা ছাড়া, দু'জন গেলে আমরা দ্বিগুণ বরফ আনতে পারব।'

'কিছুতেই মানবে না, এই তো?'

'কক্ষনো না।'

হাল ছেড়ে দিল রানা। 'ঠিক আছে, দু'জনই যাব।'

রানা রাজি হয়েছে বলে স্বস্তির হাসি হাসল সোহানা। 'বরফের মাঠে মন্দ কিছু হলে একটা করে বডি ব্যাগ পাব, আর এত উপরে হালকা অক্সিজেনে অন্যরা হাড়ে হাড়ে বুঝবে আমাদের ওজন নিতে কেমন লাগে!'

কয়েক মিনিটে ব্যাকপ্যাক প্রায় খালি করে ফেলল ওরা। সঙ্গে থাকল শুধু বডি ব্যাগ, সোহানার জন্য একটা হ্যাচেট আর রানার জন্য কোদাল। এ ছাড়া রইল খাবার পানি, ফ্লিসের জ্যাকেট ও প্যান্ট।

সময় নষ্ট না করে রওনা হয়ে গেল ওরা।

মধ্য দুপুর।

শীত নেই।

খাড়াই বেয়ে উঠতে হচ্ছে।

পাহাড়ের গায়ে পা রাখবার জায়গা আছে, ক্লাইমিং গিয়ার নেই, তবে বেশ দ্রুতই উঠছে ওরা। অনেকক্ষণ পর পৌঁছে গেল হাওয়া তাড়িত এক ঢালে। ওখানেই ফুরিয়ে গেল গাছের সারি। ন্যাড়া পাথুরে জমি, শোঁ-শোঁ বইছে হাওয়া।

'কপাল ভাল যে কয়েক দিন দশ হাজার ফুট ওপরে আছি,

নইলে একেবারে হাঁপিয়ে উঠতাম,' বলল সোহানা।

'তাই আসলে। এখন লাশ ঠিক রাখার বুদ্ধিটা কাজে এলে হয়। সন্ধ্যার আগেই ফিরতি পথে যেতে চাই,' বলল রানা।

'এভাবে উঠলে পারব।'

আগের চেয়ে দ্রুত উঠতে লাগল ওরা। একটু পর থেমে গেল কথা।

ভয়ানক খাড়া পাহাড়।

কষ্ট হচ্ছে উঠতে।

একসময় বলল রানা, 'ঠিক আছ তো?'

'এখন পর্যন্ত,' বলল সোহানা।

শেষ বিকেলে ওরা পৌঁছে গেল তুষার ছাওয়া চূড়ার কাছে।

ওখানে থামল।

একটু উপরে বড় একটা জ্বালামুখ। পাশেই রিজ। ওখানে তিনটে ছোট জ্বালামুখ।

উপরে সাদা তুষারের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'ওই যে! রিজের ওপরের দিকে তুষার জমেছে।'

'কিন্তু ছোট জ্বালামুখের কাছে নেই,' বলল সোহানা, 'ওদিকটা বোধহয় গরম।'

'চলো, পাহাড়-দেবতার কাছ থেকে বরফ নিয়ে ভেগে যাই।'

রিজে উঠল ওরা, তিন তপ্ত জ্বালামুখ পাশে রেখে আরও উঠে গেল তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়ায়।

ওখানে দেরি না করে তুষার খুঁড়তে লাগল দু'জন।

সামান্য গর্ত হওয়ার পর বেরিয়ে এল জমাট বরফ।

কোদাল ও হ্যাচেট কাজে লাগাল ওরা। চাকা বরফ খণ্ড ভেঙে তুলছে। বহন করতে পারবে এমন পরিমাণ বরফ পেয়ে যাওয়ার পর থামল। সব বরফ রাখা হলো দুই বডি ব্যাগে, তারপর বডি ব্যাগ মুড়িয়ে রাখা হলো ফ্লিসের জ্যাকেটে। এবার জ্যাকেট স্থান

পেল আরও দু'টি ব্যাকপ্যাকে।

আবারও ফিরতি পথ ধরল ওরা।

নীচের ট্রেইলের দিকে যাওয়ার সময় শুনল গম্ভীর গুড়-গুড় আওয়াজ। অনেকটা নীচে শুরু হয়েছে অ্যাভালাঞ্চ। থরথর করে কাঁপছে জমিন। ওরা বুঝে গেল, দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, বাধ্য হয়ে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

এক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর আরেক মিনিট, থামছে না ভূমিকম্প।

'ভয় লাগছে, সোহানা?' নরম স্বরে বলল রানা।

'লাগছে,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল সোহানা। 'জানি না এটা আফটার শক, না এই আগ্নেয়গিরি আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে।'

'সেক্ষেত্রে তোমার মাথা ঠিকই আছে,' বলল রানা, মৃদু হাসছে। 'মনে হচ্ছে এক দৌড়ে ভেগে যাই।'

'আমাকে ফেলে?'

'এহ্-হে, তোমার কথা তো মনেই ছিল না!' উদাস হয়ে গেল রানা। পরক্ষণে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল দু'জন।

কিছুক্ষণ পর গুড়-গুড় আওয়াজ থামল, কিন্তু তার বদলে শুরু হলো হুইসলের মত তীক্ষ্ণ আওয়াজ। যেন ছুটে আসছে কিছু, তারপর ভয়ঙ্করভাবে গর্জন ছাড়ল আগ্নেয়গিরি। মনে হলো কানের কাছে চালু হয়েছে এয়ার বাস এ৩৮০ বিমানের ইঞ্জিন। শব্দের উৎস খুঁজতে চারপাশে চাইল ওরা। চোখ স্থির হলো গিয়ে তুষার প্রান্তরের আরেক দিকে।

পাহাড়ের বুক থেকে আকাশে উঠছে হাই প্রেশার সাদা বাষ্প?

ওদিকে দেখা গেল না কিছুই।

ভূমিকম্প নেই, আবারও রওনা হলো ওরা।

নামছে প্রায় দৌড়ের গতি তুলে। বুঝে গেছে, পায়ের নীচে

নিরেট আগ্নেয়শিলা।

অনেকক্ষণ পর আবারও পৌঁছে গেল ট্রেইলে।

মেক্সিকোর পশ্চিম দিগন্তে হামাগুড়ি দিচ্ছে বুড়ো রবি, লালচে রশ্মি ফেলেছে গুয়াতেমালার পুবের গাঢ় সবুজ অরণ্যে। সময় নষ্ট না করে নামতে লাগল ওরা। কিছু চিহ্ন দেখে বুঝল, সঠিক পথেই চলেছে। ছুটবার গতি কমাতে হলো, নইলে বহু নীচে গিয়ে পড়বে পা ফস্কে, ফলাফল: নিশ্চিত মৃত্যু।

কিছু দূর নামবার পর শব্দের উৎস ও বাষ্পের মেঘ দেখল। পাহাড়ের খোঁড়লের মত এক জায়গা থেকে সাঁই-সাঁই করে আকাশে উঠছে গরম পানি ও বাষ্প। মাটির নীচে ওখানে তৈরি হয়েছে প্রচণ্ড প্রেশার। বাষ্পের ঝড়ের এলাকা থেকে সরে যেতে লাগল ওরা। কিন্তু বেশি দূরে যাওয়ারও উপায় নেই, মুশকিল হবে ট্রেইল হারিয়ে গেলে।

বাষ্পের উৎস অনেক উপরে ফেলে নেমে আসবার পর স্বস্তি পেল ওরা। একঘণ্টা পর একদিকে জমাট জলপ্রপাত দেখল। কিন্তু ওই পাথুরে জায়গা পেরোনোর সময় শুরু হলো গুম-গুম আওয়াজ। সেই সঙ্গে কাঁপতে লাগল জমি।

'শক্ত করে কিছু ধরো,' সোহানাকে বসিয়ে দিয়ে বলল রানা। নিজেও বসে পড়েছে পাশেই।

উঁচু, এবড়োখেবড়ো পাথর দুই হাতে ধরল ওরা। রানার কাঁধে মাথা রাখল সোহানা। বাড়ছে ভূমিকম্পের গতি ও আওয়াজ। থরথর করে কাঁপছে গোটা পাহাড়। ওদের বামদিকে তিরিশ গজ দূর দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল মস্ত সব বোল্ডার। সামান্য নামবার পর পাহাড় ছাড়ল ওগুলো, ছিটকে রওনা হলো বহু নীচের জমিতে আছাড় খেতে।

পতনের আওয়াজটা পরিষ্কার শুনল ওরা।

কিছুক্ষণ পর থামল ভূমিকম্প।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

আবারও রওনা হলো দু'জন। নামতে হচ্ছে খুব সতর্ক হয়ে। জায়গায় জায়গায় পথের উপর দিয়ে বয়ে গেছে পাথুরে স্রোত। ওখানে হারিয়ে গেছে সব চিহ্ন। কখনও কখনও পা ফেলবার আগে পরখ করে দেখতে হচ্ছে জমি।

আঁধার নেমে আসবার পর ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হলো। আরও একবার পাহাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ভূমিকম্প। ওরা আছে খোলা জায়গায়। উপর থেকে পাথর পড়লে কিচ্ছু করবার নেই।

শেষে রাত একটার সময় পৌঁছুল ওরা নীচের মালভূমিতে।

একটু দূরেই মায়াদের ওই ঘর।

দূর থেকে দেখা গেল সেল ফোনের সাদাটে আলো।

'কারও কাছে স্যাটালাইট ফোন আছে,' বলল সোহানা।

'বোধহয় কোসে তালামেন্তেযের,' বলল রানা।

'হ্যালো, আমরা পৌঁছে গেছি,' গলা উঁচু করল সোহানা।

উধাও হলো অদ্ভুত আভা, ওখানে উঠে দাঁড়াল এক লোক।

'এদিকে আসুন।' কণ্ঠ কোসে তালামেন্তেযের। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলেছে। 'আপনারা বোধহয় খুব ক্লান্ত? আসুন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই আমাদের ক্যাম্পে।'

'আগে প্রাচীন বন্ধুকে বরফে ঢেকে দিতে হবে,' বলল রানা।

ওই ঘরে আবারও ঢুকল রানা, সোহানা ও কোসে। নতুন করে বিছিয়ে দিল একটি বডি ব্যাগ, সাবধানে মায়ান মৃতদেহ রাখা হলো ওটার ভিতর। যিপার আটকে দিল।

'লোকটা এত হালকা কেন?' বলল কোসে।

'মাংস শুকিয়ে গেছে, আর ত্বকের ওজন কমই হয়, এ ছাড়া রয়েছে শুধু হাড়,' বলল রানা। 'জীবিত মানুষের ওজনের মাত্র পনেরো ভাগ হাড়, দেহের বেশিরভাগ অংশ পানিতে ভরা।'

প্রথম ব্যাগ দ্বিতীয় ব্যাগে রাখল ওরা। লাশের ব্যাগের বাইরে রাখা হলো প্রচুর বরফ, তারপর দ্বিতীয় ব্যাগ ভরা হলো তৃতীয় ব্যাগে। ভালভাবে আটকে দেয়া হলো যিপার।

বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনল ওরা।

জেরি গোমেয বলে উঠল, 'এবার পাহারা দেয়ার পালা আমার।' ঘরে ঢুকে বলল সে, 'মিস্টার রানা, মিস সোহানা, যাক পৌঁছে গেছেন! পাহাড় কাঁপতে শুরু করতেই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমরা।'

'আমরাও,' হাসল সোহানা।

কোসের পিছু নিয়ে মালভূমিতে বেরিয়ে এল ওরা।

পথ দেখাল উকিল। পাহাড়ি এক প্রাচীন ট্রেইল ধরেছে। কয়েক শ' ফুট যাওয়ার পর আরেকটা সমতল জায়গায় পৌঁছে গেল। এখানে দাঁড় করানো হয়েছে তাঁবু।

খাড়া পাহাড়ের গায়ে ফ্ল্যাশলাইটের বাতি ফেলল রানা।

'আমাদের ওপরে কী?'

'খাড়া পাহাড়, বড় কোনও বোল্ডার নেই। আজ এদিক দিয়ে অ্যাভালাঞ্চ নামেনি।'

'ভাল জায়গা বেছেছেন,' বলল সোহানা। 'মামি রাখার সময় সাহায্য করেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'শুভ রাত্রি, তালামেন্তেয,' বলল রানা। সোহানা তাঁবুতে ঢুকে পড়বার পর ভিতরে ঢুকল ও, টেনে দিল ফ্ল্যাপ।

বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারবে না, একটু পরেই হবে ভোর।

পাঁচ

সোহানার স্যাটালাইট ফোনের গুঞ্জনে ঘুম ভাঙল রানার, টের পেল আকাশে উঠেছে ডিমের কুসুমের মত হলদেটে সূর্য। পাশ ফিরে বার কয়েক চাপড় মেরে ফোনটা পেয়ে গেল। 'হ্যালো?'

'মাসুদ ভাই?' বলে উঠল সালমা আলী। 'আপনারা কোথায়?'

'টাকানা নামের এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরির গায়ে, দশ হাজার ফুট ওপরে। কাজ শেষ হলে ফিরতি পথ ধরব। কিছু বলবেন?'

'খবরটা ভাল না খারাপ, তা আপনারা বলতে পারবেন,' বলল সালমা। 'এইমাত্র আপনাদেরকে একটা আর্টিকেল পাঠিয়েছি। ওটা আজ ছাপা হয়েছে মেক্সিকান পাবলিক দৈনিক পত্রিকায়।'

'ঠিক আছে, দেখছি। পরে ফোন দেব আপনাকে।'

কল কেটে অনলাইনে গেল রানা, ই-মেইলে অ্যাটাচমেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছে সালমা আলী।

আর্টিকেলে ক্লিক করে মায়ান ওই ঘরের রঙিন ছবি দেখল। বাদ পড়েনি লাশ বা হাঁড়ির ছবিও।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা।

ঘুম ভেঙে গেছে সোহানার, উঠে বসল। 'কী হয়েছে?'

মোবাইল ফোনটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

দৃশ্যটা দেখেই বিস্ফারিত হলো সোহানার চোখ। 'কে এই কাজ করল?'

আর্টিকেলে চোখ বোলাল রানা। ছবিগুলো দেখল। দেয়া হয়েছে ওদের পুরো গ্রুপ ছবি। আগের গ্রামে তোলা। ছবিটা

সোহানাকে দেখাল ও। 'মনে আছে কখন তোলা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সবাই দাঁড়িয়েছিলাম...' থেমে গেল সোহানা। 'মেয়রের ভাইয়ের হাতে সেল ফোন দিয়েছিল কোসে তালামেন্তেয।'

'ফোন তালামেন্তেযের কাছে ফেরত দেয় ওই লোক। কাজেই বুঝতে পারছ এ ছবি কোথা থেকে এসেছে।'

'সাংবাদিকের কাছে পাঠিয়েছে কোসে, সেই সঙ্গে আর্টিকেল। এসো।' ফোন নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সোহানা।

ওর পিছু নিল রানা।

মাত্র তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই।

সংক্ষেপে বক্তব্য সারল সোহানা। ডক্টর অ্যাডোরার হাতে স্যাটালাইট ফোন দিল। 'প্লিয, আপনি পড়ে শোনান।'

'এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর আবিষ্কারটি করেছেন মিস্টার মাসুদ রানা এবং তাঁর সঙ্গিনী মিস সোহানা চৌধুরী। ভলাণ্টিয়ারদেরকে নিয়ে আসেন টাকানা পর্বতের দুর্গম গ্রামে। তখনই...' চোখ তুলে রানা ও সোহানাকে দেখল তরুণী ডাক্তার। 'পুরো সম্মান আপনাদেরকেই দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকের নাম, সেই সঙ্গে কীভাবে এখানে এসে এসব পাওয়া গেল, সবই খুলে লিখেছে।'

'সততার জন্যে তাকে সম্মান দেব,' বলল সোহানা। 'কিন্তু আমরা না ঠিক করেছিলাম আপাতত বাইরের দুনিয়াকে এসব জানাব না?'

'এবার হাতে সময় পাব না,' বলল রানা, 'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।' সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল ও। 'কেউ কি জানেন কোসে তালামেন্তেয কোথায়?'

'গত রাতে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছিল,' বলল সোহানা। 'হয়তো নিজের তাঁবুতে।'

বেশি খুঁজতে হলো না। তালামেন্তেযের তাঁবুই নেই।

মালভূমি ছেড়ে সরু পথে নামল রানা। কয়েক মিনিটে পৌঁছে

গেল সমাধির সামনে।

বসে আছে জেরি গোমেয। বলল, 'গুড মর্নিং। এত ব্যস্ত কেন?'

'বুয়েনোস ডায়াস,' বলল রানা। ঢুকে পড়ল ফাটলে। ভিতরে বডি ব্যাগে লাশ ঠিক আছে, সরানো বা ছোঁয়া হয়নি হাঁড়ি বা কাঠের ভেসেল। আবারও বাইরে বেরিয়ে এল ও। 'আজ সকালে কোসে তালামেন্তেযকে দেখেছ, জেরি?'

'না,' মাথা নাড়ল গোমেয। 'রাতে আপনাদের সঙ্গে গেছে।'

'আপাতত সমাধি পাহারা দিতে হবে না, তুমি আমার সঙ্গে এসো,' বলল রানা। 'আলাপ আছে সবার সাথে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু হয়েছেটা কী?'

ক্যাম্পে যাওয়ার পথে সংক্ষেপে বলল রানা।

নাস্তার জন্য আগুন জ্বেলেছে ক্যাম্পে। সবাই ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে নিয়েছে। রানা ও জেরি পৌঁছে যেতেই সোহানা বলল, 'গতরাতে চলে গেছে কোসে তালামেন্তেয। তাঁবু বা তার কোনও জিনিস নেই।'

'আমাদের আলাপ সেরে নেয়া উচিত,' বলল গম্ভীর রানা।

'তা-ই করছিলাম আমরা,' বলল সোহানা। 'জানি, চাইলেও সমাধি লুকাতে পারব না। খোদাই করা পাথরের দেয়াল ঢেকে দেয়া যায় মাটি বা ছোট পাথর দিয়ে, কিন্তু সরাতে পারব না ওটা। এদিকে আসতে শুরু করবে একদল লোক। তার আগেই সমাধি বা ভেতরের সমস্ত কিছুর নিখুঁত ছবি তুলতে হবে। আর সরিয়ে ফেলতে হবে মায়ান মানুষটা বা তার জিনিসপত্র।'

'গ্রামবাসীকে জানাতে হবে এখানে কী পাওয়া গেছে,' বলল রানা।

কয়েক ঘণ্টা পর রেইম গোমেয ডেকে আনল দূরের গ্রামের মেয়রকে। তিনি সঙ্গে এনেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুকে।

সমাধি দেখানো হলো তাঁদেরকে।

মেক্সিকান পাবলিক দৈনিক পত্রিকার ছবিতে যা আছে, সেসব ঠিকঠাক আছে তা নিশ্চিত করলেন তাঁরা।

রানা সতর্ক করে দিল, এবার স্রোতের মত আসবে লোভী লোক। শুধু সরকারী লোক বা ইউনিভার্সিটিগুলোর রিসার্চার এলে ভয় নেই, অন্যদেরকে সরিয়ে রাখতে হবে এ এলাকা থেকে। সর্বক্ষণ পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

রানা ও সোহানার কথা শেষে মেয়র বললেন, তিনি পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন। 'তবে এখানে এসব রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। আপনারা যদি এগুলো মেক্সিকান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে পৌঁছে দিতেন...'

এরপর ভলান্টিয়াররা সমাধি ছেড়ে রওনা হলো।

মায়াদের হাঁড়ি সাবধানে বহন করল রানা।

তাড়াহুড়া করে তৈরি এক স্ট্রেচারে চাপানো হলো মৃতদেহ।

কাঠের ভেসেল, ফল ও শস্য বাতাস নিরোধক প্লাস্টিক ব্যাগে রাখল দুই ডাক্তার। ওগুলো তাদের জিম্মায় থাকল।

কয়েক ঘণ্টা হাঁটতে হলো ওদেরকে। পনেরো মিনিট পর পর থামল ওরা। রানা বডি ব্যাগ থেকে পানি ফেলে দিল। নিশ্চিত হলো বডি ব্যাগ ঠিক আছে।

গ্রামে চিকিৎসা দেয়ার পর দুপুরের পর ফিরতি পথ ধরল ওরা। পুরো দু'দিন লাগল আবারও নীচের শহর ইউনিয়ন হুয়ারেজে পৌঁছুতে।

আগেই ফোন করে ট্রাকের ব্যবস্থা করেছে সোহানা। স্থির হয়েছে সোজা ফিরবে ওরা টাপাচুলায়।

ট্রাকে করে এবড়োখেবড়ো পথে রওনা হয়ে সর্বক্ষণ কোলে হাঁড়ি রাখল রানা। দুই গোমেয ভাই দুলতে দিচ্ছে না মৃতদেহটাকে। পাটাতনে লাগলে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবে লাশ, ওরা

হাঁটুর উপর ওজন নিয়েছে স্ট্রেচারের।

একটু পর বলল রানা, 'হৈ-চৈ কমে আসা তক সরিয়ে রাখতে হবে মায়ান লাশ, কেউ যেন না জানে ওটা কোথায় আছে। ডক্টর অ্যাডোরা, গ্যাবরিয়েলা, আমি কি আপনাদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলল দুই তরুণী।

সবাই সম্মত হতে ট্রাকের ড্রাইভারকে টাপাচুলার হাসপাতালে যেতে বলল রানা।

ওরা গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার পর হাসপাতালে ঢুকল দুই ডাক্তার, একটু পর চাকাওয়ালা এক স্ট্রেচার নিয়ে এল। চাপিয়ে দেয়া হলো স্ট্রেচারে লাশ। ঠিক হয়েছে, ওটা রাখা হবে মর্গের রেফ্রিযারেটারে।

কাজটা সেরে বেরিয়ে এসে অ্যাডোরা ও গ্যাবরিয়েলা জানাল নতুন খবর। ওরা যখন পাহাড়ে ছিল, সে সময়ে বিপুল কাজ হয়েছে শহরে। নতুন করে ঠিক করা হয়েছে ইলেকট্রিকাল পাওয়ার। খুলে দেয়া হয়েছে পশ্চিম ও পুবের রাস্তা। কাজ শুরু করেছে এয়ারপোর্ট। গতকাল থেকে চালু হয়েছে কমার্শিয়াল ফ্লাইট।

অন্য ভলান্টিয়ারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সি ডাকল রানা। ওদের দু'জনের পাশে ট্যাক্সিতে চাপল দুই তরুণী ডাক্তার। আধা মেরামত করা পথ ধরে এয়ারপোর্টে পৌঁছল ওরা।

রানা ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাওনা দেয়ার সময় অ্যাডোরা ও গ্যাবরিয়েলা একে একে সোহানাকে আলিঙ্গন করল।

অ্যাডোরা বলল, 'সত্যিই, তোমাদের দু'জনকে খুব মিস করব আমি।'

'আমারও মন খারাপ,' স্বীকার করল গ্যাবরিয়েলা। 'আবার ভালও লাগছে হাসপাতালে গিয়ে কাজ করতে পারব।'

'আমরাও মিস করব তোমাদের,' বলল সোহানা। 'রানার সঙ্গে কথা হয়েছে, কয়েক দিন পর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন একটা ফাউণ্ডেশনের কর্তৃপক্ষ।'

অবাক হলো গ্যাবরিয়েলা। 'কী জন্যে?'

'এটাই তো পৃথিবীর একমাত্র বিপর্যয় ছিল না,' বলল রানা। 'খাঁটি অন্তরের একদল লোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁরা জেনে নেবেন তাঁদের টাকা কীভাবে দুস্থদের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়।'

গ্যাবরিয়েলা লাজুক মেয়ে, তবুও হেসে ফেলল সে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে। গালে চুমু দিয়ে দেরি করল না, তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল টার্মিনালে।

অ্যাডোরা হাসছে। বলল, 'আমরা খুশি হব সাহায্য করতে পারলে।' বান্ধবীর পিছনে রওনা হয়ে গেল সে।

এয়ারপোর্টের ক্যাফেতে বসল রানা ও সোহানা।

কফি সামনে রেখে সোহানাকে উদাস দেখে বলল রানা, 'কী ভাবছ?'

'কই, কিছুই না।'

রানা কিছু বলবে, এমন সময় বেজে উঠল ওর স্যাটালাইট ফোন। কল রিসিভ করল। 'বলুন?'

'সালমা বলছি। আপনারা কি পৌঁছে গেছেন টাপাচুলায়?'

'হ্যাঁ, সালমা।'

'এবার কোথায়? আপনারা চাইলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ভূমিকম্প হয়নি এমন কোনও রিসোর্টে বুকিং দিতে পারি।'

'বোধহয় মন্দ হয় না, ছুটি চলছে।'

'লাইনে থাকুন।' এক মিনিট পর বলল সালমা, 'তো চলেছেন এয়ারোমেক্সিকোতে করে হুয়াতুলকো। ওই বিমান রওনা হবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। বেশি দূরের পথ নয়, কিন্তু কোনও ক্ষতি

হয়নি ওদিকে। আপনাদের হোটেলের নাম লাস ব্রিসাস, ব্যালকনি থেকে পরিষ্কার দেখবেন প্রশান্ত মহাসাগর। এয়ারপোর্টে পেয়ে যাবেন ভাড়া করা গাড়ি।'

'অনেক ধন্যবাদ, সালমা।'

হুয়াতুলকো এয়ারপোর্টে গাড়ি বুঝে নিয়ে সোজা লাস ব্রিসাস হোটেলে পৌঁছুল রানা ও সোহানা। রাজকীয় সুইট, পরিচ্ছন্ন, পছন্দ হলো সোহানার। তাজা হু-হু হাওয়া আসছে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে, একটু দূরেই রূপালী সৈকত ও নীল সাগর।

পোশাক পাল্টে সুইমিং পুলে এল ওরা, দশ মিনিট সাঁতার কেটে পাশাপাশি বসল দুই লং ডেক চেয়ারে। সোহানার জন্য এল বরফ-ঠাণ্ডা কোক, রানার জন্য কার্লসবার্গ বিয়ার।

পানীয় শেষে উঠে পড়ল ওরা, হোটেলের দোকান থেকে নতুন পোশাক কিনে ফিরল সুইটে। রাত সাড়ে সাতটায় ঢুকল একটু দূরের এক নামকরা রেস্টুরেন্টে।

ভিড় নেই ভিতরে। বাজছে নরম মেক্সিকান বাজনা। প্রতিটি টেবিলে মৃদু আলো।

সি ফুড নিল সোহানা, পোসোল উইথ স্ন্যাপার, কড অ্যাণ্ড শ্রিম্প। রানা নিজের জন্য আমও রেড সস উইথ ফেয্যাণ্ট। ওয়াইনের বদলে সফট ড্রিঙ্ক নিল সোহানা, রানা আর্জেন্টাইন ম্যালবেক, সঙ্গে চিলিয়ান সুভিনিয়ন ব্ল্যাঙ্ক। শেষে দু'জনের জন্য ডেযার্ট হিসাবে এল মেক্সিকান ট্রেস লেচেস কেক ও পোলভোরোনে দে কাউলে— স্থানীয় এক দারুচিনি-বিস্কিট।

ডিনার শেষে সৈকতে চলে এল ওরা।

চাঁদের রূপালী আলোয় বালিতে পাশাপাশি বসে সোহানা বলল, 'আবারও তাঁবুতে ঘুমাতে হবে না, ভাবতে ভাল লাগছে।'

'আমারও।' হু-হু হাওয়া উড়িয়ে নিচ্ছে সোহানার রেশমি চুল,

নাকে মিষ্টি সুবাস আসছে।

অনেকক্ষণ গল্প করল ওরা সাগরের পারে, তারপর উঠল, হাতে হাত রেখে ফিরল হোটেলে।

কিন্তু ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে থমকে গেল রানা। সতর্ক হয়ে উঠেছে, হাতের ইশারা করল সোহানাকে।

সামান্য খোলা কবাট। ঘরে আলো জ্বলছে না।

আঁধারে চিতার মত ঘরে ঢুকল রানা। এক সেকেণ্ড পর সোহানা। ওদের সঙ্গে পিস্তল নেই, কিন্তু যে-কোনও বিপদ মোকাবিলা করবে বিনা দ্বিধায়।

তিরিশ সেকেণ্ড পর বাতির সুইচ টিপল রানা।

ওদের জানা হয়ে গেছে, ওরা ছাড়া কেউ নেই ঘরে।

তছনছ করা হয়েছে ঘর। বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ওদের ব্যাগ। ভিতরের সব জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ক্লজিট খোলা, নীচে ফেলে গেছে বাড়তি বালিশ ও কম্বল।

'ভাগ্যিস রুম সেফ ব্যবহার করিনি,' বলল সোহানা।

'এসো দেখি কী নিয়েছে,' বলল রানা।

কয়েকটা পোশাক সরাল সোহানা, ব্যাগের যিপার কম্পার্টমেণ্ট খুলল। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ বোলাল ঘরে। 'দামি কিছুই চুরি হয়নি। টাকা, স্যাটালাইট ফোন বা ডাইভ ওয়াচ আমাদের সঙ্গেই ছিল।'

'আমারও কিছু চুরি হয়নি।'

'পার্কিং অ্যাটেণ্ডেন্টের রিসিট সঙ্গে আছে?' বলল সোহানা। 'গাড়ির ট্রাঙ্কে মায়ান পট।'

'এই যে রিসিট,' পকেট থেকে কাগজটা বের করল রানা।

'চলো, দেখে আসি ওটা আছে কি না।'

দরজা বন্ধ করে পার্কিং গ্যারাজে এল ওরা, গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে

দেখল।

হাঁড়ি, সোহানার ল্যাপটপ কমপিউটার, প্রাচীন শস্য, শুকিয়ে যাওয়া ফলের অংশ ও কাঠের ভেসেলের এয়ারটাইট প্যাকেজ—কিছুই সরানো হয়নি।

'তা হলে কী চেয়েছিল?' রানার দিকে চাইল সোহানা।

'বোধহয় বোঝেনি গাড়িতে এসব আছে,' বলল রানা। 'সাধারণ চোর নয়। খবরের কাগজের আর্টিকেল দেখে আমাদের চিনতে পেরেছে। ধরে নিয়েছে মায়ান সমাধির দামি কিছু সঙ্গে থাকবে।'

'তার মানে টার্গেট এই মায়ান হাঁড়ি?'

'খুবই মূল্যবান হতে পারে। কিন্তু ওদের জানার কথা নয় ওটা আমাদের কাছে আছে।'

'বোধহয় নতুন হোটেলে ওঠা উচিত,' বলল সোহানা। 'যাতে পিছু নিতে না পারে।'

'চেক আউট করে আসছি, তুমি থাকো। হোটেলের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নামব।'

'এবার কোনদিকে?' জানতে চাইল সোহানা।

'দেশের আরেক মাথায়।'

'গুড, তুমি যাও, সালমাকে জানিয়ে দিচ্ছি কোথায় যাব।' রানার দিকে চাইল সোহানা, 'কিন্তু যাচ্ছি কোথায়?'

'ক্যানকুন,' হোটেলের লবির দিকে চলল রানা।

আধঘণ্টা পর ভাড়া গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। গন্তব্য হুয়াতুলকো থেকে এক শ' নব্বুই মাইল দূরের ক্যানকুন।

শেষ বিকেল বলে হাইওয়েতে কোনও জ্যাম নেই।

ঝড়ের গতিতে গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলেছে রানা। পিছনে চোখ রেখেছে। পিছু নেয়া হলে অনায়াসেই টের পাবে।

দু'ঘণ্টা পর ড্রাইভিং সিটে বসল সোহানা।

ঠিক হয়েছে পালা করে গাড়ি চালাবে ওরা।

ভোর চারটের সময় টুক্সতিলা গুতিয়েরেয পৌঁছে গাড়ি রাখল এক বন্ধ পেট্রল পাম্পে।

ওখানেই ঘুমাল সকাল আটটা পর্যন্ত। তারপর ট্যাঙ্ক ভরে গ্যাস নিয়ে হাজির হলো বহু দূরের গালফ কোস্টের সেন্ট্রোতে।

সারাদিন ড্রাইভ করে ওরা পৌঁছল ক্যানকুনে। চেক ইন করল ক্রাউন প্যারাডাইয ক্লাবে। গোসল সেরে খাবার শেষে ঘুমাল পরদিন সকাল পর্যন্ত।

নাস্তা সেরে পৌঁছে গেল এল সেন্ট্রোতে।

ওটাই শহরের মূল কেন্দ্র।

ওখানে রয়েছে টুরিস্টদের জন্য সব দোকান।

অল্প দামে বিক্রি করা হয় সুভ্যেনিয়র।

কয়েকটা দোকান ঘুরে কেনাকাটা করল ওরা। সবই মায়ান আর্টিফ্যাক্টের নকল— হাঁড়ি, গামলা, দেয়াল কার্পেট, নকশা করা কাপড়, মায়ান শিল্পের নানান জিনিস ও আঁকা সিম্বল। বেশিরভাগ জিনিসে দেখা গেল মায়ান রাজা, যাজক ও দেবতাদের ছবি। এ সবই রং করা হয়েছে অদক্ষ হাতে, অযত্নের সঙ্গে। দেখলেই বোঝা যায় অল্প দামের জিনিস।

একটা হবি শপে ওয়াটার সলিউবল অ্যাক্রিলিক পেইন্ট সেট কিনল রানা। ওই সেটে রয়েছে রূপালী, সোনালী রং এবং নানা আকারের ব্রাশ।

ঘরে ফিরে কাজে নামল ও। সত্যিকারের মায়ান হাঁড়ির গায়ে আঁকতে লাগল পছন্দ মত ডিযাইন ও ছবি। একটু পর মনে হলো, সোহানার কেনা সুভ্যেনিয়র হাঁড়ি আর মায়ান সমাধির হাঁড়ি একেবারে একই জিনিস। মায়ান রাজার অলঙ্কারের জায়গাগুলো সোনালী রঙে ঢাকা পড়ল। বর্ম ও গদা হয়ে গেল রূপালী।

রানার আঁকা শেষে আসল হাঁড়ি ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

দেখল সোহানা। 'নাহ্, তুমি সত্যিকারের খারাপ শিল্পী।'

রানা ক্লাবের কনসিয়ার্জকে ইন্টারকমে জানাল, ওরা কিছু সুভ্যেনিয়র পাঠাবে মেইলিং কোম্পানির মাধ্যমে ক্যালিফোর্নিয়ায়।

ক্লার্ক জানাল, ওদের হয়ে এ কাজ করবে হোটেল কর্তৃপক্ষ। একটু পর হোটেল কক্ষে এল সে, সঙ্গে বড় এক বাক্স। ওটার ভেতর ফোম রেখে সাবধানে হাঁড়ি রাখল। চারদিকের ফাঁকা জায়গায় ভরল কার্পেট, দেয়াল কার্পেট এবং পোশাক। বাকি অংশ ভরে দিল স্টাইরোফোম পিনাট দিয়ে। যত্ন করে সিল করল।

কাস্টমস ডিক্লারেশন ফর্ম পূরণ করল রানা। নির্দিষ্ট জায়গায় লিখল: সুভ্যেনিয়র ফ্রম মেক্সিকো। আরেক ঘরে লিখল: এসব জিনিসের দাম এক শ' ডলারের কম।

শিপিং-এর খরচ দেয়ার পর কনসিয়ার্জকে ভাল টিপ্স্ দিল রানা। লোকটা বিদায় হওয়ার পর সৈকতে গেল ওরা স্নরকেলিং করতে।

সে রাতে ঘর থেকে সালমাকে ফোন দিল ওরা।

'মাসুদ ভাই? এবার কী, জলোচ্ছ্বাস?'

'না, সাইক্লোন,' হাসল রানা। 'অন্য কাজে ফোন করেছি। ইউক্যাটান থেকে একটা বাক্স পাঠিয়ে দিয়েছি রানা এজেন্সির ঠিকানায়।'

'বড় কোনও বাক্স? এলেই সরিয়ে রাখব?'

'সাবধানে। ওটার ভেতর কিন্তু পটারি আছে,' বলল সোহানা। 'ভেঙে গেলেই সর্বনাশ।'

'যাত্রাপথে না ভেঙে থাকলে নতুন করে ভাঙবে না,' হাসল সালমা আলী। 'আপনারা কি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে ফিরছেন?'

'বিমানের টিকেট পেলেই,' বলল রানা।

'আমাদের নতুন অফিস বা উপরের অ্যাপার্টমেন্ট এখনও গুছিয়ে নিতে পারিনি। স্যান ডিয়েগোতে কোন্ হোটেলে উঠতে

চান?'

'গতকাল পর্যন্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির বুকে রাত কাটিয়েছি,' বলল সোহানা। 'আশা করি কয়েক রাত হোটেলে থাকলে মরব না।'

'আপনারা বললে ভ্যালেনসিয়া হোটেলে বুকিং দিতে পারি। ওদের চমৎকার সব সুইট আছে। ভিলাও ভাড়া দেয়। লন পেরোলেই সৈকত।'

'শুনে তো দারুণ মনে হচ্ছে,' বলল সোহানা। 'ভিলা হলেই ভাল।'

'আশা করি পেয়ে যাব,' বলল সালমা। 'জানাব।'

'বিমানে ওঠার আগে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেব,' বলল রানা। ফোন রাখবার পর সোহানার কমপিউটারের মাধ্যমে বিমানের টিকেট কিনল ও।

এবার মায়ান আমলের উপর বিশেষজ্ঞ আর্কিয়োলজিস্টদের নাম এবং তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে রিসার্চ করল ওরা। এক পর্যায়ে খুশি হয়ে উঠল দু'জন। একজন রয়েছেন স্যান ডিয়েগোর ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়ায়। বাঙালি প্রফেসর। নাম আক্তার রশিদ।

তাঁকেই ই-মেইল করবে ঠিক করল ওরা।

চিঠিতে লিখল রানা, ভলকান টাকানায় অস্বাভাবিক একটি জিনিস পেয়েছে। অ্যাটাচ্ করল মেক্সিকান পত্রিকার আর্টিকেলটা। জানতে চাইল, প্রফেসর রশিদ রানা এজেন্সিতে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন কি না।

লেখা শেষে সোহানাকে পড়তে দিল চিঠি।

'সংক্ষেপে এর বেশি কিছু লেখার নেই,' মত দিল সোহানা। 'এবার সেণ্ড টিপে পাঠিয়ে দাও।'

'নিজেদের সম্পর্কে কিছু লেখা উচিত না?' বলল রানা।

'জানাব কোন্ কোন্ দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে গেছি?'

'কোনও দরকার নেই। অ্যাটাচমেন্ট সঙ্গে দেয়াই যথেষ্ট। পড়ার সময় সামনে থাকবে তাঁর কমপিউটার। গুগল ব্যবহার করলেই যা জানার জেনে নিতে পারবেন।'

একঘণ্টাও লাগল না, রানাদের কাছে পৌঁছে গেল প্রফেসর আক্তার রশিদের ই-মেইল। লিখেছেন, খুবই খুশি হবেন ওদের সঙ্গে দেখা হলে। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন নতুন পাওয়া আর্টিফ্যাক্ট দেখবার জন্য।

কমপিউটারের স্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করল সোহানা। 'দেখলে, উনি লিখেছেন নতুন পাওয়া আর্টিফ্যাক্টের কথা? গুগল ঘেঁটে আমাদের নাড়িনক্ষত্র বের করেছেন।'

বিকেলে ক্লাব থেকে চেক আউট করল ওরা, রানা ডাকল ট্যাক্সি। রওনা হবে শহরের দক্ষিণের এয়ারপোর্ট লক্ষ্য করে, গাড়ির ট্রাঙ্কে ওদের ব্যাকপ্যাক রাখছে ড্রাইভার, এমন সময় একটু ইতস্তত করল সোহানা।

'কী হলো?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল সোহানা। 'মেইন এণ্ট্র্যান্সের কাছে এক লোক। আমরা বেরোতেই দৌড়ে চলে গেল আরেকদিকে।'

'কোন্দিকে?'

'সোজা রাস্তা ধরে ডানদিকে।'

'হয়তো পার্কিং অ্যাটেণ্ড্যান্ট, কারও গাড়ি আনতে গেছে,' বলল রানা।

'হতে পারে। হয়তো বেশি ভাবছি। সে রাতে হোটেলে...' চুপ হয়ে গেল সোহানা।

ট্যাক্সির পিছন সিটে বসল ওরা।

ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার, 'কোন্ এয়ারলাইন?'

'এয়ারোমেক্সিকো,' বলল সোহানা।

ক্লাবের দীর্ঘ ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে ফেডারাল হাইওয়েতে উঠল গাড়ি। দশ মাইল দূরে এয়ারপোর্ট, স্বাভাবিক গতি নিয়ে চলেছে সব গাড়ি, সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছবার কথা ওদের। একপাশে নীল মেক্সিকো উপসাগর।

কিছুক্ষণ পর সামনে ডানদিকে দেখা দিল এয়ারপোর্ট। ওরা খেয়াল করল, দ্রুতগতিতে পিছনে এসে হাজির হয়েছে একটা কালো গাড়ি। পাশে চলে এল ওটা, সমানে চলেছে। প্যাসেঞ্জার সিটে এক কঠোর চেহারার লোক। পরনে কালো সুট। জানালা দিয়ে হাত বের করে থামতে ইশারা করল।

বিড়বিড় করল ট্যাক্সি ড্রাইভার, 'পোলিসিয়া।' গতি কমিয়ে গাড়ি থামাল সে।

পিছনে রয়ে গেল কালো গাড়ি। থেমেছে রানাদের গাড়ির রিয়ার বাম্পার থেকে কয়েক ফুট পিছনে।

রানা ও সোহানা দেখল, ওই গাড়ি থেকে নামল দুই লোক।

তাদের একজন থামল ড্রাইভারের জানালায়, হাত বাড়িয়ে দিল।

তার হাতে নিজের লাইসেন্স দিল ড্রাইভার।

ওটা দেখে নিয়ে ফেরত দিল লোকটা। কঠোর চোখে দেখল রানা ও সোহানাকে।

ওদের ট্যাক্সির পিছনে, ডানদিকে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় লোকটা। হাত কোমরের হোলস্টারে।

ফিসফিস করে রানাকে বলল সোহানা, 'একেই ক্লাবের এণ্ট্র্যান্সে দেখেছি।'

ড্রাইভারের পাশের লোকটা বলল, 'অ্যাব্রা এল ম্যালেটেরো।'

ড্রাইভার বাটন টিপে দিতেই খট্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল ব্যাক ডালা। পিছনের লোকটা ডালা তুলে বের করল রানা ও সোহানার ব্যাকপ্যাক। দেরি না করে ঘাঁটতে শুরু করেছে।

'কী খুঁজছেন?' স্প্যানিশে জানতে চাইল রানা।

ড্রাইভারের পাশের লোকটা ওর দিকে চাইল, চোখে খুন। বলল না কিছু।

নেমে পড়তে চাইল রানা, কিন্তু দরজা সামান্য খুলতেই উরুর জোরে আবারও ধপ্ করে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। অস্ত্র বের করে তাক করেছে রানার বুকে।

হেলান দিয়ে সিটে বসল রানা। দু'হাত রেখেছে উরুর উপর। জানালা থেকে পিছিয়ে গেল লোকটা।

'খুব সাবধান, স্যর,' নিচু স্বরে বলল ড্রাইভার। 'এরা পুলিশ নয়। কিছু করতে চাইলে তিনজনকেই খুন করবে।'

অপেক্ষায় রইল ওরা। একটু পর রানা-সোহানার ব্যাকপ্যাক নিয়ে কালো গাড়িতে রাখল পিছনের লোকটা। অন্য লোকটাও গিয়ে উঠল ওই গাড়িতে। ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল গাড়ি।

'এরা কারা?' জানতে চাইল রানা।

'জানি না, সেনর,' বলল ড্রাইভার। 'সাধারণত এরা ঝামেলা করে না। সবাই জানে এরা ভয়ঙ্কর খারাপ লোক। নার্কোটিক্স্ চালান দেয়ার কাজ এরাই করে। কখনও কখনও কারও খোঁজে শহরে আসে, আর তখন খুন হয়ে যায় সেই লোক। যে কারণেই হোক, আপনাদের ওপর চোখ পড়েছিল আজ। আপনারাই বরং বলতে পারবেন এর কারণ কী।'

গম্ভীর মুখে পরস্পরকে দেখল রানা ও সোহানা।

রানা বলল, 'এয়ারপোর্টে চলুন। বিমানে উঠতে হবে।'

সুদৃশ্য টার্মিনালের প্রায় বৃত্তাকার ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে নেমে পড়ল ওরা। ড্রাইভারকে ভাল টিপস দিল রানা। 'এটা আপনার পাওনা হয়েছে।'

টার্মিনালে ঢুকে সোহানা বলল, 'বুঝতেই তো পারছ কী খুঁজছিল।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'একবার বদমাশ কোসে তালামেন্তেযকে পেলে ঘাড়টা মটকে দিতাম। কে বলেছিল ওকে পাবলিসিটি দিতে!'

'নির্দিষ্ট গেটে যাই চলো, তোমার পচা হাঁড়ির জন্যে আবারও কেউ খুন করতে চাইতে পারে,' তাড়া দিল সোহানা।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরতে লাগবে পুরো আট ঘণ্টা। এর মাঝে বিমান একবার থামল ফোর্ট ডিয়েগোতে, ডালাসে। রাত নামবার পর স্যান ডিয়েগোর আকাশে পৌঁছে গেল ওরা, অনেক নীচে দেখা গেল শহরের ঝিলমিলে বাতি।

রানার কাঁধে মাথা রেখে বলল সোহানা, 'যাক, পৌঁছে গেছি।'

'এবার কিন্তু অনেক কাজ,' বলল রানা।

'আবারও মায়াদের সেই পচা হাঁড়ি?' চোখ গরম করল সোহানা।

'কাজে আসতে পারে।' মৃদু হাসল রানা।

'ওটা আমার কোনও কাজেই আসবে না তোমার ভাত রাঁধতে!'

ছয়

মেক্সিকো থেকে ফিরে দু'দিন কাটাল রানা-সোহানা ভ্যালেনসিয়া হোটেলের ভিলায়। তারপর ঝলমলে এক ভোরে পৌঁছল রানা এজেন্সির ছোট্ট কিন্তু গোছানো অ্যাপার্টমেন্টে। জায়গাটা গোল্ড-ফিশ পয়েন্টে। নীচে তিনতলা অফিস, ওপরে ওদের ফ্ল্যাট।

চারতলা বেয়ে নেমে পঞ্চাশ গজ গেলেই সৈকত। সকালে

এসেই বিচে হাজির হয়েছে রানা ও সোহানা। সঙ্গে সালমা আলীর জার্মান শেফার্ড, মস্ত এক কালো কুকুর, নাম কাল্লু। কেন যেন রানা ও সোহানাকে অন্তরের বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে। সৈকতে কেউ ওদের দিকে চাইলেই খুনি চোখে দেখছে তাকে।

আমেরিকান মাফিয়ার এক অংশের হামলার পর নতুন করে সাজানো হয়েছে রানা এজেন্সির এই শাখা। মহৎ হৃদয় বাঙালি বিজ্ঞানী কুয়াশার সহায়তা নিয়েছে রানা। আধুনিক নিরাপত্তামূলক সব ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে এ বাড়িতে। কয়েক প্লাটুন সৈনিক হামলা করলেও দখল করতে পারবে না। সাইক্লোন হলেও ভাঙবে না বুলেট প্রুফ জানালা। চাইলেই সরসর করে উপর থেকে নামবে স্টিলের প্লেট। মাত্র একটা সুইচ টিপলেই দুর্গ হয়ে উঠবে বাড়ি। চারপাশে পাইন গাছের সারি, কিন্তু নতুন কারও জানবার উপায় নেই, বিশ গজ দূরে কম্পাউণ্ডে কেউ ঢুকলেই দেখবে ক্যামেরা, সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে ক্যামেরা অপারেটার ওয়াচারকে।

সৈকত থেকে ফিরতেই আবারও ওদের সঙ্গে দেখা হলো সালমা আলীর। ট্যুর গাইডের মত করে বাড়ির নানাদিক দেখাতে চাইল সে।

'নিশ্চয়ই দেখেছেন, ডাবল প্যান সেফটি গ্লাস? স্লেজহ্যামার দিয়ে বাড়ি দিলেও ভাঙবে না।'

রানা সবই জানে, কিন্তু সোহানা নয়।

চুপচাপ টুরিস্ট হয়ে গেল রানা।

প্রথমতলার বুকশেলফের সামনে থামল সালমা। নির্দিষ্ট বই টান দিল, আর অমনি পাশেই খুলে গেল সরু দরজা।

সালমার পিছু নিয়ে প্যাসেজে ঢুকল ওরা, পিছনে খট্ আওয়াজ তুলে বুজে গেল দরজা।

'কী বুঝলেন, সোহানা? বুকশেলফের দরজা খুললেই জ্বলে উঠবে প্যাসেজে বাতি।' একটু যেতেই একটা ল্যাণ্ডিং, তারপর

বারো ধাপ সিঁড়ি নেমেছে এক স্টিলের দরজার সামনে। 'কমবিনেশন জানা না থাকলে কেউ খুলতে পারবে না তালা।' কোড ব্যবহার করে তালা খুলল সালমা। দরজা সরে যেতেই দেখা গেল কংক্রিটের প্রশস্ত এক জায়গা। 'আমরা আছি সামনের লনের নীচে।' ছাতের দিকে আঙুল তাক করল সালমা। 'হয়তো খেয়াল করেছেন, দরজা খুলতেই আপনাআপনি বাতাস ও আলো আসছে? পোক্ত কালভার্টের মত করে তৈরি ওই ছাত, নীচে এই জায়গা এজেন্টরা ব্যবহার করবে শুটিং গ্যালারি হিসেবে।'

'ফায়ারিং রেঞ্জ?' জানতে চাইল সোহানা।

'জী।' মাথা দোলাল সালমা। 'পিছনে দেয়ালের কাছে মস্ত গান সেফ। কয়েক শ' রাইফেল বা কারবাইন রাখতে পারবেন। পাশেই ওঅর্ক বেঞ্চ। অস্ত্র পরিষ্কার, বা অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্যে।'

'আপনি খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে সব নিখুঁত করতে চেয়েছেন,' বলল সোহানা। 'কিন্তু শুনেছি জীবনে অস্ত্র ব্যবহার করেননি।'

'এজেন্সির অন্যসব এজেন্টদের লাগবে, তাই।'

'রেঞ্জের পরে কী?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল সোহানা।

'স্টিলের দেয়াল, ওটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁকা, গুলি লাগলেই বুলেট চলে যাবে সামনের বালির বাঁধে।'

'কুয়াশার পরামর্শ মত দ্বিতীয় দরজাটা রাখা হয়েছে?' প্রথমবারের মত মুখ খুলল রানা।

'নিশ্চয়ই,' বলল সালমা। 'স্টিলের দেয়ালের পিছনে। ওই দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই পাইন গাছগুলোর মাঝে পৌঁছানো যাবে। ওখান থেকে রাস্তা খুব কাছে।'

'এবার চলুন ওপরে যাই,' বলল রানা।

ফিরতি পথ ধরল সালমা। 'নতুন জটিল ইলেকট্রনিক্সগুলোও বসিয়ে দিয়েছে পবন হায়দার। ছোকরা সত্যিকারের জিনিয়াস। হামলা হলে কারেন্ট যেতে পারে, তাই একটার বদলে চারটে

ইমার্জেন্সি জেনারেটার রেখেছে। নানান কাজ সেসবের। এক সেকেণ্ডের জন্যেও যাবে না ইলেকট্রিসিটি। মূল কথাঃ চুরি বা ডাকাতি প্রায় অসম্ভব দুর্গের মত এই বাড়িতে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে খাটো প্যাসেজ পেরিয়ে বুকশেলফের দরজা খুলল ওরা, বেরিয়ে এল অফিসে। পিছনে আটকে গেল দরজা। থমকে গিয়ে সালমা আলী বলল, 'আরেহ্, অবাক কাণ্ড! ওটা তো আগে দেখিনি!'

শাখা প্রধানের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওদিকে চাইল রানা ও সোহানা। ঘরের আরেক পাশে রাখা হয়েছে কার্ডবোর্ডের বড় এক বাক্স।

'মেক্সিকো থেকে পাঠানো আমাদের সুভ্যেনিয়রের বাক্স,' চিনে ফেলল সোহানা।

বাক্সের একটু দূরেই ডেস্ক কমপিউটারে বসে কাজ করছে মহিলা এজেন্ট মিরা হালদার। বলল, 'একটু আগে এসেছে। সই করে বুঝে নিয়েছি।'

'গুড,' বলল রানা। গিয়ে মেঝে থেকে বাক্সটা দু'হাতে তুলল ও, নামিয়ে রাখল একটু দূরের ডেস্কে। 'মনে হয় না কিছু ভেঙেছে।'

'ওটা দেখে ঘাম ছুটে গেছে আমার, মাসুদ ভাই,' বলল সালমা, মনে মনে এখনও আর্কিয়োলজিস্ট। 'ভাবতে পারিনি এত দামি জিনিস এভাবে পাঠাবেন!'

'কোনও উপায় ছিল না। চোরের নজর এড়াতে এটা করতেই হয়েছিল।'

ডেস্ক ড্রয়ার থেকে বক্স কাটার বের করে রানার হাতে দিল সালমা। 'দেখাবেন জিনিসটা?'

যত্নের সঙ্গে বাক্স খুলল রানা, সরিয়ে ফেলল প্যাকিং পিনাট, একে একে বের করতে লাগল সব।

প্রথমে বেরোল ওয়াল হ্যাঙিং ট্যাপেস্ট্রি ও ম্যাট।

মোড়ানো একটা দেয়াল কার্পেট খুলল সালমা, তারপর আরও দুটো। 'সত্যিকারের আতঙ্কজনক,' বলল, 'আর এই রাজা তো দেখতে প্রায় এলভিস প্রেসলির মত।' একটা ছোট হাঁড়ি নিল, সরিয়ে ফেলল উপরের কাগজ। 'খুব কমই পাওয়া যায় এত চকচকে যোদ্ধা! দাম কত এই হাঁড়ির? দু' ডলারের বেশি হলে জীবনেও কিনব না। যে এঁকেছে, কোনও জাতের শিল্পীই নয় সে।'

মৃদু হাসল সোহানা। 'আপনার হাতের ওই হাঁড়ির চকচকে রং আর ছবি আপনাদের প্রিয় বসের কীর্তি। তবে, ভাববেন না, ওটাই আসল মায়ান হাঁড়ি।'

আধ হাত জিভ কাটল সালমা আলী। আস্তে করে ডেস্কে হাঁড়ি নামিয়ে রেখে মাথা নেড়ে বলল, 'আমাদের মাসুদ ভাই হরর ছবি আঁকার দক্ষ শিল্পী হতে পারতেন।'

'হ্যাঁ, শিল্পমনা যে-কেউ বলবে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হয়েছে তার চোখের ওপর,' সায় দিল মিরা। 'সোনালী আর রূপালী রং! বাপ্‌স্!'

'এসব করেই ইউরোপিয়ানরা মিশরের আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে আনত,' আত্মরক্ষা করতে চাইল রানা। 'কেউ জানত না ওগুলো নকল নয়। আজও এসব চলছে।' মোবাইল ফোন বের করল ও, ডায়াল করল ডক্টর আক্তার রশিদের নাম্বারে। ভদ্রলোক রিসিভ করতেই বলল, 'ডক্টর রশিদ?'

'ইয়েস, মিস্টার রানা, বলুন?'

'জিনিসটা পৌঁছে গেছে। আপনি কি আজই দেখতে চান?'

'কখন এলে সুবিধে হয়?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'আমাদের কোনও সমস্যা নেই, বিকেল পর্যন্ত আছি।' রানা এজেন্সির ঠিকানা জানিয়ে দিল ও।

'একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব,' বললেন প্রফেসর।

কল কেটে সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। 'উনি আসছেন, তার আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে নকল প্রলেপ, নইলে রং দেখেই হার্টফেল করবেন ভদ্রলোক।'

সঠিক সময়ে হাজির হলেন বাঙালি প্রফেসর, এক মিনিটও দেরি হয়নি আসতে। মাঝবয়সী মানুষ, স্মার্ট। পরনে জিন্স ও স্পোর্টস কোট, তার নীচে কালো পোলো শার্ট। তবে ব্যাকব্রাশ করা এলোমেলো চুল ও আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টি দেখে আন্দাজ করা যায়ঃ অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। অফিসে ঢুকেই তাঁর চোখ পড়েছে ডেস্কের উপর রাখা মায়ান হাঁড়ির উপর। ওটার উপর থেকে চোখ সরাতে পারলেন না। থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন।

রানা এগিয়ে যেতেই হাত মেলালেন। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আপনিই নিশ্চয়ই মিস্টার রানা? আমি আক্তার রশিদ।'

রানার পাশে এসে থামল সোহানা। 'আমি সোহানা চৌধুরী। আসুন, ওটা কাছ থেকে দেখবেন।'

কাঠের মেঝেতে জুতোর সোলের মৃদু কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলে রানা-সোহানার পিছু নিলেন ভদ্রলোক। তবে হাঁড়ির ছয় ফুট দূরে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনোযোগ দিয়ে দেখছেন জিনিসটা। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও এগোলেন, ভুরু কুঁচকে খুব কাছ থেকে চাইলেন। পুরো এক চক্কর কাটলেন ডেস্ক। প্রতিটি অ্যাংগেল থেকে পরখ করছেন ওটাকে।

'আপনাদের বিষয়ে লেখা আর্টিকেল পড়েছি, জিনিসগুলোর ছবিও দেখেছি,' বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু নিজ চোখে এ জিনিস দেখার সৌভাগ্য আগে কখনও হয়নি। আজ সার্থক হলো আমার জীবনটা। কাছ থেকে এসব দেখা মানে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এসব হাঁড়ি বা পেইন্টিং থেকে বোঝা যায় কেমন ছিলেন সেই শিল্পী। যেমন, পেটমোটা কুকুরের মত আকৃতির পানির জগ

জানিয়ে দেয় কেমন ছিলেন সেই মায়ান কারিগর বা কী রকম ছিল তাঁর চারপাশের পরিবেশ।'

'যেন হাজার বছর আগের কেউ চেয়ে আছে আপনার দিকে,' সায় দেয়ার সুরে বলল সোহানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে হাঁড়ি লক্ষ্য করলেন প্রফেসর। চাপা স্বরে বললেন, 'তবে আজকের এই জিনিসটা একেবারেই অন্যরকম। এটা সেরা জিনিস। ক্লাসিক পিরিয়ডের। কোপ্যানের রাজাদের সময়ের।' মুখ তুলে রানা ও সোহানার দিকে চাইলেন। 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, এমন কিছু পাওয়া গেলে দেরি না করে মেক্সিকোর সরকারকে জানাতে হবে?'

'আমরা জানি,' বলল রানা, 'কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী ঝামেলার ভেতর ছিলাম। উপায় ছিল না কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার। যে-কোনও সময়ে চুরি হতে পারত জিনিসটা, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ভুলেও ভাববেন না ওটা আমরা নিজেদের কাছে রেখে দিতে চাই। ঠিক সময়ে পৌঁছে দেব কর্তৃপক্ষের কাছেই। কিন্তু তার আগে আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে নতুন কিছু জানতে চাই।'

'আইন জানেন শুনে ভাল লাগল,' বললেন ডক্টর।

'আপনি কি নিশ্চিত এটা কোপ্যান থেকে এসেছে?' জানতে চাইল সোহানা। 'আমরা পেয়েছি টাপাচুলার উত্তর দিকের টিকানা পাহাড়ে। কোপ্যান তো চার শ' মাইল দূরে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'স্থানীয়রা কখনও কখনও ব্যবসার কাজে হাজার মাইলও পেরিয়ে যেত হেঁটে।'

'এই পট কত বছর আগের?'

আস্তে করে মাথা কাত করলেন ডক্টর রশিদ। 'সঠিকভাবে বলতে হলে... দাঁড়ান... ইয়্যাক্স পাসাজ চ্যান ইউপাট ছিলেন

কোপ্যানের রাজা। সময়কাল ষোলো শ' শতাব্দী। এই যে এখানে লিখেছে।' হাঁড়ির পাশে লম্বা কয়েকটা কলাম দেখালেন। উপরের অংশ দেখতে সিলমাছের গলা ও মাথার মত।

'আপনি কি ওই ভাষা পড়তে পারেন, ডক্টর?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। এসব কলামে এক থেকে শুরু করে পাঁচটা গ্লিফ আছে। প্রতিটি গ্লিফ একটা পদ বা শব্দ হতে পারে। ওসবের মাধ্যমে বোঝানো হতে পারে গোটা বাক্য বা প্যারাগ্রাফও। উপরের বাম থেকে ডানদিকে পড়তে হবে। তবে তা প্রথম দুটো কলাম। তারপর এক লাইন নেমে পড়তে হবে বাম থেকে ডানে... ইত্যাদি। এখন পর্যন্ত মায়ান ভাষায় আট শ' একষট্টিটা গ্লিফ পাওয়া গেছে।'

'জানি বিশটার বেশি মায়ান ভাষা আছে,' বলল সোহানা। 'প্রতিটা ভাষায় এই হাঁড়ির লেখা পড়া যাবে?'

'না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'আমরা শুধু বুঝব চোলান, সেলতাল্যান আর ইউক্যাটেক।'

হাঁড়ির দিকে চাইল রানা। 'এটা তা হলে এসেছে কোপ্যান থেকে। তার মানে হণ্ডুরাস পার করে গুয়াতেমালার পর এসেছে মেক্সিকোর সীমান্তে।'

'এবং কখন এসেছে?' প্রশ্ন সোহানার।

'আমিও তা-ই জানতে চাই,' বললেন ডক্টর, 'আমরা মানুষটার দেহের অর্গানিক মেটারিয়াল পরীক্ষা করতে পারি কার্বন ডেট ব্যবহার করে। তা হলেই জানব কবেকার মানুষ তিনি।'

'আমরা ডক্টর গ্যাবরিয়েলা বা অ্যাডোরার সঙ্গে আলাপ করতে পারি,' বলল সোহানা, 'ওরা হয়তো ওই দেহ টেস্ট করাতে পারবে। লাশ আছে টাপাচুলার হাসপাতালের মর্গে। ভূমিকম্পের পর নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছে এই দু'জন ওই এলাকায়, কাজেই

মেডিকেল কমিউনিটি ওদের সাহায্য করবে।'

'তাঁরা আর্কিয়োলজিস্ট?' চট করে প্রশ্ন করলেন ডক্টর রশিদ।

'না, তাঁরা ডাক্তার,' বলল রানা।

'আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমার কয়েকজন মেক্সিকান কলিগের সঙ্গে কথা বলতে পারি,' বললেন প্রফেসর। 'ওই দেহ পেলে আগ্রহ নিয়ে কাজ করবেন তাঁরা। প্রত্যেকেই প্রথম সারির বিজ্ঞানী। অত্যন্ত সম্মানী মানুষ।'

'আমাদের কোনও আপত্তি নেই,' বলল সোহানা।

রানা মাথা ঝাঁকাল। প্রফেসরকে ওজন করা হয়ে গেছে।

'তা হলে আজ বিকেলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। সবাই হৈ-হৈ করে উঠবে, ব্যস্ত হয়ে ছুটে যাবে ওই লাশ দেখতে। আর কোথায় রেখেছেন তা গোপন করে খুবই ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু নিশ্চয়ই জানেন, কান পেতে আছে অনেকে, অপেক্ষা করছে। কেউ কেউ স্কলার বা বিজ্ঞানী, অন্যরা হাঁড়ি শিকারি বা লুটেরা।'

'জানাজানি যা হয়েছে তা পাহাড়ে আমাদের সঙ্গের এক উকিল ভলান্টিয়ারের কারণে,' বলল রানা, 'তার ধারণা: আমরা অযথা গুপছুপ করছি, আবিষ্কারের কথাটা জানানো উচিত সবাইকে। আমরা চেয়েছিলাম আগে ওই সাইট বিজ্ঞানীরা দেখুন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।'

'চেষ্টা করেছেন, এ-ও কম কথা নয়,' বললেন ডক্টর রশিদ। 'আপনাদের সঙ্গে এমন কিছু আছে, যা কার্বন ডেট করা যায়?'

'নেই, তা নয়,' বলল সোহানা, 'মায়ান ওই মানুষ তৈরি করেছিলেন কাঠের ভেসেল। এ ছাড়া ওখানে ছিল শস্য ও ফলের শুকনো অংশ।'

'গুড,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'জীবিত যে-কোনও কিছু মারা যাওয়ার পর থেকেই হারাতে শুরু করে কার্বন ১৪।'

'ওগুলো নিয়ে আসছি,' বলল সোহানা। চলে গেল পাশের

ঘরে, একটু পর ফিরে এল প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে। ভিতরে কাঠের ভেসেল্, শস্য ও ফলের ছোবা।

হাঁড়ির উপর আবারও মনোযোগ দিলেন প্রফেসর। 'এটার ঢাকনি আছে। মনে হচ্ছে কোনও আঠা দিয়ে বন্ধ। মৌমাছির মোম হতে পারে। খুলে দেখেছেন?'

'না, খুলিনি,' বলল রানা। 'জানি, সমাধি খোলার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হতে শুরু করবে সব। চাইনি হাঁড়ির ক্ষতি হোক। ওটা নিয়ে নানাদিকে যেতে হয়েছে। অবশ্য, বুঝতে পেরেছি, ভেতরে তরল কিছু নেই। কোনও ধাতু বা পাথর হতে পারে। নড়ে।'

'আমি কি খুলে দেখব?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'ক্ষতি কী, আপনি যখন এক্সপার্ট,' বলল সোহানা। 'আসুন।' হাঁড়িটা সাবধানে তুলে নিল ও, রওনা হয়ে গেল পাশের রুমের উদ্দেশে। 'এখানে একটা ক্লাইমেট-কণ্ট্রোল্ড্ কামরা আছে।'

'চমৎকার!'

পিছু নিলেন প্রফেসর, সঙ্গে রানা।

ওদিকের ঘরে একটা আলমারি, মাঝারি টেবিল, লাল রঙের টুল চেস্ট, এ ছাড়া কয়েকটা চেয়ার।

টেবিলের উপর হাঁড়ি রাখল সোহানা। টুল চেস্ট থেকে সূক্ষ্ম কয়েকটা যন্ত্র বের করল রানা। সেগুলোর ভিতর রয়েছে ব্রাশ, টুইযার, এক্স-অ্যাকটো নাইফ, ডেণ্টাল পিক, ম্যাগনিফায়ার, অওল, শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট ও স্টেরাইল সার্জিকাল গ্লাভস।

গ্লাভস পরে নিলেন প্রফেসর রশিদ। পছন্দমত পিক ও টুইযার বেছে নিয়ে হাঁড়ির ঢাকনি পরখ করলেন। সামান্য পরিমাণ আঠা তুললেন পিক দিয়ে। স্ট্যাণ্ডে রাখা ম্যাগনিফায়ারের নীচে রেখে দেখলেন আঠা। 'কোনও গাছের কষ দিয়ে তৈরি।' টেবিল থেকে এক্স-অ্যাকটো নাইফ নিলেন, খুব সাবধানে ঢাকনির আঠা সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। বোঝা গেল, পাকা হাত।

'বোধহয় ভেতরে খাবার নেই,' বলল সোহানা।

'কী যে আছে, এখুনি দেখতে পাব,' বললেন প্রফেসর। 'আঁচ করার সাহস নেই আমার। আর্কিয়োলজি মানেই বুক ভরা আশা। শেষে হয়তো দেখা গেল হাঁড়ির ভেতর রয়েছে এক দলা কাদা।' সতর্ক হাতে ঢাকনি ধরলেন তিনি, তারপর ছুরি দিয়ে সামান্য চাড় দিলেন। 'ইন্টারেস্টিং। সামান্য নড়ছে ঢাকনি, কিন্তু উঠে আসছে না। বোধহয় আগুনে গরম করেছে হাঁড়ি, তারপর আটকে দিয়েছে ঢাকনি। হাঁড়ি ঠাণ্ডা হওয়ার পর ভেতরে তৈরি হয়েছে ভ্যাকিউম।'

'বুদ্ধি ছিল মানুষটার,' বলল সোহানা।

'এখন কথা হচ্ছে, ঢাকনি না ভেঙে খুলব কীভাবে।'

'হাঁড়ি আবারও সামান্য গরম করতে পারি,' বলল রানা। 'ভেতরের বাতাস গরম হয়ে উঠলে খুলে যাওয়া উচিত ওটার। অথবা এটা নিয়ে যেতে হবে আকাশের অনেক ওপরে, যেখানে এয়ার প্রেশার কম।'

'ভেতরের জিনিস নষ্ট না করে গরম করবে কীভাবে?' আনমনে বলল সোহানা।

'সমান তাপ দিলে হাঁড়ি ভাঙবে না,' বলল রানা। 'অল্প তাপে ওটা রাখতে পারি মাইক্রো আভনে।'

'আছে আভন? চলুন চেষ্টা করি,' বললেন ডক্টর রশিদ।

ওরা হাঁড়ি নিয়ে পাশের আরেকটা ঘরে এল। এ ঘর ছোট কিচেন। মাইক্রো আভনে হাঁড়ি রাখল রানা। তাপমাত্রা রাখল মাত্র আড়াই শতাংশ।

দশ মিনিট পর তোয়ালে দিয়ে হাঁড়ি ধরে সরিয়ে আনল রানা। টেবিলের উপর ওটা রাখতেই ঢাকনি খুলতে চাইলেন ডক্টর।

এবার অনায়াসেই নড়ল ঢাকনি।

হাঁড়ি নিয়ে আবারও রিসার্চ রুমে ফিরল ওরা। টেবিলে নামিয়ে রাখবার পর বলল সোহানা, 'এবার দেখা যাক কী আছে?'

'প্রাচীন খাবারের অবশিষ্ট দেখলে হতাশ হবেন না,' হাসলেন রশিদ। 'যাই থাকুক, ওটা থেকে নতুন কিছু জানা যাবে।' বড় করে দম নিলেন তিনি, হাতে এখনও সার্জিকাল গ্লাভস। আস্তে করে টান দিলেন ঢাকনির একদিক। সরে গেল ঢাকনি। ভিতরে মনে হলো শুকনো আগাছা।

'প্যাকিং মেটারিয়াল?' ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ভিতরে আলো ফেললেন তিনি। পরক্ষণে চমকে গেলেন। 'আরে... এ কী! এ কি সম্ভব?'

'জিনিসটা কী?' জানতে চাইল সোহানা।

'মনে হচ্ছে একটা বই। মায়ান বই!'

'বের করতে পারবেন?'

হাঁড়ির ভিতরে নিষ্কম্প দুই হাত ভরলেন প্রফেসর, তারপর খুবই ধীরে বের করলেন বাদামি, চারকোনা জিনিসটা। আস্তে করে রাখলেন টেবিলে। গ্লাভস পরা তর্জনী ব্যবহার করে উপরে তুললেন বইয়ের কয়েকটা পাতা। চাপা স্বরে বললেন, 'আস্ত! এ যে অবিশ্বাস্য!' সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, হারিয়ে গেছেন ভাবনার জগতে। অতি ধীরে পাতা নামিয়ে আঙুল সরিয়ে নিলেন। মনে হলো প্রথমবারের মত খেয়াল করলেন ঘরে আছে রানা ও সোহানা।

জ্বলজ্বল করছে ভদ্রলোকের চোখ। 'এটা মায়ান বই, আমরা বলি কোডেক্স। মনে হচ্ছে কোনও ক্ষতি হয়নি। ঠিকভাবে পরীক্ষা করতে সময় লাগবে। জানি না কতটা ভঙ্গুর। হতে পারে কয়েকবার পাতা ছুঁলেই গুঁড়ো হয়ে যাবে জিনিসটা।'

'এসব তো পাওয়াই যায় না শুনেছি,' বলল সোহানা।

'পশ্চিম হেমিস্ফেয়ারের সবচেয়ে দুর্লভ ও দামি জিনিস,' বললেন প্রফেসর রশিদ। 'আমেরিকায় একমাত্র মায়ারা লিখিত ভাষা তৈরি করেছিল। তাদের নিজস্ব সাহিত্য ছিল। একসময়

হাজার হাজার কোডেক্স ছিল, কিন্তু আজ রয়েছে মাত্র চারটি। সব আছে ইউরোপিয়ান মিউযিয়ামে। ড্রেসডেন কোডেক্স, মাদ্রিদ কোডেক্স, প্যারিস কোডেক্স। এ ছাড়া আছে গ্রোলিয়ের কোডেক্স, কিন্তু ওটা অন্যগুলোর তুলনায় এতই নিম্ন মানের যে, সত্যিকারের কোডেক্স বলা যায় না। অনেক গবেষক মনে করেন ওটা আসলে নকল। অন্য তিনটে বইয়ে আছে মায়াদের নানান জ্ঞানের কথা—জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কবিদ্যা, সৃষ্টিতত্ত্ব, ক্যালেণ্ডার... আর এখন যে বই দেখছি, এটা বোধহয় হতে যাচ্ছে পঞ্চম মায়ান কোডেক্স।'

'আপনি বললেন, একসময় হাজার হাজার ছিল,' বলল সোহানা।

'লাখ লাখ ছিল বললে ভুল হবে না,' বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু দুটো কারণে এখন আর পাওয়া যায় না। এসব পাতা তৈরি হয়েছে বুনো ডুমুর গাছ বা ফিকাস গ্ল্যাব্রাটা-র বাকল দিয়ে। ভাঁজ করে রূপ দেয়া হতো বইয়ের পৃষ্ঠায়। সাদা রংটা স্টাক্কো। তার উপর লেখা হতো। প্যাপিরাসের চেয়ে ভাল, প্রায় কাগজের মতই।'

'কেন এখন পাওয়া যায় না?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'প্রথমত, পরিবেশের কারণে। মায়াদের অঞ্চলে প্রচুর জঙ্গল, বুঝতেই পারছেন আর্দ্রতা ওখানে বেশি। এসব বই ভিজে গেলে পচে যেত। কোপ্যান, বেলিযের আলটুন হা বা উআক্সাকটুন গুইটানের সমাধিতে এসব বই পাওয়া গেছে, কিন্তু পচে গেছে সব ফিগ বাকল। শেষে ছিল রংচঙে স্টাক্কোর টুকরো। ওগুলো এতই ছোট টুকরো, কেউ নতুন করে একটা পাতাও তৈরি করতে পারেনি। এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হাজির হয়েছিল জাহাজে চেপে।'

'স্প্যানিশদের আগ্রাসন,' বলল রানা।

'তাদের বেশিভাগই ছিল যাজক। স্থানীয়দের ধর্ম সংক্রান্ত যা

পেত সব ধ্বংস করত। তাদের মনে হতো, মায়াদের দেবতা আস্ত সব ইবলিশ। কাজেই যেখানে এসব বই পেয়েছে, সবই নষ্ট করেছে আগুনে পুড়িয়ে। লুকানো সব জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে বের করেছে, যাতে একটাও না থাকে। পনেরো শ' সাল থেকে ষোলো শ' নয় সাল পর্যন্ত একের পর এক হামলা করে পুরো মায়ান রাজ্য দখল করেছে। শেষ শহরগুলোও রক্ষা পায়নি। কাজেই টিকে আছে মাত্র চারটে কোডেক্স।'

'এখন আছে পাঁচটি,' বলল সোহানা।

'বিস্ময়কর আবিষ্কার, সন্দেহ নেই,' বললেন ডক্টর রশিদ, 'এ জিনিস কোথায় রাখবেন ভাবছেন? অত্যন্ত নিরাপদ কোথাও রাখতে হবে।'

'আমাদের সেফে,' বলল রানা, 'চট্ করে ডাকাতি হবে না।'

'গুড। আজই শুরু করব কাজ। বের করব অন্য জিনিসগুলোর কার্বন ডেটিং। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আগামীকাল পরীক্ষা করব কোডেক্স।'

'কোনও আপত্তি নেই,' বলল রানা। 'কাজটা শেষ করা জরুরি বোধ করছি।'

'আপনার মতই আমরাও কৌতূহলী,' বলল সোহানা।

সাত

পরদিন বিকেলে রানা এজেন্সির অফিসে হাজির হলেন ডক্টর আক্কার রশিদ। তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল রানা-সোহানা। তাঁকে এয়ারকণ্ডিশণ্ড রিসার্চ রুমে নিয়ে গেল ওরা। হাতে

সার্জিকাল গ্লাভস পরে নিল সোহানা, কাঁচের দেরাজ খুলে বের করল কোডেক্স, সাবধানে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

কয়েক মুহূর্ত বইয়ের প্রচ্ছদের দিকে চেয়ে রইলেন ডক্টর রশিদ, তারপর বললেন, 'শুরু করার আগে বলে নিই, কাঠের ভেসেলের শস্য ও ফলের ছোবার কার্বন ডেটিঙের কাজ শেষ। ওই পাত্রের কাঠও পরীক্ষা করা হয়েছে। কার্বন ১৪ রয়েছে ৯৪.২১ পার্সেন্টি, অর্থাৎ সময়টা পনেরো শ' সাঁইত্রিশ সাল। কাঠ বা শস্য একই সময়ে মারা গেছে।'

'ক্লাসিক মায়ান সময়ের তুলনায় ওটা অনেক পরে নয়?' জানতে চাইল সোহানা।

'মায়ান সভ্যতার শেষ দিকের সময়। ওদের বেশিরভাগ শহর পরিত্যক্ত হয়েছিল এক হাজার সালের দিকে। কিন্তু রয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু শহর। এরপর এল স্প্যানিশরা। বড় ধরনের হামলা করল পনেরো শ' চব্বিশ সালে। তখনই স্থানীয় বন্ধু টিলাক্সক্যালা ও চোলুলার মস্ত এক সেনাবাহিনী নিয়ে মায়াদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন পেদরো দে অ্যালভারাডো। এর পরেও বহু দিন টিকে ছিল মায়াদের অনেক জনপদ। সেসব ছোট রাজাদের হারাতে যুগের পর যুগ লেগেছে। স্প্যানিশরা হাজির হওয়ার এক শ' পঞ্চাশ বছর পরে ষোলো শ' সাতানব্বুই সালে বিধ্বস্ত হয় শেষ মায়া শহর।'

'আমরা যাঁকে খুঁজে পেয়েছি, তিনি হয়তো উচ্চ বংশের রাজকীয় কোনও কর্মকর্তা,' বলল সোহানা। 'হণ্ডুরাসের কোপ্যান থেকে হাঁটাপথে রওনা হন এই হাঁড়ি নিয়ে। ভেতরে ছিল বইটি। চার শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মেক্সিকোতে এসে ওঠেন টিকানা আগ্নেয়গিরির দশ হাজার ফুট ওপরে। ওখানেই একটা পাহাড়ি ঘরে মারা যান। ...এ-ই তো?'

'মোটামুটিভাবে তা-ই। কেন ওখানে গিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে

আমরা জানি না।'

'কারণটা আন্দাজ করতে পারেন, ডক্টর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ধারণা, স্প্যানিশ আর্মির কাছ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান বইটি সরিয়ে ফেলতে বহু দূরের এক জায়গার উদ্দেশে রওনা হন তিনি, এবং পৌঁছেও যান একসময়ে। আপনাদের ওই সাইটের ছবি দেখে মনে হয়েছে, ওটা ছোট, পাথুরে এক পবিত্র মন্দির। ভেতরের দেয়ালে দেয়ালে সিযিনের ছবি। তিনি ভূমিকম্প এবং মৃত্যুর দেবতা। নৃত্যরত কঙ্কাল, অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে ঝুলছে যাঁর দুই চোখ।'

'এরপর কী হয়ে থাকতে পারে মানুষটার, ডক্টর?' গল্পের মত কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে সোহানার।

'আমি কিন্তু স্রেফ আঁচ করছি,' হাসলেন প্রফেসর রশিদ। 'মানুষটা নিরাপদে ওখানে বাস করছেন, এমন সময় হঠাৎ করেই একদিন অগ্ন্যুৎপাত হলো, লাভার স্রোত ঢেকে দিল ওই মন্দির। এমনও হতে পারে, ইচ্ছে করেই ওই মন্দিরে বই রেখেছিলেন তিনি। হয়তো জানতেন লাভা ঢেকে দেবে সব। বিশ্বাস করতেন দেবতা রক্ষা করবেন ওই বই।'

'নিজের মৃত্যুর পরোয়া করেননি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'পরকাল বিশ্বাস করত মায়ারা গভীরভাবে— মৃত্যুর পর মিলবে পুরস্কার, অথবা কঠোর শাস্তি। আরও বিশ্বাস করত, তাদের কাজের ওপর নির্ভর করছে কীভাবে চলবে গোটা জগৎ। জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কবিদ্যা থেকে তাদের ধারণা হয়েছিল, তারা নিজেরা ঠিকভাবে না চললে ভারসাম্য হারাবে জগৎ, ত্রুটিপূর্ণ মেশিনের মত ধ্বংস হবে। এবং পনেরো শ' সাঁইত্রিশ সালের অনেক আগেই শত শত বছর ধরে একের পর এক খারাপ চিহ্ন দেখেছে তারা। তাদের মনে হয়েছে ধ্বংসের

পথে চলেছে এই জগৎ। সাত শ' পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু করে নয় শ' সাল পর্যন্ত একের পর এক লড়াই চলেছে শহরে শহরে। ভয়ঙ্কর সব রোগে মারা গেছে মানুষ। তারপর পনেরো শ' চব্বিশ সালে স্প্যানিশরা যেন হরর সিনেমার এলিয়েনের মত হাজির হলো। তাদের সঙ্গে এমন সব অস্ত্র, যেগুলো ওরা কোনওদিন দেখেনি। সাদা লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করে পারা যায় না। মায়ারা নিজেরা তৈরি করতে পারল না অমন অস্ত্র। বিধ্বস্ত হতে লাগল তাদের অবশিষ্ট সভ্যতা। খুন করা হচ্ছে তাদের, ক্রীতদাস বানানো হচ্ছে। এসবই যেন বহু কাল ধরে বঞ্চিতদের দেয়া অভিশাপ, রূপ নিয়েছে বাস্তবে। মায়াদের দিনপঞ্জী একবার নতুনভাবে শুরু হতে সময় নেয় পাঁচ হাজার এক শ' পঁচিশ বছর। আমাদের ওই মন্দিরের মায়ান ভদ্রলোক অতীতের বহু কিছুই জেনেছেন, দেখেছেন চোখের সামনে অনেক কিছু। হয়তো তাঁর ধারণা ছিল এ বইয়ের তথ্য ভবিষ্যতে কাজে আসবে জগৎ রক্ষায়। নতুন করে হয়তো গড়ে তোলা হবে এই দুনিয়া। তিনি শুধু তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।'

'হয়তো এই বই রক্ষা করতে গিয়ে আত্মত্যাগই করেছেন তিনি,' বলল সোহানা।

'একবার বুঝুন কেমন লেগেছিল তাঁর! কল্পনা করুন, হঠাৎ আজ মানুষের মতই দেখতে একদল হিংস্র প্রাণী স্পেসশিপ থেকে নেমে হামলা করেছে, অকাতরে খুন করছে সবাইকে, ক্রীতদাস বানাচ্ছে যাকে খুশি। ধ্বংস করছে প্রতিটা কমপিউটার ও বই। পুড়িয়ে দিচ্ছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ও শিল্পকর্ম। কোনও ছবি থাকছে না, ক্যালকুলাস, অ্যালজেব্রা, অ্যারিথমেটিক এমনকী দর্শনও হারিয়ে গেছে। পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে সব ধর্মের বই। বাইবেল, কোরান, তালমুদ— সব আগুনে পুড়ে শেষ! কবিতা নেই, কোনও গল্প নেই, লিখিত ভাষাও মুছে দেয়া হয়েছে

পৃথিবীর বুক থেকে। ফিযিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, মেডিসিন, সব মানুষের ইতিহাস— হারিয়ে গেছে সবই!'

'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই করেছিল স্প্যানিশরা,' আস্তে করে বলল সোহানা। 'মায়াদের পৌঁছে দিয়েছিল পাথর যুগে।'

'আসলে এ কারণেই কোডেক্সের বিষয়ে এত আগ্রহী আমি,' বলল রানা। 'জানতে চাই কী রক্ষা করতে চেয়েছিলেন আমাদের বন্ধু, কী আছে এই বইয়ে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর রশিদ। 'এজন্যেই এই বই পড়ার আগ্রহের তাগিদে কয়েক রাত ঘুমাতে পারিনি।'

দরজায় কয়েকবার টোকার আওয়াজ হলো।

'কাম ইন,' বলল রানা।

ভিতরে ঢুকল সালমা আলী। 'দেরি করে ফেললাম, মাসুদ ভাই?'

'মোটেও না,' বলল রানা। 'ইনি প্রফেসর আক্তার রশিদ, আর ইনি সালমা আলী। সালমা রানা এজেন্সির শাখা প্রধান।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর, সালমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, 'সালমা আলী? নামটা আমার খুব পরিচিত। আপনি কি সেই আর্কিয়োলজিস্ট, যিনি ইনকা কুইপু ক্যাটালগ করেছিলেন?'

'জী,' মৃদু হাসল সালমা। 'কিন্তু কুইপু প্রজেক্ট অনেক আগের কথা।'

'শুরুটা আপনিই করেছিলেন। বাঙালিদের গর্ব হওয়া উচিত যে এমন রহস্যময় ভাষা ডিসাইফার করেছেন এক বাঙালি তরুণী।' হাতের ইশারা করলেন প্রফেসর, সালমা চেয়ারে বসে পড়বার পর বসলেন। 'ওই ডিসাইফারের কাজ আরও এগিয়েছে আপনার কারণেই।'

'তবে আজও আমরা বের করতে পারিনি ইনকাদের দড়ি বা গিঁঠের রহস্য,' বলল সালমা আলী। 'নানা রং বা দড়ির দৈর্ঘ্যের

বিষয়টিও ঘোলাটে। হয়তো ওই দড়ির ভাষা কখনও আবিষ্কার করবে কেউ।'

'সেদিনের জন্যে অপেক্ষা করছি,' অন্তর থেকে বললেন আক্তার রশিদ। 'স্প্যানিশরা হাজার হাজার কুইপু পুড়িয়ে না ফেললে এতদিনে হয়তো কিছু জানা যেত।'

টেবিলে রাখা কোডেক্সের দিকে চাইল সালমা। 'তো এটাই সেই বই।'

'হ্যাঁ,' বললেন প্রফেসর। 'আপনারা তৈরি তো?'

নীরবে সায় দিল রানা, সোহানা ও সালমা আলী।

সার্জিকাল গ্লাভস পরে নিলেন ডক্টর রশিদ, খুব সাবধানে খুললেন বইটির প্রথম পাতা। দেখা গেল চমৎকার এক ছবি। সারি দিয়ে হাঁটছে মায়ারা, পিঠে বাস্কেট। তাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে পালকে সুসজ্জিত সৈনিকরা। পরনে বর্ম, হাতে ঢাল ও কাঠের গদা। অস্ত্রের শেষ অংশে অবসিডিয়ান। জঙ্গল ভেদ করে চলেছে সবাই। এক জায়গায় উঁচু হয়ে গেছে জমি। বোধহয় পর্বত, এরপর মানুষগুলো পৌঁছে গেছে নদীধৌত এক উপত্যকায়। পৃষ্ঠার উপরের তিনভাগ অংশে একের পর এক গ্লিফের কলাম।

'অবিশ্বাস্য,' বললেন প্রফেসর রশিদ। 'এটা ছোট করে আনা একটা মানচিত্র। দিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কলামে লিখেছে, যাত্রা শুরু কোপ্যান থেকে মোটাগুয়া নদীর উপত্যকায়। জায়গাটা গুয়াতেমালায়। গ্লিফগুলো দেখুন। ইয়্যাক্স চিচ, মায়ান ভাষায় ওটা জেড পাথর।'

'বাস্কেট সহ লোকগুলো কি জেড সংগ্রহে বেরিয়েছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ। বিনিময়ে অন্য জিনিস দেবে,' বললেন রশিদ। 'ব্যবসায়ী দল এরা। জঙ্গল থেকে আহরণ করা দরকারী জিনিস

নিয়ে রওনা হয়েছে। পাখির পালক, জাগুয়ারের চামড়া, কোকা ইত্যাদির বদলে নেবে জেড পাথর।'

'আমেরিকার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস জ্যাডাইট,' বলল সালমা আলী। 'এই রত্ন পাওয়া যায় শুধু বার্মা, রাশা ও মোটাগুয়া উপত্যকায়। মানচিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় আছে খনি।'

'স্প্যানিশরা হাজির হওয়ার পর ওদিকে যাওয়া বন্ধ করে দেয় মায়ারা, কখনও মুখ খোলেনি কোথায় রয়েছে জেডের খনি। স্প্যানিশরা শুধু চাইত সোনা ও রূপা, কাজেই জেডের খনির কথা ভুলেই গেল সবাই। বহুকালের জন্যে হারিয়ে গেল ওই রহস্য। তারপর উনিশ শ' বায়ান্ন সালে মোটাগুয়া উপত্যকার ওপর দিয়ে বয়ে গেল হারিকেন। পাহাড় থেকে নেমে এল গাড়ির সমান বিশাল আকারের সব জেড খণ্ড।'

'তার মানে, মায়ান বইয়ে যা দেখছি, তা উনিশ শ' বায়ান্ন সালের আগে ঘোর রহস্য ছিল?' ধনুক ভুরু উঁচু করল সোহানা।

'তাই আসলে,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্য গোপন করেছিল মায়ারা স্প্যানিশদের কাছ থেকে।'

'বইয়ের মাত্র প্রথম পাতা এটা,' চট্ করে রানা ও সালমাকে দেখল সোহানা।

একে একে পাতা ওল্টাতে শুরু করেছেন আক্তার রশিদ।

হতবাক হয়ে ছবিগুলো দেখছে রানা, সোহানা ও সালমা।

দেবতা ও মস্ত সব বীর মিলে সৃষ্টি করেছেন এই জগৎ।

এক জায়গায় লেখা হয়েছে, কীভাবে লড়াই শুরু হয় টিকাল ও কালাকমুল রাজ্যের ভিতর। টিকালকে সাহায্য করে কোপ্যান।

কখনও মাত্র একটি গ্লিফ থেকে বর্ণনা দিলেন রশিদ কী ঘটেছিল সে সময়ে।

ত্রিশটি পাতা পেরিয়ে যাওয়ার পর একটা আংশিক ছবি দেখে

থামলেন প্রফেসর।

বইটি অ্যাকর্ডিয়নের মত ভাঁজ করা, একসঙ্গে খোলা যায় দুটো করে পাতা। ওগুলো পেতে দেয়ার পর অন্য দুই পৃষ্ঠা খুললেন তিনি। চারটি পৃষ্ঠা মেলে দেয়ার পর দেখা গেল পূর্ণ চিত্র। ওখানে মস্ত জঙ্গল, লেক ও পর্বত। নানাদিকে খুদে খুদে মায়া দালান।

'আধুনিক মানচিত্রের মত মনে হচ্ছে,' বলল রানা। পানি থেকে *ঠেলে* বেরিয়ে যাওয়া একটা অংশ দেখাল। 'ইউকাটান পেনিনসুলা বোধহয়।'

চিত্রে অন্য সব দালানের চেয়ে বড় কিছু দালান। 'এগুলো কী হতে পারে?' জানতে চাইল সোহানা।

'গ্লিফ বলছে চিচেন ইৎযা,' বললেন ডক্টর রশিদ। 'এটা টুলুম উপকূল। আগের নাম ছিল যামা। নীচের দিকে আলটুন হা। এদিকটা বেলিয। গুয়াতেমালার এদিকে টিকাল। ওদিকে মেক্সিকোর প্যালেনকুয়ে।'

'এসব এলাকা সম্বন্ধে কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'কোনও কোনওটার বিষয়ে পড়েছি বা গেছি ওখানে। বোনামপ্যাক, এক্স্লাপ্যাক, কোপ্যান। কিন্তু এখানে আরও অনেক নাম লেখা। এমন অনেক শহর আছে যেগুলোর নামও শুনিনি। ধারণা করা হয়, মানচিত্রে উঠেছে ষাট ভাগ মায়া শহর। সে-ও কয়েক শ'। ...কিন্তু এটা কী? বড় বড় দালানসহ অন্তত তিন শ' শহর দেখছি এখানে! অসংখ্য নাম দেখছি, যেগুলোর কথা কখনও শুনিওনি। এ ছাড়া ছোট শহর রয়েছে অসংখ্য। বর্তমান সাইটগুলোর ইনভেন্টরির সঙ্গে এই চিত্র মেলাতে হবে।'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখলেন আক্তার রশিদ। 'হায়, আল্লা! পাঁচ ঘণ্টা পার করে দিয়েছি! এবার অফিসে ফিরতে হবে, ওখান থেকে দরকারী জিনিস নিয়ে ফিরব বাড়ি। আপনাদের আপত্তি না থাকলে

আগামীকাল আবারও শুরু করব। বুঝতে পারছি, হাজার হাজার মায়া দালান হারিয়ে গেছে জঙ্গলের গ্রাসে। একটা তালিকা করতে হবে।'

'আগামীকাল কখন আসতে চান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুপুরের পর? সকালে সেমিনার ক্লাস আছে।'

'তা হলে তারপর দেখা হবে,' বলল সোহানা।

উঠে পড়ল সবাই।

প্রফেসরকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানা, সোহানা ও সালমা। ওদের সঙ্গে থাকল প্রকাণ্ডদেহী জার্মান কুকুর কাল্লু। তবে ডক্টর রশিদের গাড়ির পিছনে কয়েক পা ধেয়ে গিয়ে আবারও ফিরল সোহানার পাশে।

আট

পরদিন সকাল দশটা।

নীচের অফিসে নেমেছে রানা ও সোহানা, একটা কমপিউটার দখল করে পড়াশোনা করছে মায়া সভ্যতার ওপর।

একটু পর চোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগল সোহানা।

মনিটরের উপর থেকে মনোযোগ হারিয়েছে রানা। আজ সকালে স্নান সেরে পান্না-সবুজ লিনেন-সিল্ক পোশাক পরেছে সোহানা, পায়ে দুধসাদা স্যাণ্ডেল, মিশে আছে জ্যোৎস্না ত্বকে। মাথার উপর চূড়া করে বেঁধেছে খোঁপা। মুখে কোনও মেকআপ নেই, কিন্তু ওকে লাগছে সত্যিকারের অপ্সরীর মত।

পায়ের পাশে মেঝেতে কাল্লু, হঠাৎ করেই নিচু গর্জন ছাড়ল।

গলা থেকে বেরোল ঘড়ঘড় আওয়াজ, পরক্ষণে উঠে চলে গেল সদর দরজার কাছে। চট্ করে একবার ঘুরে চাইল। আশা করছে রানা ও সোহানা ওর পাশে গিয়ে লড়বে।

চোখ মেলেছে সোহানা, চেয়ার ছাড়ল। দরজার বরফির মত কাঁচের ওপাশে চোখ যেতেই বলল, 'অতিথি এসেছে।'

'তাই?' অবাক হলো রানা। কাজ শুরু করেনি এ অফিস। 'এত তাড়াতাড়ি এলেন ডক্টর রশিদ?'

'কালো একটা লিমাযিনে করে এসেছে, আর কেউ।'

উঠে দাঁড়াল রানা, ওই একই সময়ে বেজে উঠল ডোর বেল।

দরজা খুলল সোহানা, মিষ্টি করে বলল, 'হ্যালো?'

ওর সামনে সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী, পিছনে কালো সুট পরনে তিনজন লোক। মেয়েটির দুই চোখ গভীর সাগরের মতই নীল। কাঁচা সোনা রং চুল। ঠিক সোহানার মত করেই চূড়া করে বেঁধেছে খোঁপা। পরনে অত্যন্ত দামি নীল সুট। এক পা সামনে বেড়ে বলল, 'আমি এলেনা হিউবার্ট। আর আপনি নিশ্চয়ই সোহানা চৌধুরী?' উচ্চারণ ব্রিটিশ, উচ্চ বংশের।

'ঠিকই ধরেছেন,' বলল সোহানা। 'আপনার জন্যে কী করতে পারি, মিস হিউবার্ট?'

'আমাকে এলেনা বলে ডাকতে পারেন,' বলল তরুণী। 'আর এঁরা আমার অ্যাটোর্নি। জাস্টিন বোয়েন, রিকার্ডো কস্টা ও রন বিংহ্যাম। আসতে পারি ভেতরে?'

পথ ছেড়ে দিল সোহানা, উকিলদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল, কিন্তু এলেনা হিউবার্ট আগেই ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। বুঝল সোহানা, মেয়েটা অত্যন্ত অভদ্র ও দাম্ভিক।

'আপনিই কি মিস্টার রানা?' ঘরের মাঝে থামল এলেনা, হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

দু'পা এগিয়ে হ্যাণ্ডশেক করল রানা, হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল,

'হ্যাঁ, আমিই। জানতে পারি কীজন্যে এসেছেন?'

'খুবই খুশি হলাম আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায়,' মৃদু হাসল এলেনা, 'আশা করি এভাবে হুট করে এলাম বলে বিরক্ত হবেন না। আসলে উপায় ছিল না, কাজটি অত্যন্ত জরুরি। আমি থাকি গুয়াতেমালা সিটিতে, গতকাল ছিলাম লস অ্যাঞ্জেলেসে, তখনই শুনলাম খবরটা। অনেক রাত, তাই আর যোগাযোগ করিনি। বুঝতেই পারছেন, ব্যবসার জন্যে বেশি রাত উপযুক্ত সময় নয়।'

'এই শাখা এখনও কাজ শুরু করেনি,' বলল রানা।

'তা জানি, এসেছি অন্য কাজে। আমি শখের আর্কিয়োলজিস্ট, সংগ্রহ করি মধ্য আমেরিকার আর্টিফ্যাক্ট। আবার ভাববেন না আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন, আইনের বাইরে এক পা-ও ফেলি না।'

'আসলে কী খবর শুনেছেন আপনি?' জানতে চাইল সোহানা।

'আপনারা নাকি মেক্সিকোর ভলকান টাকানা থেকে অতি মূল্যবান একটা পট এনেছেন?' এক মুহূর্ত পর যোগ করল এলেনা হিউবার্ট, 'ওটা এসেছে কোপ্যান থেকে। ভেতরে রয়েছে মায়াদের কোডেক্স।'

'তাই শুনেছেন?' বিস্ময় গোপন করল রানা। 'কোথা থেকে শুনলেন?'

মিষ্টি সুরে হাসল যুবতী। 'যাদের কাছ থেকে শুনেছি, তাদের কথা যদি বলি, ওরা আর কোনও তথ্য দেবে না। রীতিমত ঘৃণা করবে আমাকে— তাই নয় কি?'

'আর তাদের সোর্সও তাদেরকে ঘৃণা করবে?' হাসল রানা।

'তাই আসলে,' কাঁধ ঝাঁকাল এলেনা, 'বুঝতেই তো পারছেন, ভাঙা চলে না এই নিয়ম।'

সোহানা টের পেল, ঘরে তৈরি হয়েছে বাজে, অস্বস্তিকর পরিবেশ। আর মেয়েটার কণ্ঠে কী যেন, দাঁড়িয়ে গেছে কাল্লুর ঘাড়ের রোম। আস্তে করে ওর মাথা চাপড়ে দিল সোহানা। বলল,

'আসুন, বসে কথা বলা যাক।' হাতের ইশারা করল। একটু দূরে ক্লায়েন্টদের জন্য রাখা চামড়ার আরামদায়ক কাউচ।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল এলেনা হিউবার্ট, তারপর পিছু নিল সোহানার। সবাই সোফায় বসবার পর তাদের মুখোমুখি কাউচে বসল রানা ও সোহানা। জানালা দিয়ে গেটের ওপাশে দেখা যাচ্ছে সুনীল প্রশান্ত মহাসাগর।

'কোনও ড্রিঙ্ক?' জানতে চাইল সোহানা।

'সবার জন্যে চা দিলে খুশি হব,' বলল এলেনা।

তিন উকিলকে তেমন খুশি মনে হলো না। নিজের সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

রানা বুঝল, এলেনা হিউবার্ট চাইছে ঘর থেকে চলে যাক সোহানা, তারপর নিজের প্রস্তাব দেবে সে।

তবে মাত্র একমিনিটের জন্য ঘর ছাড়ল সোহানা, তারপর ফিরে এসে বলল, 'চায়ের ব্যবস্থা করছেন সালমা, এসে যাবে এখুনি।' ওর পিছু নিয়ে আবারও ঘরে ঢুকেছে কাল্লু। সোহানা বসবার পর ওর পাশেই মেঝেতে বসল, মনে হলো সত্যিকারের স্ফিঙ্ক্স্। খাড়া দুই কান। হলদে-কালো চোখ নিষ্পলক।

সোহানা পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, কিন্তু সহজ হলো না কুকুরটা। টানটান হয়ে গেছে পেশি, বিপদের আভাস পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুদের উপর।

রানার চোখে চোখ রাখল সোহানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বলল, 'ওর নাম কাল্লু। ভয় পাবেন না। কামড়ে দেবে না। খুবই বাধ্য কুকুর।' কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল, 'মিস হিউবার্ট, আপনার জন্যে কী করতে পারি আমরা?'

'আপনারা আগ্নেয়গিরি থেকে কী এনেছেন তাই দেখতে এসেছি,' হাসল এলেনা। 'মানে কোডেক্স।'

'আমরা কিন্তু একবারও বলিনি কোনও কোডেক্স পেয়েছি,' বলল সোহানা।

পলকের জন্য এক উকিলের দিকে চাইল এলেনা হিউবার্ট।

রানা ও সোহানার মনে হলো, মেয়েটার চোখে দেখা দিয়েই হারিয়ে গেল বিরক্তি।

'কোনও ভণিতা করব না,' বলল সে, 'বিশ্বাসযোগ্য কয়েকটি সোর্স থেকে জেনেছি, আপনাদের কাছেই আছে ওটা— সত্যিকারের কোডেক্স।' সোহানার চোখে চাইল যুবতী।

চেয়ে আছে সোহানাও, কোনও কথা বলল না।

শক্র মেয়েটাকে নিষ্পলক দেখছে কাল্লু।

'আপনারা প্রায় কাউকে বলেননি,' বলল এলেনা, 'তবে দেশ ও বিদেশের অ্যাকাডেমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন প্রফেসর রশিদ। তাঁদের ভেতর আছেন অনেকে— আর্কিয়োলজিস্ট, লিঙ্গুইস্ট, হিস্টরিয়ান, জিয়োলজিস্ট, বায়োলজিস্ট ইত্যাদি। তিনি পরিষ্কার করে জানিয়েছেন কী দেখেছেন। বলেছেন, কী আশা করছেন কোডেক্সে। কাজেই, আপনারা যতটা জানেন, প্রায় ততটাই জানি আমি। ডক্টর রশিদ কিন্তু প্রায় পাবলিকলি বলেছেন, নকল নয় ওই কোডেক্স। কোনও জালিয়াতি করা হয়নি। ওটা দুনিয়ার পঞ্চম কোডেক্স।'

'যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছেন ডক্টর রশিদ, তাঁরা কেন আপনাকে এসব বলতে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'আমি বলছি না শুধু আমাকেই এসব জানানো হয়েছে। তবে অন্যদের আগে হাজির হয়েছি আপনাদের এখানে।' কাঁধ ঝাঁকাল সুন্দরী। 'আমার পরিবারের টাকার অভাব নেই, আর নানা ইউনিভার্সিটিতে গ্রাণ্ট আর ডোনেশন দিই আমরা। কখনও কখনও খবর ছড়িয়ে দিই, নির্দিষ্ট জিনিসটা আমার চাই। আর তা পাওয়া গেলে উপযুক্ত টাকার বিনিময়ে কিনে নিই। জিনিসটা কার, বা

কোন্ মিউযিয়ামে আছে, তা বড় কথা নয়। মূল কথা, ওটা পৌঁছে যায় আমার কাছে।'

'ডক্টর রশিদ কি জানেন, তাঁর কলিগরা এসব তথ্য শেয়ার করেছেন আপনার সঙ্গে?' জানতে চাইল সোহানা।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল এলেনা। 'তা আমার জানা নেই। হতেই পারে, রিসার্চের কাজে অন্যদের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করতে হয়েছে তাঁকে।' যুবতীর হাসিটা প্রায় টিটকারিসূচক মনে হলো সোহানার। বিশেষ করে ওর দিকে চাওয়ার সময় শীতল হয়ে উঠছে চোখ।

রানাও বুঝে গেছে, এই মেয়ে ধরেই নিয়েছিল নিজের রূপের ঝলক এবং প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে জয় করে নেবে ওকে। তার সৌন্দর্যের কাছে একেবারে ম্লান হয়ে যাবে রানার প্রেমিকা। কিন্তু এখানে এসে দেখছে, তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী এই বাঙালি মেয়েটা। ওকে দেখে রানার চোখে একটি বারের জন্য সামান্য মুগ্ধ ভাবও ফোটেনি। বিরক্তি লাগছে অন্য কারণেও, রানা ও সোহানা একজোট হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে। এলেনা একবারও ভাবেনি এমনটি হবে।

বড়লোকের দাম্ভিক মেয়ের ভঙ্গিটা এবার ত্যাগ করল সে, নরম স্বরে বলল, 'আমিই একমাত্র ননঅ্যাকাডেমিক নই যে এসব জানে। আর সে কারণেই ছুটে এসেছি এত দূর থেকে। আমাকে কি একবার দেখানো যায় ওই কোডেক্স? আগেই তো বলেছি, এখন আর কিছুই গোপন নেই। সবাই জেনে গেছে আপনাদের কাছে মায়ান কোডেক্স আছে। আপনারা যদি জিনিসটা আমার কাছে বিক্রি করেন, খুবই কৃতজ্ঞ হব। বদলে কথা দেব, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখব ওই দুর্লভ সম্পদ। সেজন্যে কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতেও আপত্তি নেই আমার।'

মিস হিউবার্টের কাতর অনুরোধ শুনে সোহানার দিকে চাইল

রানা। সোহানা মৃদু মাথা দোলাতে ও বলল, 'বেশ, আপনাকে দেখাতে আপত্তি নেই। তবে স্পর্শ করবেন না। আমাদের দেখা হয়েছে মাত্র প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা। আঠার মত আটকে আছে ভেতরের পাতা, কাজেই এখনও খোলা হয়নি। আনাড়ি হাতে খুলতে গেলে ক্ষতি হবে বইয়ের।'

'ঠিক আছে, ছুঁয়েও দেখব না,' কথা দিল এলেনা। 'কোথায় ওটা?' প্রকাণ্ড ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল সে।

লোভী ওই দৃষ্টি দেখে অস্বস্তিবোধ করল রানা।

'বেশ, আসুন,' উঠে দাঁড়াল সোহানা। পাশেই কাল্লু। রিসার্চ রুমের দরজার কাছে গেল ওরা, তালা খুলল সোহানা। 'কে কে যাবেন স্থির করে নিন। একবারে দু'জন করে।'

'চিন্তা করবেন না,' বলল এলেনা, 'এঁরা কোডেক্স দেখতে আসেননি। কাজেই না দেখলেও চলবে।'

মেয়েটা ঘরে ঢোকার পর ভিতরে পা রাখল রানা। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল সোহানা, আলমারি খুলে গ্লাভস পরে সাবধানে বের করল হাঁড়ি।

বিস্ফারিত হলো মিস হিউবার্টের দুই চোখ। 'এ অবিশ্বাস্য! পরিষ্কার দেখছি কোপ্যানের ক্লাসিক স্টাইল!' বখে যাওয়া বাচ্চার মত লোভ নিয়ে আলমারির দিকে চাইল সে। 'আর কোডেক্স?'

আরেকবার পরস্পরের দিকে চাইল রানা ও সোহানা।

কেবিনেটের কাছে গেল রানা, খুলল কাঁচের একটা দেরাজ। বের করে আনল কোডেক্স। টেবিলে নিয়ে রাখল ওটা।

সর্বক্ষণ জিনিসটার উপর স্থির থাকল এলেনার চোখ, যেন মোহিত, মন্ত্রমুগ্ধ। কীসের এক আকর্ষণ কোডেক্সের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে তার দুই চোখ। বইটার উপর ঝুঁকে গেল সে।

'দয়া করে স্পর্শ করবেন না,' সতর্ক করল সোহানা।

পাত্তা দিল না এলেনা। 'খুলুন।'

সার্জিকাল গ্লাভ্‌স পরে নিল রানা, চাইল মেয়েটার চোখে।

'খুলুন,' আবারও চাপা স্বরে বলল এলেনা।

আস্তে করে প্রচ্ছদ সরিয়ে দিল রানা, দেখা গেল প্রথম পাতা।

মোটাগুয়া উপত্যকায় জেড সংগ্রহ করতে চলেছে মায়ারা।

'ওটা কী?' শ্বাস আটকে ফেলল এলেনা। 'সত্যিই কি জেড?'

'জঙ্গলের ভেতরের কোনও শহর থেকে জেড কিনতে মোটাগুয়া উপত্যকায় চলেছে ওরা,' বলল সোহানা।

'আরও কয়েক পাতা দেখা যায়?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল এলেনা।

পরের পাতায় গেল রানা।

আগের চেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মেয়েটা। 'আমার মনে হয় এটা পপোল ভাহ্। উপকথার জন্ম যেখানে। ওই যে সেই পালকওয়ালা তিন সরীসৃপ। আর এই তো তিন আকাশ দেবতা।'

ওই অধ্যায় শেষে থামল রানা, আস্তে করে বুজে দিল বইয়ের প্রচ্ছদ। কোডেক্স নিয়ে গিয়ে রাখল কাঁচের দেরাজে।

নিজেকে ফিরে পেতে কিছুক্ষণ সময় লাগল এলেনার। মনে হলো কোডেক্সের জগৎ থেকে ফিরে পা রাখল বাস্তব দুনিয়ায়।

সিটিং রুমের কাউচে গিয়ে বসল ওরা। একই সময়ে চা ও পেস্ট্রি নিয়ে ঘরে ঢুকল সালমা আলীর সহকারী জালাল। ওগুলো কফি টেবিলে নামিয়ে দিয়ে গেল। সোহানার পাশেই পাহারায় থাকল কাল্লু। সতর্ক চোখে দেখছে তিন উকিল এবং মেয়েটিকে।

'যেন ফিরলাম ভিন্ন গ্রহ থেকে,' বলল এলেনা, 'যা শুনেছি, তার চেয়েও অনেক বেশি দেখলাম। কোডেক্সের অন্য পাতা ফাঁকা থাকলেও ওটার দাম কমবে না।' কাপ তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল সে। 'একটা প্রস্তাব দিতে চাই আপনাদেরকে। কেমন হয় পাঁচ মিলিয়ন ডলার পেলে? কম হলে বলুন, আরও বেশি দিতেও আপত্তি নেই। কত হলে দেবেন ওই কোডেক্স?'

'আমরা ওটা বিক্রি করব তা কে বলল আপনাকে?'

ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল এলেনা হিউবার্টের নীল দুই চোখ। বাঘের চোখে দেখল সোহানাকে।

রানা বুঝল, নিজের দ্বিতীয় অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে ওই মেয়ে। রূপ দিয়ে কাজ হয়নি, এবার টাকা দিয়ে ভোলাতে চাইছে। কিন্তু কোনও কাজেই আসছে না কোনও কৌশল। বড়লোকের মেয়ে, অঢেল টাকা, যখন যা চেয়েছে তক্ষুনি পেয়েছে— এখন মানতে পারছে না, একটা জিনিস চাইছে, কিন্তু দিচ্ছে না এরা।

'জানতে পারি, কেন বিক্রি করবেন না?' রাগ চেপে বলল এলেনা।

'কারণ ওটা আমাদের নয়,' বলল সোহানা। 'ওটার মালিক মেক্সিকোর জনগণ।'

'আপনারা কি ঠাট্টা করছেন? নিজেরাই তো স্মাগলিং করে নিয়ে এসেছেন এখানে। মেক্সিকোর সরকারের কাছে ফিরিয়ে দিতে গেলে আটক হতে পারেন, জেলও হতে পারে। আপনারা এত বড় ঝুঁকি নেবেন কেন?'

'দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে ওই কোডেক্সের হাঁড়ি পেয়েছি,' বলল রানা, 'তখন সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়ার উপায় ছিল না। ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি ক্ষতি করার আগেই ওটা রক্ষা করেছি। সরিয়ে এনেছি বিপজ্জনক সাইট থেকে। স্থানীয়দের বলেছি, যাতে ওই সাইট পাহারা দেয়। তারপর চোরের দল কেড়ে নিতে চেয়েছে ওই পট। বাধ্য হয়ে নিয়ে এসেছি এখানে। একবার এক্সপার্টরা কোডেক্স পরীক্ষা করার পর ওটা আবারও ফিরিয়ে দেব মেক্সিকান সরকারের কাছে।'

সামনে ঝুঁকে এল এলেনা হিউবার্ট। সুন্দর মুখ থেকে থুতুর মত ছিটকে বেরোল কথাটা: 'সাত মিলিয়ন?'

'আমার কথা শুনুন,' বলল ব্রিটিশ উকিল জাস্টিন বোয়েন।

'ধরতে গেলে কেউ জানে না আপনাদের কাছে কোডেক্স আছে। আপনারা শুধু একটা সেল এগ্রিমেণ্টে সই করে দেবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে পৌঁছে যাবে সাত মিলিয়ন ডলার। ভেবে দেখুন। সাত মিলিয়ন ডলার কিন্তু অনেক টাকা।'

'আমরা কিছুই বিক্রি করছি না,' বিরক্ত হয়ে বলল সোহানা।

'একটা কথা মাথায় রাখুন,' বলল এলেনা। 'আমি একবার ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে ধরে নিতে হবে, একমত হতে পারিনি আমরা। আপনারা যেহেতু মেক্সিকো থেকে ওটা স্মাগলিং করে এ দেশে এনেছেন, কাজেই ধরে নিতেই পারি, আরও বেশি টাকায় জিনিসটা বিক্রি করতে চান।'

মেক্সিকান উকিল রিকার্ডো কস্টা মুখ খুলল, 'তাই যদি হয়ে থাকে, সঠিক পথেই আছেন আপনারা। আগে হোক আর পরে, মেক্সিকান সরকার আপনাদের কাছ থেকে জিনিসটা আদায় করে নেবে। তখন এক পয়সাও পাবেন না। কিন্তু ওই কোডেক্স যদি মিস হিউবার্টের কাছে থাকে, তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অত সহজ হবে না। তিনি জানাতে পারেন, ওটা পেয়েছেন গুয়াতেমালায় তাঁর প্ল্যাণ্টেশনে। টিকানা তো গুয়াতেমালার সীমান্তেই। তাঁর খামারের কাছেই। আর গুয়াতেমালায় তাঁর কাছে কোডেক্স থাকলে আইনত কোনও ঝামেলায় পড়বেন না তিনি।'

উকিল রন বিংহ্যাম বলল, 'আপনারা যদি ভেবে থাকেন সবার চোখের আড়ালে হারিয়ে যাবে কোডেক্স, তা হবে না। বিজ্ঞানীদেরকে দেখতে দেবেন মিস হিউবার্ট। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জাদুঘরে ওটা রাখবেন। যে-কেউ চাইলে দেখতে পাবে। মিস হিউবার্ট শুধু চাইছেন ওটার আইনী মালিকানা। আপনাদের চেয়ে অনেক দক্ষতার সঙ্গে জিনিসটা রক্ষা করতে পারবেন তিনি। কোনও দেশের সরকার তাঁকে বিরক্ত করবে না, আইনগত কোনও ঝামেলাও হবে না তাঁর।'

'আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'আবারও বলছি, ওটা আমাদের জিনিস নয়, আমরা ওটা বিক্রি করতে পারি না। মেক্সিকান সরকারের হাতে পৌঁছে দেব। ওই কোডেক্স ব্যবহার করে গোর লুটেরা, হাঁড়ি শিকারি বা চোররা খুঁজে বের করবে গুরুত্বপূর্ণ সাইট; সেক্ষেত্রে আর্কিয়োলজিস্টরা ওখানে পৌঁছবার আগেই সর্বনাশ ঘটে যাবে— আমরা তা চাই না। কাজেই আপনাদের এই প্রস্তাবে আমরা রাজি নই। আপনাদের টাকা আপনাদের কাছেই থাকুক।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাতঘড়ি দেখল এলেনা হিউবার্ট। 'এবার বিদায় নিতে হয়। এত বড় অঙ্কের টাকা দিতে চেয়েছি কারণ, নইলে হয়তো দু'এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। কোনও মেক্সিকান ইন্সটিটিউট থেকে নিলামে কিনতে হবে ওটা। ঠিক আছে, যদি অপেক্ষা করতেই হয়, তা-ই করব। কোনও না কোনও সময়ে মগজে যুক্তি ঢোকে ব্যুরোক্র্যাটদের, বুঝে যায় একটা মাত্র পুরনো বইয়ের বদলে আস্ত লাইব্রেরি পাওয়া অনেক ভাল। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ আপনাদেরকে।'

ঘুরেই রওনা হয়ে গেল সে, মেঝেতে হাইহিল জুতোর খটমট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। তাড়াহুড়ো করে পিছু নিল তিন উকিল। একজন আরেকজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে কে আগে গাড়ির দরজা খুলে দেবে।

'সহজ মানুষ মনে হলো না ওই মেয়েকে,' মন্তব্য করল সোহানা।

'আমারও একই অনুভূতি,' বলল রানা।

জানালা দিয়ে লিমাযিনের দিকে চেয়ে আছে কাল্লু। গলা দিয়ে বেরোল ঘড়ঘড় আওয়াজ।

আবারও কোডেক্সের ঘরে ফিরল রানা ও সোহানা, সার্জিকাল গ্লাভস পরে বের করল প্রাচীন হাঁড়ি ও কোডেক্স, বেরিয়ে এল।

বুকশেলফের দরজা খুলে নেমে গেল ফায়ারিং রেঞ্জে। অস্ত্র রাখবার সিন্দুক খুলে ভিতরে রেখে দিল ওগুলো। সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে আটকে দিল কমবিনেশন লক।

আবারও উঠে এল উপরে, সালমা আলীকে বলল সোহানা, 'আপনাদের সব সিকিউরিটি সিস্টেম চালু আছে তো?'

'হ্যাঁ। প্রতিটি।'

'কারণ আজ রাতে হয়তো ডাকাত পড়বে।'

মাত্র সোয়া এগারোটা বাজে।

রানা-সোহানা ঠিক করল, ওরা দেখা করবে স্যান ডিয়েগোর ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়ায় ডক্টর আক্তার রশিদের সঙ্গে।

পনেরো মিনিট পর ওদের গাড়ি থামল ওই শিক্ষালয়ের পার্কিং লটে। একটু দূরেই অ্যানথ্রপোলজি ডিপার্টমেন্ট। হেঁটে ওখানে পৌঁছে গেল ওরা।

ডক্টর রশিদের অফিসের কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় দেখল তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল এক ছাত্র। ভয়ানকভাবে ভুরু কুঁচকে দেখছে হাতের কাগজটা। পিছন থেকে প্রফেসর বললেন, 'জমা দেয়ার আগে ঠিক করে আনবে বিবলিওগ্রাফি আর নোটগুলো!' দু' সেকেণ্ড পর রানা ও সোহানাকে দেখলেন তিনি, 'আরে, আসুন-আসুন!' ওরা ঘরে ঢুকবার পর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। চেয়ারগুলো থেকে সরিয়ে ফেললেন এক গাদা বই। ওরা বসবার পর নিজ চেয়ারে বসে বললেন, 'আমি তো ভেবেছি দুপুরের পর আপনাদের ওখানে যাব।'

'কিছুক্ষণ আগে আমাদের ওখানে এলেনা হিউবার্ট নামে এক মেয়ে এসেছিল,' বলল রানা।

'এলেনা হিউবার্ট? এহ্-হে!'

'চেনেন তাকে?' জানতে চাইল সোহানা।

'কীর্তির কারণে পরিচিত।'

'আপনার কোনও কলিগ তাকে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে সাত মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছে কোডেক্সের জন্যে। ওটাতে কী আছে ভাল করেই জানে ওই মেয়ে।'

'সর্বনাশ,' বিড়বিড় করলেন প্রফেসর। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'যাদের বিশ্বস্ত বলে মনে হয়েছে, শুধু তাদেরকে বলেছি। ভাবতে পারিনি তাদের কেউ মুখ খুলবে। ওই মেয়ে আপনাদেরকে লোভের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে, তাই না?'

'এলেনা সম্বন্ধে কতটা কী জানেন?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'যা জানি, তা যথেষ্ট। বড়লোকের পচে যাওয়া মেয়ে। ওর মত অনেকেই ইউরোপ বা নর্থ আমেরিকার এস্টেটের প্রকাণ্ড বাড়ি ভরে ফেলছে চোরাই আর্টিফ্যাক্ট দিয়ে। এটা চলছে এক শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে। গরীব দেশগুলোতে গিয়ে টাকার জোরে কিনে নেয় যা খুশি। উনিশ শতকে তাই করত, বিশ শতকেও তাই করেছে। আজ একুশ শতকেও তাই। গোর লুটেরাদের কাছ থেকে জোগাড় করে আর্টিফ্যাক্ট। এদের কারণে রীতিমত বড় একটা মার্কেট তৈরি হয়েছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। জিনিসটা কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে জোগাড় করা হয়েছে— এসব এরা জানতেও চায় না, দখল করতে পারলেই সন্তুষ্ট। সেরা জিনিস হলেই হলো। ব্যস্ত হয়ে টাকা খরচ করে। মূল্যবান জিনিস যদি হয়, প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে না, ঘুরে দেখতে হবে না মিউযিয়াম— ইউরোপ ও আমেরিকার এক-দেড় শ' বছর ধরে যারা বড়লোক, তাদের বাড়িতে গেলেই সব দেখতে পাব।'

'হিউবার্টরা তাই করেছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'এরা খারাপ দলের সেরা,' তিক্ত চেহারা বানালেন প্রফেসর। 'ব্রিটিশরা গোটা ইণ্ডিয়া দখল করার পর পর এরা হয়ে ওঠে মস্ত

বড়লোক। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এদের ব্যাপারে টুঁ শব্দও করা যেত না। উনিশ শ' সত্তর সালে ইউনাইটেড নেশন্স-এর আর্টিফ্যাক্ট ট্রিটি চালু হওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত কেউ কিছুই করতে পারছে না। ওই চুক্তি চালু হওয়ার আগে কোনও দেশের আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে নেয়া হয়ে থাকলে, যে-কেউ নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে ওসব। ইচ্ছে করলে কিনবে বা বিক্রি করবে— কারও কিছু বলার নেই। ধরুন, মস্ত বড়লোক কেউ ঐতিহাসিক মূর্তি বা আর্টিফ্যাক্ট বাগানে রাখল পাখি ওটার মাথায় পায়খানা করবে বলে— ঠেকাবে কে তাকে? আইনের ফাঁক রেখে দেয়া হয়েছে এদের জন্যে। প্রতিটি দেশের সরকারের মাথায় হাত বুলিয়ে যা খুশি করে হিউবার্টদের মত বড়লোকরা। টাকার অভাব নেই তাদের।'

'এলেনা হিউবার্ট মনে হলো ধরেই নিয়েছে, আমরা স্মাগলিং করে কোডেক্স সরিয়ে এনেছি,' বলল সোহানা। 'চোরাই জিনিস কিনতে আপত্তি ছিল না তার।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'দুঃখজনক। গ্রিক দ্বীপগুলোয় বা ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় ওই মেয়ের দুর্ব্যবহারের কথা ক'দিন পর পর লেখা হয় ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডে। আর গুয়াতেমালায় যা করছে, সে-সব তো ভয়ঙ্কর অন্যায়। ইচ্ছেমত ভাঙছে আইন।'

'তা করতে দেয়া হচ্ছে কেন?'

'উনিশ শ' ষাট থেকে শুরু করে উনিশ শ' ছিয়ানব্বুই পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলেছে ওই দেশে। ওই যুদ্ধে খুন হয়েছে দুই লাখ মানুষ। অনেক পুরনো স্প্যানিশ পরিবার তাদের বিপুল জমি ও নানান ব্যবসা বিক্রি করে ফিরে গেছে ইউরোপে। যারা কিনেছে, তাদের বেশিরভাগই বিদেশী। তাদের একজন এলেনা হিউবার্টের বাবা। আগের মালিকের কাছ থেকে লাখ লাখ হেক্টর জমি নিয়েছে। ওই এস্টেটের নাম এসতেনসিয়া মিগুয়েরো। ওটার পুরনো মালিক

এখন কোটি কোটি টাকা নিয়ে থিতু হয়েছে ফ্রান্সে, মোনাকোর জুয়ার আড্ডায় ওড়াচ্ছে সব। এদিকে এলেনার একুশ বছর হতেই জন্মদিনে তাকে অনেক সম্পত্তি লিখে দিয়েছে তার বাবা। সেগুলোর ভেতর রয়েছে ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার রাজধানীগুলোর বেশ কিছু বাড়ি ও ব্যবসা। এসবের ভেতর রয়েছে গুয়াতেমালার এসতেনসিয়া মিগুয়েরো।'

'জানি, মস্ত বড়লোক পরিবারে এটা নিয়মিত হয়,' মন্তব্য করল সোহানা।

'তা ঠিক। আর ইংল্যাণ্ডের স্কুল পাশ করা এক একুশ বছর বয়সী মেয়ে হঠাৎ করেই হয়ে উঠেছে গুয়াতেমালার অন্যতম ক্ষমতাশালী নাগরিক। কেউ কেউ ধারণা করেছিল, ওই দেশের গরীব মানুষের জন্যে বুঝি অনেক কিছু করবে সে। অন্যরা চুপ থেকেছে। আর সত্যিই, মানুষের ভালর জন্যে কিছু না করে তার উল্টো করেছে এলেনা। গুয়াতেমালার ব্যবসা ও সম্পত্তি দেখতে গিয়ে ক্ষমতার প্রেমে পড়েছে সে, কাজেই স্থায়ী হয়েছে ওখানেই। চায় না উন্নতি হোক ওই দেশের। যেমন আছে, তেমনই থাকুক। নড়বড়ে নতুন সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে সে। যে-দেশের আশি ভাগ জমি বিদেশীদের হাতে, তাদের কাছেই সব ক্ষমতা থাকবে, এ-ই তো স্বাভাবিক। এলেনাও আগের আমলের পুরনো স্প্যানিশ জমিদারদের মতই চুষছে গরীব মানুষের রক্ত।'

'খুব দাম্ভিক মনে হয়েছে ওকে,' বলল সোহানা।

'হবে না কেন,' বললেন ডক্টর রশিদ, 'পুরনো মালিক বিদায় নিয়েছে ঠিক, কিন্তু নতুন মালিক অত্যাচার করবে না, তা কে বলেছে? এখন আর কিছুতেই বিস্মিত হয় না ও দেশের সাধারণ মানুষ। মায়াদের আর্টিফ্যাক্টের ব্যাপারে জন্মক্ষুধা আছে এলেনার। কিন্তু জীবিত মায়া জাতির মানুষের জন্যে হৃদয়ে সামান্যতম করুণা নেই। চাকরি দেয়া মানুষগুলোর প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর

আচরণ করে। যেন ওরা কুকুরের বাচ্চা।'

'আমরা তো তার কাছে কোডেক্স বিক্রি করলাম না, এবার কী করা উচিত ভাবছেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'আগে আমার কলিগদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জানতে হবে কারা সৎ আর কারা বিক্রি হয়ে গেছে। প্রত্যেককে একটা করে মিথ্যা বলব ভাবছি। দেখা যাক কার বলা কোন্ মিথ্যা শুনে পরের পদক্ষেপ নেয় এলেনা হিউবার্ট।'

'ওটা করার উপায় নেই, ডক্টর,' বলল সোহানা। 'আমরা যদি তার কাছে সোর্সের বিষয়ে জানতে চাই, জবাব দেবে না সে। ধরেই নেবে আমরা খুঁজতে শুরু করেছি কালপ্রিটকে।'

'সেক্ষেত্রে এগোতে হবে দুটো পথে,' বললেন প্রফেসর।

'ওই পথ দুটো কী?' জানতে চাইল রানা।

'পরীক্ষা করব কোডেক্স, অনুবাদ করতে হবে ওটা, জানব কী লিখেছে ওখানে।'

'তাতে আমাদের আপত্তি নেই,' বলল সোহানা।

'আর দ্বিতীয় কাজটা সতর্ক হয়ে করতে হবে। বুঝে নিতে হবে কোডেক্স আসলে কল্পনামূলক না বাস্তবমুখী। যদি শেষেরটা হয়ে থাকে, আমাদেরকে যেতে হবে সেণ্ট্রাল আমেরিকায়। নিশ্চিত হতে হবে, যা লেখা হয়েছে, তা সঠিক কি না।'

'তার মানে বলতে চাইছেন, ওসব সাইটের অন্তত একটা খুঁজে বের করতে হবে,' বলল রানা।

'এ ছাড়া উপায়ও নেই,' বললেন প্রফেসর। 'কোডেক্সে লেখা এমন এক সাইট বেছে নেব, যেটা আগে ম্যাপে তুলে দেয়া হয়নি। সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন করতে হবে। গ্রীষ্মের ক্লাস চলছে দুই সপ্তাহ ধরে। আরও কয়েক সপ্তাহ পর ছুটি পাব। চাইলেও এখন ক্লাস ছেড়ে যেতে পারব না। তা ছাড়া, সময় লাগবে বড় কোনও এক্সপিডিশন গুছিয়ে নিতে। কিন্তু এলেনা

হিউবার্টের কারণে হাতে সময় পাব না আমরা। যত দেরি করব, আমাদের কাজ ততই কঠিন করে তুলবে সে। ক্ষমতা আছে, প্রতিটি পদে বাধা দেবে। আইনী ঝামেলা করবে। পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করাবে আমাদের। এমন ব্যবস্থা নেবে, যাতে বাধ্য হয়ে তার কাছে আমরা বিক্রি করে দিই কোডেক্স।'

'দুই সদস্যের এক্সপিডিশন করি না কেন,' বলল সোহানা। 'রানা আর আমি যেতে পারি ওই দেশে।'

'ওই দেশে গেলে কিন্তু খুবই কষ্ট হবে,' সতর্ক করলেন ডক্টর।

'এ নিয়ে ভাবছি না,' বলল সোহানা। 'সেক্ষেত্রে দুটো কাজ করতে হবে। রানা বা আমি মায়াদের ভাষার আট শ' একষট্টি গ্লিফ বুঝব না, বা সে দেশের স্থানীয়দের ভাষা বোঝাও সম্ভব নয় এত কম সময়ে। ...ওদের ভাষা কী?'

'চোলান,' বললেন প্রফেসর।

'আপনি ওই ভাষা জানেন?'

'বুঝলাম কী ভাবছ,' সোহানাকে বলল রানা। প্রফেসরের দিকে চাইল। 'ডক্টর, আপনি কোডেক্স থেকে এমন একটা সাইট খুঁজে বের করুন, যেটা ঘুরে এলেই প্রমাণ হবে ওই বইয়ের তথ্য ঠিক। সঙ্গে বড় কোনও দল নেব না, ঘুরে আসব গোপনে।'

নয়

পরদিন সকাল। এইমাত্র বিদায় নিয়েছে পুলিশ অফিসাররা। রানা এজেন্সির রিসেপশন এরিয়ায় দাঁড়িয়ে আছে রানা, সোহানা ও সালমা আলী। শেষের জন পাঁচ মিনিট আগে পৌঁচেছে, সঙ্গে ওর

বিশাল কুকুর কাল্লু।

'সত্যি করেই মায়ান কোডেক্স ডাকাতি করতে হাজির হবে, ভাবতে পারিনি,' বলল সালমা। 'আপনারা কখন টের পেলেন ওরা কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে?'

'মৃদু অ্যালার্ম বাজতেই,' বলল সোহানা। 'তখন রাত চারটে।'

'দরজা খুলতে চাইতেই সরসর করে নেমে এল স্টিলের প্লেট, আটকে দিল একতলা আর দোতলার বাইরের দিকের প্রতিটি জানালা-দরজা,' বলল রানা, 'এক মিনিট পর ছাতে উঠলাম, ওখান থেকে গুলি শুরু করলাম ওদের দিকে।'

'তারপর?'

'জরুরি কাজে দেরি করল না, ঝড়ের বেগে পালিয়ে গেল লেজ তুলে।' হাসল সোহানা। 'আগেও এসেছে, তবে বোঝেনি এ বাড়ি আসলে দুর্গম দুর্গ।'

'চিনতে পেরেছেন কাউকে?'

'না। মুখে স্কি মাস্ক ছিল। তবে আমার বিশ্বাস, গতকাল সকালে ওদেরকে চা খাইয়েছেন আপনি।'

চোরের দলকে আপ্যায়ন করেছে ভাবতে গিয়ে বিরক্ত হলো সালমা। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, 'আপনারা পুলিশদের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিলেন, আমি এখানে ঢুকতেই ল্যাণ্ড ফোনে কল দিলেন ডক্টর রশিদ। গুয়াতেমালা যাওয়ার বিষয়ে আলাপ করতে চান।'

দু'ঘণ্টা পর।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রিসার্চ রুমে রানা-সোহানার সঙ্গে রয়েছেন প্রফেসর আক্তার রশিদ।

তিনজনই ব্যস্ত। ওঅর্ক টেবিলে রাখা কোডেক্সের মানচিত্র থেকে তথ্য টুকছে কমপিউটারের টপোগ্রাফিক ম্যাপে।

ডক্টর রশিদ ছোট তীর-চিহ্ন তাক করলেন জঙ্গলের বুকে।

'এই সাইট আমার প্রথম পছন্দ। কোনও ইনভেন্টরিতে নেই এই মায়ান সাইট। মস্ত কোনও শহর নয়। জায়গাটা গুয়াতেমালার উঁচু জমিতে। আশপাশে জনপদ নেই। নির্জন এলাকা।'

'শহর, না সাধারণ কোনও দালান, প্রফেসর?' জানতে চাইল সোহানা।

'গ্লিফ অনুযায়ী ওটা পবিত্র কূপ। আমার ধারণা সেনোটে। লাইমস্টোন বেডরকের গর্ত। ওখানে জমে আছে পানি।'

'সিঙ্ক হোলের মত?'

'ঠিক তাই। পানি অত্যন্ত জরুরি ছিল মায়ানদের কাছে। বিশেষ করে ক্লাসিক শেষ সময়ে। আপনারা ভাবতে পারেন জঙ্গলে পানির অভাব কই, কিন্তু আসলে ওখানে ওই জিনিস খুব কমই পাওয়া যায়। মাইলের পর মাইল জঙ্গল সাফ করে দিয়েছিল মায়ানরা কৃষি জমি বের করতে। ফলে পরিবেশ হয়ে ওঠে উষ্ণ ও শুকনো। ওদের সভ্যতার শেষ দিকে প্রকাণ্ড সব শহর নির্ভর করত সেনোটের পানির ওপর। ওটাই ছিল একমাত্র উৎস। আপনারা ওখানে জলাশয়ের মত সিসটার্ন দেখবেন। সবই মাটি খুঁড়ে তৈরি। সেনোটের অনুকরণে পানির আধারে প্লাস্টার করেছে এল মিরাডরে। কৃত্রিম ঝর্না নিয়ে গেছে জলাধার পর্যন্ত।'

'কূপ দেখেই ফিরব, তাতেই হবে?' জানতে চাইল সোহানা। একটু হতাশ।

'সেনোটে সাধারণ কূপ নয়,' বললেন প্রফেসর। 'ওটা পৃথিবীর বুকে যাওয়ার পথ। ওখানে থাকেন বৃষ্টি ও পরিবেশের দেবতা চাক। আমাদের ভুললে চলবে না, মায়ারা বিশ্বাস করত তাদের ভাল-মন্দের ওপর নির্ভর করছে গোটা জগৎ। একটু এদিক ওদিক হলেই বিগড়ে যাবে এই বিচিত্র মেশিন। যদি বৃষ্টি দরকার হয়, মূল্যবান কিছু উৎসর্গ করতে হবে সেনোটেয়, তা হলেই সেসব পৌঁছে যাবে দেবতাদের কাছে।'

'এটাই সেরা সাইট?' হতাশা কাটল না সোহানার।

'এই কোডেক্সে নতুন নতুন শহরের কথা আছে। হয় সেগুলো কল্পনাপ্রসূত অথবা হারিয়ে গেছে অরণ্যের গ্রাসে। আসলে কী হয়েছে আমরা জানি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, একদল কর্মী নিয়ে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি চলবে না। বর্তমান ম্যাপে নতুন শহর উল্লেখ করতে হলে লাগবে মাসের পর মাস সময়। হয়তো খুঁজে বের করলেন বড় কোনও সাইট, লুটেরাদেরকে আমরা ঠেকাব কীভাবে? অথচ বেশিরভাগ সেনোটে থাকবে জঙ্গলে বা অতীত কোনও জনপদের কাছে। সম্ভবত ঝোপঝাড়ের নীচে। কারও মনোযোগ আকর্ষণ না করেও নিশ্চিত হতে পারব ওটা সত্যিই আছে। নিশ্চয়ই আমার কারণগুলো বুঝতে পারছেন? নিশ্চিত হয়ে যদি বড় কোনও শহর আবিষ্কার করতে চান, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল সোহানা।

'সেজন্যে ধন্যবাদ,' বললেন প্রফেসর রশিদ। 'তবে আপনাদের জানা থাকা ভাল, ওই সেনোটের খুব কাছেই এসতেনসিয়া মিগুয়েরো।'

'এলেনা হিউবার্ট?' ভুরু কুঁচকে গেল সোহানার।

'কাকতালীয়, তবে ওই সেনোটে ওটার খুব কাছেই। আসলে গুয়াতেমালার যেখানেই যাবেন, এসব মস্ত এস্টেট দেখবেন। এদের একেকজনের মুঠোয় আছে শত শত বর্গ মাইল জমি। তার বেশিরভাগ জায়গাই অনাবাদী।'

'ভালই হলো,' বলল রানা। 'মেয়েটা যখন এখানে কোডেক্স কব্জা করতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে আমরা ওর এলাকা থেকে ঘুরে আসব। ঝামেলায় পড়তে হবে না।'

'ও কিন্তু মাঝে মাঝেই ওই খামারে গিয়ে হাজির হয়,' বললেন প্রফেসর রশিদ। 'তবে বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকে সামাজিক ও

রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কাজে। এ ছাড়া রয়েছে বিশাল ব্যবসা। সময় কই গুয়াতেমালা সিটি ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার!'

'আমরা চলে গেলেও আর্কিয়োলজিকাল যে-কোনও কাজে সালমা আলী সাহায্য করবেন আপনাকে,' বলল রানা, 'যা লাগবে বললেই হবে তাঁকে।'

টেবিলে রাখা কোডেক্সের দিকে চাইলেন ডক্টর রশিদ। বললেন, 'ডাকাতির কথা সালমা বলেছেন আমাকে।'

'ওটা ডাকাতি ছিল না,' বলল সোহানা, 'ছিল তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার কাহিনি।'

'কিন্তু ভাবছি, আপনারা যখন এ দেশে থাকবেন না, কে রক্ষা করবে এই কোডেক্স?'

'ভাল কোনও উপায়ের কথা ভেবেছেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'ভাবছি, মন্দ হয় না কোডেক্স ক্যামপাসে নিয়ে রাখলে।'

'এখানে বিপদ হবে ওটার, তা কিন্তু নয়,' বলল সোহানা। 'আবার এ-ও ঠিক, এ বাড়ি মেরামতের কাজ এখনও শেষ হয়নি। সারাদিন আসছে-যাচ্ছে নানান ধরনের মিস্তিরি।' রানার দিকে চাইল ও। 'এলেনা হিউবার্ট আর তার চোর বাহিনী ভাল করেই জানে এখানে আছে কোডেক্স।'

'ইউনিভার্সিটি নিরাপদ মনে করছেন?' জানতে চাইল রানা।

'ওখানে আছে সুপার কমপিউটার, বিখ্যাত সব চিত্রকরের শিল্প, নানান দামি ডিভাইস ইত্যাদি,' বললেন রশিদ। 'তা ছাড়া ওখানে সর্বক্ষণ পাহারা দেয় পুলিশ।'

'ক্যামপাসে আপনাদের লকারে কোডেক্স রাখা যেতে পারে,' বলল রানা। 'অথবা জয়েন্ট সেফ-ডিপোযিট বক্স ভাড়া করতে পারি ব্যাঙ্কে। সেক্ষেত্রেও ওটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন।'

'আগে কথা বলি আমাদের ডিনের সঙ্গে,' বললেন প্রফেসর রশিদ। 'কবে গুয়াতেমালা রওনা হবেন আপনারা?'

'আগামীকাল,' বলল রানা। 'ওই সাইট ভেরিফাই করব, করেই আবার ফিরব এখানে। খুব সময় লাগবে না।'

'আপনারা ফিরলে একদল আর্কিয়োলজিস্ট আর খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে কর্মী নিয়ে বড় কোনও শহর অভিযানে যাব,' বললেন ডক্টর। 'আশা করি তখনও আপনাদেরকে পাশে পাব। খুবই খুশি হব আপনারা গেলে।'

'আগে স্কাউটিং করে আসি, তারপর এসব নিয়ে ভাবা যাবে,' বলল সোহানা।

ডক্টর আক্তার রশিদ চলে যাওয়ার পর দিনের বাকি সময় গুয়াতেমালা যাত্রার প্রস্তুতি নিল রানা ও সোহানা। গুছিয়ে নিচ্ছে ব্যাগ। হোটেলে যেন পৌঁছে দেয়া হয় ডাইভিং গিয়ার ও ওয়েট সুট সে ব্যবস্থা করল।

তারই ফাঁকে উপরে ওদের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এল সালমা।

'আপনাদের জন্যে লাইসেন্স পেয়ে গেছি।'

'কীসের লাইসেন্স?' ব্যস্ত সোহানা আকাশ থেকে পড়ল।

'গুয়াতেমালায় পিস্তল সঙ্গে রাখার লাইসেন্স। আমাকে শুধু কপি দিয়েছে, গুয়াতেমালা সিটিতে আপনাদের হোটেলে গেলেই মূল রসিদ পাবেন। ওই দেশের আইন অনুযায়ী, গোপনে রাখতে হবে অস্ত্র, ভয়ঙ্কর কোনও বিপদে না পড়লে বের করতে পারবেন না। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর ওরা কেউ চায় না চোখের সামনে আবারও আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে।'

'অনেক ধন্যবাদ, সালমা,' বলল সোহানা।

'গুয়াতেমালার আলটা ভেরাপায রিজিয়নের জিপিএস ম্যাপ তুলে দিয়েছি আপনাদের স্যাটালাইট ফোনে। তবে সাইটের কোঅর্ডিনেট্স্ মুখস্থ রাখতে হবে আপনাদের, ওটা তুলে দিইনি

ফোনে। ক'দিন আগে গুয়াতেমালা সিটিতে খোলা হয়েছে বাংলাদেশ এমব্যাসি, ওটার ফোন নাম্বার আর ন্যাশনাল পুলিশের ফোন নাম্বারও দিয়ে দিয়েছি। বেশ কিছু দিন ধরে ওই এলাকায় চলছে লুটপাট ও চুরি; বিশেষ করে বিদেশীদের দেখলেই টার্গেট করা হয়। কিডন্যাপও করা হচ্ছে মুক্তিপণ আদায় করতে।'

'ভাববেন না, আমরা সতর্ক থাকব,' বলল সোহানা।

'মেক্সিকোতে গিয়ে যেসব পোশাক পরেছেন, সেরকম পুরনো কাপড় ব্যাগে রাখছেন দেখছি,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল সালমা। 'এতে সুবিধা হবে। চুরি-ডাকাতি করতে চাইবে না কেউ। ভাল হলো।'

'সোহানার পরামর্শ,' মুচকি হাসল রানা।

'আরেকটা খবর দিতে ভুলে গেছি,' বলল সালমা। 'ডক্টর রশিদ যোগাযোগ করেছিলেন, কোডেক্স নিয়ে গবেষণা করার জন্যে ইউনিভার্সিটি থেকে ভাল একটা জায়গা দিয়েছে তাঁকে। লাইব্রেরির আর্কাইভ ডিপার্টমেন্টে অত্যন্ত নিরাপদ সিন্দুক আছে, পাশেই বাড়তি ঘর। ওখানে কাজ করবেন প্রফেসর। প্রতিদিন কাজ শেষে আবার সিন্দুকে তুলে দেবেন কোডেক্স। চুরি-ডাকাতির ভয় নেই।'

'এ-ই ভাল হলো,' বলল রানা। 'আপনিও সতর্ক থাকবেন, সালমা।'

'নিশ্চয়ই।'

'আরেকটা কথা: কেউ পিছু নিলে ইউনিভার্সিটির দিকে না গিয়ে সোজা যাবেন পুলিশ স্টেশনে।'

'তা আবার বলতে,' হাসল সালমা, 'নিশ্চিন্ত হোক আপনাদের অভিযান। মিস সোহানার জন্যে অপেক্ষা করবে কাল্লু। আর কেউ ওকে এত ভালবাসে না। আমিও অত বিস্কুট দিই না।'

ওদের গোছগাছে সাহায্য করল, তারপর বিদায় নিল সালমা আলী।

আর ঠিক বারো ঘণ্টা পর বিমানে করে রওনা হলো রানা ও সোহানা গুয়াতেমালা সিটি লক্ষ্য করে।

দশ

গুয়াতেমালা সিটি এয়ারপোর্টে নেমে কোনও ঝামেলা ছাড়াই কাস্টমস পেরিয়ে গেল রানা-সোহানা। এয়ারলাইন টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে আসবে, এমন সময় রিনরিনে আওয়াজে বেজে উঠল স্যাটালাইট ফোন। পার্স খুলে ওটা বের করে রিসিভ করল সোহানা। 'হ্যালো, সালমা। আমাদের বিমানের পিছু নিয়েছেন?'

'বলতে পারেন,' হাসল শাখা প্রধান। 'দারুণ একটা খবর দেব বলে ফোন করলাম।'

'বলুন?'

'আপনাদের মনে আছে, কোডেক্সের প্রচ্ছদের ভেতরে ফোলা একটা জায়গা ছিল?'

'হ্যাঁ। চারকোনা। আমরা ভেবেছিলাম ওটা বাকলের টুকরো, প্রচ্ছদের ভাঙা অংশ জোড়া দিয়েছে।'

'তা নয়, ওটা পার্চমেণ্ট, ভাঁজ করা। ফিগের বাইরের দিকে গুঁজে রাখা ছিল। দু'ঘণ্টা আগে ডক্টর আক্তার রশিদ আর আমি মিলে ওটা বের করেছি। একটা চিঠি। কালো কালিতে লেখা। ভাষা স্প্যানিশ। ওখানে লিখেছেন: "মঙ্গল হোক সবার। এই বই এবং মায়াদের অন্যান্য কোনও বই-ই অভিশপ্ত নয়। এসব বইয়ে আছে ওদের ইতিহাস এবং গোটা পৃথিবীর বিষয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণালব্ধ তথ্য। যেভাবে হোক সংরক্ষণ করতে হবে এসব

বই। নইলে অনেক জ্ঞান হারিয়ে যাবে, আমরা জানব না মায়া জাতির মানুষকে।..."

'লিখেছেন কে?' জানতে চাইল রানা।

'ওটাই তো আশ্চর্য। সই করেছেন: "ফ্রা বার্তোলোমে দে লাস কাসাস।" নীচে লেখা: "র‍্যাবিনাল, আলটা ভেরাপায।"'

'লাস কাসাস?' চট্ করে সোহানাকে দেখল রানা। 'সত্যিই?'

'হ্যাঁ। সেই মানুষ, যিনি পোপকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ানরা যৌক্তিক মানুষ, তাদের অন্তর আছে, অধিকার আছে বাঁচার। সত্যি বলতে তিনিই প্রথম লিখেছেন মানুষের অধিকার নিয়ে। এখন আমার পাশেই প্রফেসর রশিদ, উত্তেজিত।'

'কাগজে সই করে তারিখ দিয়েছেন কাসাস?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ। জানুয়ারি তেইশ, পনেরো শ' সাঁইত্রিশ সাল। আমরা এখনও কোডেক্স সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু এটা বোঝা গেল, ওই সালেই লুকিয়ে ফেলা হয় এই কোডেক্স। লাস কাসাস বোধহয় চেয়েছিলেন বইটা সরিয়ে নেয়া হোক। আপনারা যাঁকে আগ্নেয়গিরির মন্দিরে পেয়েছেন, দায়িত্বটা বোধহয় তাঁকেই দেয়া হয়েছিল।'

'ওই চিঠির একটা কপি করে রাখুন,' বলল রানা।

'তাই করব। সহি সালামতে ঘুরে আসুন ওই দেশ থেকে। ও, আরেকটা কথা, আপনাদের গাড়ি রাখা হয়েছে হোটেলের পার্কিং লটে। আপনার নাম সেনর দে লা বার্গোস। অন লাইনে গাড়ি কিনেছি, কাজেই ওটা নিয়ে জঙ্গুলে পথে রওনা হয়ে যাওয়ার আগেই ভালভাবে দেখেশুনে নেবেন।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

ফোন রেখে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলো নির্দিষ্ট হোটেলে। ওদের জন্য সেরা সুইট ভাড়া

নিয়েছে সালমা আলী।

ডেস্ক থেকে দরকারী ডকুমেন্ট ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করল ওরা। ঘরে সব রেখে চলল দালানের পিছনের পার্কিং লটে।

গাড়িটা তেমন পছন্দ হলো না ওদের।

দশ বছরের পুরনো চেরোকি জিপ। ফেণ্ডারে আঁচড়ের দাগ, বোঝা গেল একসময়ে লাল ছিল এ-গাড়ি। পরবর্তীতে রঙের ব্রাশ দিয়ে সবুজ করা হয়েছে।

জিপের ইঞ্জিন চালু করল রানা, এক চক্কর ঘুরল সোহানাকে নিয়ে। সর্বক্ষণ খাড়া থাকল কান। ইঞ্জিনের কোনও সমস্যা থাকলে টের পাবে। পার্কিং লটে না ফিরেই রাস্তার পাশে থামল। খুলে ফেলল সামনের হুড, পরীক্ষা করল ফ্যান বেল্ট, ব্যাটারি, ফ্লুইড লেভেল আর হোস। এসব কাজ শেষে গাড়ির নীচে ঢুকল রানা, একটু পর তলা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'দেখতে খারাপ, তবে চলবে। পিছনের সিটের ওদিকে অনেক জায়গা, এঁটে যাবে সব ইকুইপমেন্ট।' একটা পেট্রল পাম্পে থামল ওরা, কানায় কানায় ভরে নিল ট্যাঙ্কি। দুটো পাঁচ গ্যালনের ক্যান কিনে ওগুলোতে ভরল অকটেন।

বিকেলে ঘরে ম্যাপ নিয়ে বসল ওরা। ঠিক হলো কোব্যানের দিকে যাওয়ার সময় ব্যবহার করবে ১৪এন সড়ক। ভেরাপায জেলার উত্তরদিক চিরে পৌঁছবে রিয়ো ক্যাণ্ডেলারিয়া রিজিয়নের সুকযুল-এ।

পরদিন ভোরে সমস্ত মালপত্র জিপে তুলল ওরা। বড় দুই ব্যাকপ্যাকে রইল পরিষ্কার পোশাক ও শুকনো খাবার। প্রত্যেকের কাছে দুটো করে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন এমঅ্যাণ্ডপি নাইন মিলিমিটার পিস্তল। ওগুলোর একটা করে থাকল দুই ব্যাকপ্যাকে। সঙ্গে ছয়টি করে গুলি ভরা ম্যাগাযিন। ঢোলা শার্টের নীচে পেটের ব্যাণ্ডে বাকি দুই পিস্তল গুঁজল ওরা। বাদ পড়ল না কোনও

গ্যাজেট বা ডাইভ ইকুইপমেন্ট।

রওনা হয়ে যাওয়ার পর রানার মনে হলো, প্রতি মুহূর্ত কষ্টে ধুঁকছে পুরনো ইঞ্জিন। এটাই স্বাভাবিক। আলটা ভেরাপাযের সবচেয়ে নিচু অংশ এক হাজার ফুট, আর উপরের অংশ নয় হাজার ফুট উঁচু। কখনও মনে হলো গুঙিয়ে উঠছে জিপ, সামনে থেকে রশি ব্যবহার করে ওটাকে টেনে তোলা হচ্ছে। আবার যখন ঢাল বেয়ে হড়হড় করে নেমে চলেছে, রীতিমত যুদ্ধ করে কমাতে হচ্ছে গতি। ছোট সব শহরে থামছে ওরা, হালকা কিছু খেয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আবারও রওনা হচ্ছে। মাঝে মাঝে থেমে জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছে সামনের রাস্তা কেমন।

খুদে এক পল্লীতে থেমে সোহানার কাছে জানতে চাইল রানা, 'কী মনে হচ্ছে?'

'কপাল ভাল ক'দিন আগেই আগ্নেয়গিরি বেয়ে উঠেছি,' বলল সোহানা, 'নইলে খবর ছিল, এখানে এসে সারাক্ষণ কাল্লুর মত হাঁপাতাম।'

'সামনের পথ হয়তো আরও খারাপ।'

'পরোয়া করি না।'

'পথ শেষে আরও খাটুনি থাকতে পারে।'

'থাকুক। কাজ শেষ না করে ফিরছি না।'

কোব্যানে ছোট এক হোটেলে রাতের মত উঠল ওরা। গভীর হলো ঘুম। পরদিন ভোরে রওনা হলো সুকযুলের উদ্দেশে।

কখনও দেখল মায়া কৃষক ও হিসপ্যানিক টুরিস্ট, যে যার পথে চলেছে। ওরা বুঝে গেল, বড় শহর পিছনে ফেলে আসা মানেই আধুনিক সভ্যতা থেকে সরে যাওয়া।

গ্রামের দিকে ইংরেজি বা স্প্যানিশ জানা লোক কমই আছে। কয়েকটা ছোট জনপদ পিছনে ফেলবার পর সরু হয়ে গেল হাইওয়ে। সামনে ভাঙাচোরা, উঁচু-নিচু পথ, চলা কঠিন।

আরও একঘণ্টা পর ম্যাপ দেখল সোহানা। হাতঘড়ির উপর চোখ রেখে জানাল, 'আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা সুকযুলে।'

সত্যিই পাঁচ মিনিট পর ওই গ্রামে হাজির হলো ওদের লক্কড়-ঝক্কড় জিপ। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট বাড়ি। মাত্র তিন শ' ফুট গেলে আবারও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নির্জন হাইওয়ে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গাড়ি রাখল ওরা, নেমে এল। সামনের পথ নুড়ি পাথরের। থমথম করছে চারপাশ। পাখির কোনও কূজন নেই। দূরে ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর, ভেঙে গেল নীরবতা। কেউ কেউ বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে, কৌতূহলী। কোনও গাড়ির আগমন যা-তা কথা নয়। কিছুক্ষণ দেখল রানা ও সোহানাকে, তারপর উৎসাহ হারিয়ে যে যার মত ঢুকে পড়ল বাড়িতে।

আরও কিছু দূর যাওয়ার পর নুড়ি পাথরের রাস্তা হয়ে উঠল এবড়োখেবড়ো, গর্ত ভরা কাঁচা পথ। এদিক দিয়ে চলে ষাঁড়ের গাড়ি।

'এই জিপ কোঁ-কোঁ করে কাঁদবে,' বলল রানা।

'আর আমরা হু-হু করে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। 'তবে পথের যে চিহ্ন আছে, সেজন্যেই কপালকে ধন্যবাদ দেব।'

'নাচতে নাচতে যেতে হবে।'

'এসো নাচি! ঠিক পথে যাচ্ছি কি না কে জানে!' প্রকাণ্ড সব গাছের সবুজ পাতার চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে চট্ করে আকাশ দেখে নিল সোহানা।

রানা বলল, 'সন্ধ্যা নামতে অনেক দেরি। ছয় ঘণ্টা এগোতে পারব। সামনে ফুরিয়ে যেতে পারে পথ। সেক্ষেত্রে ম্যাচেটি ব্যবহার করে জঙ্গল কেটে এগোতে হবে।'

জিপ রেখে ব্যাকপ্যাক থেকে পানির ক্যান্টিন নিল ওরা, মিটিয়ে নিল তৃষ্ণা। ম্যাচেটি বের করে হাতের কাছেই রাখল।

চেরোকি আবারও রওনা হয়ে গেল উঁচু ঢাল বেয়ে।

অনেকক্ষণ পর স্যাটালাইট ফোনে জিপিএস কোঅর্ডিনেট্স্ দেখল রানা। সঠিক পথেই চলেছে। এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথ উপরে। একসময় গাড়ি উঠে এল আলটা ভেরাপাযের অনেক উঁচু এলাকায়। ঘুটঘুটে আঁধার নামবার পর থামল ওরা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় টাঙাল খুদে তাঁবু, পোকামাকড় ঠেকাতে ব্যবহার করল নেটিং। একপাশে ছোট আগুন জ্বেলে চমৎকার পরোটা বানাল সোহানা, সঙ্গে শুকনো মাংসের ঝুরি। ভেজে নেয়ার পর খেতে দারুণ হলো।

পরদিন ভোরে পানির খোঁজে বেরোল ওরা।

পেয়েও গেল।

একটু দূরে এক ফোঁপরা গুঁড়ির ভিতর কয়েক গ্যালন পানি রেখেছে এ পথে চলাচল করা মায়ারা।

নিজেদের প্লাস্টিকের দুটো ক্যান ভরে নিল রানা ও সোহানা। পানির ভিতর ফেলল পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট, তারপর ক্যান রেখে দিল জিপের পিছনে।

পরের পাঁচ দিন একই রুটিন চলল।

প্রতিদিন দেখল জিপিএস কোঅর্ডিনেট্স্।

ক্রমেই আরও দুর্গম এলাকায় ঢুকল ওরা। দুর্লভ হয়ে উঠল গ্রাম। মানুষ নেই জঙ্গলে, মস্ত সব গাছে সারাক্ষণ কিঁচ-কিঁচ করছে হাজার হাজার বানর। ভোরে আর সন্ধ্যায় কিচির-মিচির করছে লাখো পাখি। ছোটগুলো গাছের ঘন চাদরের আড়ালে থাকায় দেখা গেল না, কিন্তু নানান বিচিত্র আওয়াজ তৈরি করে জানান দিল— আমরা কিন্তু আছি!

আরও তিন দিন মেটো-পথ ওদের নিয়ে গেল উঁচু এক টিলায়। চূড়া থেকে নীচে দেখা গেল উপত্যকা— ছোট সব টিলা দিয়ে ঘেরা। ওরা বুঝল, এখানে দুরমুজের মত কিছু দিয়ে জমিন

সমান করেছে মানুষ।

উপত্যকায় জায়গায় জায়গায় মস্ত সব গাছের জটলা। ঝরা পাতা ও ধুলোয় ঢেকে গেছে মাটি। গাছ ও অপেক্ষাকৃত বড় ঝোপের ছায়ায় শুকিয়ে মরে গেছে নিচু ঝোপঝাড়। বছরের পর বছর ধরে এমন হয়েছে। সমতল উপত্যকা প্রায় মসৃণ।

ডানদিকের নিচু টিলার দিকে চাইল ওরা, তারপর বামদিকে। ওদিকেও একইরকম টিলা। জিপ থেকে বেরিয়ে সমতল জমিতে কমপাস রাখল রানা। একটু পর বলল, 'ডানের টিলার পাশ দিয়ে গেছে সমান জায়গাটা। কোনও খুঁত নেই। মানুষের তৈরি।'

জিপ রেখে উঁচু টিলা থেকে নেমে পড়ল ওরা।

ডানদিকের নিচু টিলার গোড়া থেকে প্রতি কদম গুনল রানা। মাঝের জায়গা পেরিয়ে পৌঁছে গেল বামের টিলার কাছে। বলল, 'মাঝে পঞ্চাশ গজ। আরও সামনে গিয়ে দেখে নিয়ে জিপ থেকে ব্যাকপ্যাক আনব। কাজে লাগবে ম্যাচেটি আর ফোল্ডিং কোদাল।'

প্রতি কদম গুনে গুনে কয়েকটা টিলা পেরোল ও, মেপে দেখেছে প্রতিটি।

'মাঝে পঞ্চাশ গজ?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ।'

'এসব টিলা আসলে কী বলে ভাবছ?'

'মায়াদের ব্যাপারে যা পড়েছি, অনেক কিছুই হতে পারে। পুরনো আমলের দালানের ওপর নতুন করে দালান তুলত ওরা।'

'ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই, বেছে নাও কী করবে,' বলল সোহানা। 'এখানে পাকা চাতাল আছে কি না দেখতে মাটি খুঁড়বে, নাকি ওই জঙ্গুলে উঁচু টিলায় উঠে দেখবে ওটা আসলে কোনও দালান কি না?'

'টিলার ওপরে উঠলে বহু দূর দেখা যাবে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, ক'দিন হলো গাছের নীচেই আছি, খোলা আকাশই

ভাল,' বলল সোহানা।

আবারও পিছনের উঁচু টিলার চড়াই বেয়ে উঠল ওরা, জিপ থেকে রানার ব্যাকপ্যাক, কোদাল ও ম্যাচেটি নিয়ে নেমে এল সমতলে। ডানদিকের একটা টিলা বাছাই করে উঠতে লাগল। ওটাই সবচেয়ে উঁচু। উচ্চতা হবে এক শ' পঁচিশ ফুট। খাড়া ঢালে জন্মেছে গাছ ও ঝোপঝাড়। ওগুলো ধরে ধরে উপরে উঠছে ওরা।

চূড়ায় উঠে ফোল্ডিং কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল রানা। এক ফুট ধুলোবালি ও মাটি সরিয়ে ফেলবার পর 'ঠং!' করে উঠল কোদালের ফলা। নীচে কঠিন পাথর। ম্যাচেটি ব্যবহার করে ওখানে গর্ত করতে চাইল। একইরকম আওয়াজ।

কয়েক গজ দূরে দালানের মাথায় ঘন ঝোপ, ওখানে ঢুকেছে সোহানা। চাপা স্বরে ডাকল, 'এসে দেখে যাও!'

কোদাল ও ম্যাচেটি হাতে ঝোপে ঢুকল রানা।

নীচের গাছগুলোর উপর দিয়ে দূরে চেয়ে আছে সোহানা। এখান থেকে দেখলে মনে হবে সবুজ কোনও চাদর বিছিয়ে আছে। কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় গাছের ছাত নেই।

পিছনে ফেলে আসা সমতল এক জায়গার দিকে আঙুল তাক করল সোহানা। 'ওদিকটা চওড়া রাস্তার মত। দু'পাশের টিলার মাঝ দিয়ে গেছে। কিন্তু কয়েক শ' গজ গিয়েই শেষ।'

'ওই যে, আরেকটা, বাঁক নিয়ে মিশে গেছে আগেরটার সঙ্গে,' বলল রানা।

'ওদিকে আরেকটা,' দেখাল সোহানা, 'পাঁচ... না, ছয়টা পথ। সব মিশেছে গিয়ে একটা জায়গায়।'

'মাঝে নক্ষত্রের মত কিছু, চারপাশে উঁচু দেয়াল।'

'এর ওপর দিয়ে এক শ'বার বিমান নিয়ে উড়ে গেলেও দেখতে পাব না,' বলল সোহানা। 'সব স্বাভাবিক লাগছে নীচের গাছগুলোর কারণে। এসব রাস্তা গিয়ে মিশেছে গোল মত

জায়গাটাতে। আর এখন মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি একটা মায়ান পিরামিডের ওপর।'

'কিছু যে, তাতে সন্দেহ নেই,' বলল রানা, 'জানাও হয়ে গেছে কোথায় যেতে হবে।'

'সব পথ যেখানে মিলেছে,' সায় দিল সোহানা। খাড়া টিলা বেয়ে নেমে বলল, 'জায়গাটা কেমন ভুতুড়ে না?'

'হ্যাঁ, মাসুদ রানার লোভী প্রেতাত্মা ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর।'

'আহ্, রানা, ঠাট্টা না! ভাবতে কেমন লাগে না যে চারপাশের বিশাল সব দালান চাপা পড়েছে ধুলোবালি আর গাছের নীচে? আর কবর থেকে আমাদেরকে দেখছে শত শত বছর আগের...'

'কবর পেলে কই তুমি?'

'মাটির নীচে তো আছে?'

'মায়াদের একটা ভূতও তো দেখছি না। ওই টিলার ওপর গাড়ি, ওদের একটাও যদি আসে, ভেগে যাব জিপ নিয়ে।'

'গাছগুলো দেখেছ, ওপর থেকে দেখলে মনে হয় সাধারণ জঙ্গল। কিন্তু তা নয়। প্রতিটি গাছ সরল রেখা তৈরি করেছে।'

সোহানার পাশে দাঁড়িয়ে দূরে চাইল রানা।

সমতল, চওড়া ফিতার মত সব রাস্তা। পাশেই নানা আকারের গাছ গেছে মাঝের জায়গাটার দিকে। কাছের রাস্তার পাশে গিয়ে থামল ওরা। একটা গাছের পাশে ব্যাকপ্যাক রাখল রানা, কোদাল দিয়ে খুঁড়তে শুরু করল। সহজেই উঠে আসছে উর্বর মাটি। কিছুক্ষণের ভিতর তিন ফুট চওড়া তিন ফুটি গর্ত তৈরি করে ফেলল ও। সরে এসে বলল, 'এবার দেখো।'

দু'পা সরে গর্তের কিনারা থেকে নীচে চাইল সোহানা। ওখানে পাথরের মসৃণ চাতাল। আবারও চোখ তুলে দেখল দূরে রাস্তার মত পাকা সমতল। 'ভি আকৃতির ওই পাথুরে জমিন কি ড্রেনের

মত? চাষাবাদের নালা?'

'হতে পারে,' বলল রানা।

'তাই?'

'হ্যাঁ, মনে আছে ডক্টর রশিদের কথা? মায়াদের শেষ ক্লাসিক পিরিয়ডে ভয়ঙ্কর খরা ছিল। ওগুলো কোনও রাস্তা নয়। মায়াদের কাছে গোলাকার চাকা ছিল না, কোনও প্রাণীও পুষত না। কাজে আসার কথা নয় পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা। তা ছাড়া, এগুলো কোথাও গিয়ে শেষ হয়নি। জায়গাটা প্লাযার মত, আর চারপাশ থেকে ছয়টা রাস্তা এসে থেমেছে ওই গোল জায়গায়। ...আমার মনে হয় ওটা বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখার কাজে আসত।'

'পথের দু'দিকের পাড় সামান্য ঢালু হয়ে উপরে উঠেছে, রাস্তা গেছে সোজা মাঝের গাছগুলোর দিকে,' বলল সোহানা।'

'ছয়টা চওড়া নর্দমা পানি পৌঁছে দিত ক্যাচ বেসিনে,' বলল রানা। 'মাটির নীচে জমা হতো সব।'

'চলো তো দেখি সত্যিই ওখানে সেনোটে আছে কি না,' বলল সোহানা।

প্রায় সমতল নালায় পৌঁছে সামনে এগোল ওরা। একটু পর ঝোপঝাড়ের কারণে কঠিন হয়ে উঠল এগিয়ে যাওয়া। কোথাও কোথাও একদম পরিষ্কার মেঝে, বৃষ্টির মৌসুমে পানির স্রোত সরিয়ে নিয়েছে ধুলোবালি।

কিছুক্ষণ পর চওড়া নালার শেষে খোঁড়লের মত জায়গাটায় পৌঁছে গেল ওরা। সামনেই প্রাচীন দেয়াল। উচ্চতা পনেরো ফুট। ভি-র মত নালার শেষে দেয়ালের নীচে দশ ইঞ্চি চওড়া গর্ত। বৃত্তাকার দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। অন্য পাঁচ নালা এসে মিশেছে দেয়ালের অন্য পাঁচ ফাটলে।

দেয়াল পুরো বৃত্তাকার নয়, এক জায়গায় সরু পথ। ওখানে ছিল দরজা। ওই অংশ বাদ দিলে প্রাচীর পুরো তিন শ' ষাট ডিগ্রি

বৃত্তাকার। সংকীর্ণ পথের পর সিঁড়ির ধাপ উঠেছে দশ ফুট উপরে, থেমেছে কারুকাজ করা করিডোরে। ওটার উপরে উঠে দেয়ালের ভিতরের অংশে পৌঁছে গেল ওরা।

চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে প্রাচীর। আর মাঝে নীচে একটি বড় কূপ। দেয়ালের কিনারা থেকে চাইল ওরা। পরিষ্কার নীল টলটলে পানি। কূপের গভীরতা তিরিশ ফুট। সূর্যের আলো পড়ছে না ভিতরে। একবার দিগন্তে চোখ গেল রানার। দু' ঘণ্টা পর পাটে বসবে রবি মামা। আবারও সেনোটের দিকে চাইল। কূপের একটু দূরে সিঁড়ি উঠে গেছে প্রাচীরের কাঁধে।

'ওরা দেয়াল তৈরি করল কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'বইয়ে যা পড়েছি, তা বলছি: মায়ান আমলে শহরগুলোর পানি রক্ষা করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। শহরের পতন ঘনিয়ে এলেও সেনোটে দখলে রাখতে চাইত তারা। আগে খাবার পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে, পরে ভাববে পাল্টা হামলার কথা। দেখছই তো, গোল সেনোটে তিরিশ ফুট চওড়া। আক্রমণ এলে রক্ষা করা সহজ ছিল। প্রাচীরের নীচের অংশ পুরো ছয় ফুট পুরু।' নেমে এসে দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে আলগা একটা পাথর তুলে নিল রানা। চার পাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'প্লাগ হিসেবে কাজ করত এই পাথর। একই জিনিস আটকে রাখত অন্য পাঁচ ফাটল। পানিতে বিষ মিশিয়ে দেয়ার উপায় ছিল না।'

'আমাদের কাজ তো শেষ,' বলল সোহানা। 'এবার সালমা আর ডক্টর রশিদকে জানিয়ে দিই আমরা ওটা পেয়ে গেছি।'

'তাই করব, কিন্তু তার আগে কিছু ছবি তুলব,' বলল রানা। 'ওগুলো ই-মেইল করে পাঠিয়ে দেব।'

প্রাচীন প্রাচীর, সেনোটে, প্রবেশ-পথ ও দেয়ালের ব্যাটলমেণ্টের ছবি তুলল সোহানা। পিরামিডের উপর থেকে এবং নালার যেসব ছবি তুলেছে, সবই একটা ফোল্ডারে ভরে পাঠিয়ে

দিল সালমার উদ্দেশে।

মাত্র এক মিনিট পর কল করল সালমা আলী। 'তা হলে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' জানাল সোহানা। 'এখন ওই সাইটেই আছি। নিশ্চয়ই দেখেছেন ছবি? ডক্টর রশিদকে জানিয়ে দিন কোডেক্সের মানচিত্র সঠিক। গোল, উঁচু দেয়ালে ঘেরা কূপে টলটল করছে নীল পানি। গভীরতা তিরিশ ফুট মত।'

'সমান জায়গাগুলো কী? ...রাস্তা?'

'প্রাচীন নালা, বৃষ্টির পানি আনত কূপে। নালা ধীরে ধীরে নেমেছে সেনোটেয়। একেকটা বড়জোর কয়েক শ' গজ লম্বা।'

সোহানার পাশ থেকে বলল রানা, 'আর নালার পাশে যে টিলা দেখেছেন, সবই দালান। ওগুলোর মধ্যে একটা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বড়।'

'তা হলে ওই সাইট বড় কোনও শহর হতে পারে।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা।

'আপনাদের কাজ শেষ, মাসুদ ভাই, তাই না?' বলল সালমা। 'কংগ্র্যাচুলেশন্স। এবার কি ফিরছেন?'

চট্ করে রানাকে দেখে নিল সোহানা, তারপর বলল, 'এখনই নয়। এত বড় জঙ্গল পেরিয়ে নিয়ে এসেছি স্কুবা গিয়ার, এমনি এমনি? আগামীকাল সকালে পুলে নামব, দেখব নীচে কী আছে।'

'আপনাকে দোষ দিতে পারছি না,' হাসল সালমা, 'ঠিক আছে, ছবিগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি ডক্টর রশিদের কাছে। সঙ্গে লিখিত বর্ণনাও দেব।'

'তা হলে পরে দেখা হবে,' বলল রানা।

'বিদায়,' বলে কল কেটে দিল সোহানা।

'সব গিয়ার আনতে হবে,' বলল রানা। 'জিপ নামিয়ে আনতে চাও এখানে? অবশ্য ভূতের ভয় পেলে...'

'রানা!' ভুরু কুঁচকাল সোহানা। 'জিপ ওখানেই থাকুক। নিয়ে আসব মালপত্র। কয়েকবার গেলেই হবে। শেষবার আনব আমার ব্যাকপ্যাক।'

প্রাচীর ঘেরা বদ্ধ জায়গায় সেনোটের পাশে তাঁবু দাঁড় করাল ওরা। একটু দূরের জঙ্গল থেকে নিল শুকনো ডাল। আগুন জ্বলে ওঠার পর পটে পানি দিল সোহানা, ব্যস্ত হয়ে উঠল সুস্বাদু খাবার তৈরিতে।

পৌনে এক ঘণ্টা পর পেট পুজো শেষে উঠে পড়ল রানা, পট ও বাসন পরিষ্কারে সাহায্য করল সোহানাকে।

আর বড়জোর একঘণ্টা আলো থাকবে, কাজেই কাছের টিলার উপর উঠল ওরা, ছবি তুলবে এই সাইটের।

উঁচু থেকে অসংখ্য ছবি নিল ওরা। আবারও ফিরল তাঁবুতে।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। সামান্যতম খুনসুটি ছাড়াই শুয়ে পড়ল দু'জন। ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় বেজে উঠল স্যাটালাইট ফোন। স্ক্রিন দেখে নিয়ে রিসিভ করল: 'হ্যালো, বলুন?'

'আপনাদের এসব ছবি অতুলনীয়, আপনারা প্রমাণ করে দিলেন কোডেক্স নির্ভুল,' বললেন ডক্টর রশিদ। 'আর কোনও সন্দেহ থাকল না, উপকথা বা ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর নির্ভর করা কল্পনাপ্রসূত জিনিস নয় ওটা, পুরোপুরি বাস্তব। সেনোটের যে ছবি পাঠিয়েছেন, ওখানেই শত শত বছর আগে হতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দেয়াল লাইমস্টোনের। আর ঝুরঝুরে বলেই গলে যেত পানিতে। এ থেকে আরও নিশ্চিত হয়েছি, অনুষ্ঠান ওখানেই হতো।'

'সকালে ডাইভ দেয়ার সময় আরও কাছ থেকে দেখব,' বলল রানা।

'বোধহয় বিস্ময় অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে,' বললেন

প্রফেসর। 'মায়ারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করত, ওদের জীবন নির্ভর করছে জটিল মনের সব দেবতাদের ইচ্ছের ওপর। কাজেই, যার যার সেরা জিনিস উৎসর্গ করত সেনোটেয় বৃষ্টি-দেবতা চাকের কাছে।'

'এখানে যা-ই ঘটুক, পানির অভাবে শহর ছেড়ে যায়নি তারা,' বলল সোহানা।

'আপনারা হয়তো বের করতে পারবেন আসলে কী হয়েছিল।'

'চেষ্টা করব,' কথা দিল রানা।

জরুরি আর কোনও কথা নেই কারও, বিদায় নিয়ে ফোন অফ করলেন ডক্টর আক্তার রশিদ

এগারো

গতকাল সন্ধ্যার পর পর শুয়ে পড়েছে রানা ও সোহানা, তাই ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। ঝটপট নাস্তা সেরে নিল ওরা, তারপর ডাইভ ইকুইপমেন্ট পরে তৈরি হলো সেনোটেয় নামতে। সঙ্গে একটা করে ফ্ল্যাশলাইট, নেটের ব্যাগ ও ডাইভ নাইফ।

'শুরু হোক পাতাল অভিযান,' মিষ্টি করে হাসল সোহানা।

'মনে রেখো, আমরা যেন একে অপরের কাছ থেকে সরে না যাই,' বলল রানা, 'যে-কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে।'

'নীচে হয়তো কিছুই নেই, আছে শুধু মানুষের একগাদা হাড়,' বলল সোহানা।

'রেডি?'

'হ্যাঁ।'

মুখোশ পরে নিল ওরা, মুখে মাউথপিস, আস্তে করে নেমে পড়ল শীতল পানিতে। একটু আগে সূর্য উঠেছে বলে পরিষ্কার দেখা গেল কূপের গভীরে।

কয়েক সেকেণ্ডে সেনোটের লাইমস্টোনের মেঝেতে পৌঁছল ওরা। "ওখানে অনেক কিছুই পাবেন" বলেছিলেন ডক্টর আক্তার রশিদ, কিন্তু ঘাসহীন ন্যাড়া গড়ের মাঠের মতই ফাঁকা মেঝে। সামনে রওনা হয়ে চারপাশে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ওরা। কয়েক সেকেণ্ড পর একটা ডিস্ক দেখে লাইমস্টোনের গুঁড়ো সরিয়ে ওটা তুলল রানা। জিনিসটা সবুজ জেড পাথরের, সুন্দর কারুকাজ করা। সোহানাকে দেখাল, তারপর রেখে দিল নেটের ব্যাগে।

একটু যেতেই বামদিকের মেঝেতে চকচকে কী যেন দেখল সোহানা, আস্তে করে ধরল রানার বাহু। রওনা হয়েই টের পেল, ওদিকে যেতে ওকে ঠেলছে হালকা স্রোত। সেনোটের বৃত্তাকার মুখ থেকে আসছে সূর্যের আলো, কিন্তু ওই রশ্মির আওতার বাইরে ঘুটঘুটে আঁধার। একমাত্র ভরসা ফ্ল্যাশলাইটের সাদা আলো।

প্রথমে বড়, গোল এক সোনার ব্রেসলেট পেল সোহানা, ওটা তুলে নিয়ে দেখাল রানাকে। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। লাইমস্টোনের মেঝের একটু উপর দিয়ে ভেসে চলেছে ওরা। মসৃণ, পাথুরে মেঝেতে বিছিয়ে আছে বহু কিছু। বেশিরভাগই খোদাই করা জেড পাথর ও খাঁটি সোনার গহনা— মুখোশ, নেকলেস, ইয়ার প্লাগ, ব্রেসলেট এবং চেস্ট প্লেট।

বেশ কিছুক্ষণ নেটের ব্যাগে প্রাচীন মায়া গহনা তুলল ওরা, তারপর সোহানার বাহু স্পর্শ করল রানা, আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল সেনোটের মুখের আলো এখন কমপক্ষে এক শ' ফুট দূরে। কখন যেন অজান্তেই অনেক সরে এসেছে ওরা।

ফিরতি পথে চলল দু'জন, কোমরে গুঁজে নিয়েছে নেটের

ব্যাগ। রূপালী আলোর বৃত্তে পৌঁছে ভেসে উঠল সোনালী রোদের দেশে। মাস্ক খুলে কূপের কিনারায় সরে এল রানা, ডাঙায় তুলল নিজের ব্যাগ। ওর পর পর সোহানারটা। পাথুরে মেঝেতে উঠে হাত ধরে সোহানাকে টেনে তুলল রানা।

'যেন ঘুরে এলাম অন্য কোনও গ্রহ থেকে,' হাসল সোহানা। 'মায়ারা ওদের পবিত্র কূপে সব গহনা উৎসর্গ করেছে, আর আমরা আরাম করে তুলে নিচ্ছি! ব্যস, এতই সহজ? রানা, আমি কিন্তু ভয়ঙ্কর লোভী এক মেয়ে হয়ে উঠতে পারি!'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার দ্বারা হবে না, লোভী হওয়ার ধাত নেই তোমার।'

'আসলেই নেই? তা হলে কী হবে?' হতাশ হয়ে রানার কাঁধে মাথা রাখল সোহানা। 'জানো, ওখানে হালকা স্রোত আছে? ওটার জন্যে গহনাগুলো সরে গেছে এক দিকে।'

'হয়তো সরেছে মায়ান ক্লাসিক সময়ে হাজার বছর ধরে,' বলল রানা। চট্‌ করে চুমু দিল সোহানার গালে। বদলে পেল কানে হালকা কামড়।

উঠে দাঁড়াল সোহানা। 'সেনোটের মুখ থেকে ছেড়ে দিতেই আরেকদিকে গায়েব।'

'আর মায়ারা যখন নীচে তাকিয়ে দেখেছে নেই ওটা, ধরে নিয়েছে ওদের উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন দেবতা। এবার খুশি হয়ে বৃষ্টি দেবেন তিনি।'

'আর যখন বুঝেছে: কই, ব্যাটা তো বৃষ্টি দেয় না— তখন?'

'ওই দেবতার বাপ-মা তুলে গালি দিয়েছে হয়তো,' হাসল রানা।

সেনোটেয় পাওয়া গহনা বিছিয়ে ছবি তুলল ওরা, পাঠিয়ে দিল সালমা আলীর মোবাইল ফোনে। সব গহনা ঠাঁই পেল চেইনওয়ালা এক ব্যাগে। রাখা হলো রানার ব্যাকপ্যাকে।

'নীচের সব গয়না তুলতে পারিনি,' বলল সোহানা, 'বিকেলের দিকে আরেকবার নামবে?'

'নামতে পারি,' বলল রানা। 'এখনও জানি না এটা শহর, দুর্গ না সাধারণ কোনও আনুষ্ঠানিক সেনোটে। মাত্র একবার নেমে কিছুই বুঝব না। এই কূপ পেলে কয়েক বছর ধরে গবেষণা করবেন আর্কিয়োলস্টিরা। কিন্তু আমাদের কাজ আলাদা। কোডেক্সের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। তা আমরা করেছি।'

'তো এবার বাড়ি?'

'হ্যাঁ, তবে দেশে নয়, ক্যালিফোর্নিয়ায়। তার আগে কালকে ম্যাপিং করব এই শহর। ফোটোও তুলব। পরশু রওনা হব। আমাদের খাবারও ফুরিয়ে আসবে ততক্ষণে।'

'জঙ্গলে টাপির আছে, তোমাকে মাংসের স্যাণ্ডউইচ তৈরি করে দিতে পারব।'

'পরশুর পর এখানে থাকলে ওই জিনিসই খেতে হবে।'

ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছেড়ে পোশাক পরে নিল ওরা। তারপর একে একে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল প্রতিটি নালা। বিকেলের দিকে তৃতীয় নালার শেষ মাথায় দেখল দুটো পাথরের পিলার। মনে হলো ওটা ফটকের দু'পাশের ভিত্তি। প্রতিটি আট ফুট উঁচু, খোদাই করা। একটা পুরুষ কলাম, ওটার মাথায় পাথরের পালকের মুকুট, হাতে ঢাল ও গদা। অন্য কলামটা নারী। পরনে মায়া পোশাক, পায়ের কাছে বাস্কেট, হাতে জগ। দুই মূর্তির চারপাশে মায়াদের গ্লিফ।

প্রতিটি অ্যাংগেল থেকে ছবি নিল সোহানা, সব পাঠাল সালমা আলীর ফোনে। মুখ তুলে বলল, 'সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে আরও কয়েকটা ছবি নেব, তা হলে পরিষ্কার দেখা যাবে গ্লিফগুলো।'

প্রতিটি কলামের দুটো করে ছবি তুলল সোহানা। আরও

তুলত, কিন্তু ওর বাহুতে হাত রাখল রানা, চাপা স্বরে বলল, 'সোহানা! ওদিকে তাকাও!'

ওরা যে ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমেছিল, সে ট্রেইল ধরে আসছে একদল লোক।

রানা আন্দাজ করল, সংখ্যায় অন্তত পনেরোজন।

এখনও সিকি মাইল দূরে।

ঢাল বেয়ে নামছে সেনোটের দিকে।

'যাহ্!' বলল সোহানা, 'বোধহয় ফ্ল্যাশের আলো দেখেছে। ভাল লোক না খারাপ, কে জানে!'

'জিপ ওখানে রাখা ঠিক হয়নি,' বলল রানা। 'আমাদেরকে না দেখলেও গাড়ি তো দেখেছে। ঝামেলা হতে পারে। দেরি না করে সেনোটের দেয়ালের আড়াল নেয়া উচিত।'

এক সারি গাছের আড়াল নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

মাঝের নালার পাশে পৌঁছে একবার পিছনে চাইল সোহানা।

টিলার মাথায় থমকে গেছে এক লোক, কাঁধে রাইফেল।

'রানা! গুলি করবে! দৌড়াও!'

হুইশ্ আওয়াজ তুলে ওদের মাথার কয়েক ফুট উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট, তিন সেকেণ্ড পর এল 'কড়াৎ!' আওয়াজ। পরের আওয়াজটা বিকট, বিস্ফোরিত হয়েছে জিপ। অকটেনের লাল আগুনের মস্ত এক ফুটবল উঠে গেল আকাশে। তার আগেই ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করেছে রানা ও সোহানা। লোকগুলোর মাঝে বড় গাছের সারি ও ঘন ঝোপঝাড় রেখে ছুটছে সেনোটের দিকে। ওরা রয়েছে সমতল জমিতে, পরিষ্কার দেখছে সামনের দিক। ঢালু জমিতে দৌড়ে নামতে পারছে না লোকগুলো, তাড়াহুড়ো করলে অনেক উপর থেকে নীচে পড়বে, মারাত্মকভাবে আহত হবে, অথবা মারা পড়বে।

দৌড়ের ফাঁকে একবার পিছনে চাইল রানা।

আরেক লোক কাঁধে তুলে নিয়েছে রাইফেল।

'কাভার নাও, গুলি করছে!' জানিয়ে দিল রানা।

কুঁজো হয়ে ছুটছে ওরা, চট্ করে সরে গেল এক দঙ্গল গাছের আড়ালে।

'কড়াৎ!' করে উঠল রাইফেল। ডানপাশের গাছের কাণ্ডে লাগল বুলেট। বৃষ্টির মত ঝরঝর করে খসে পড়ল শুকনো বাকল, নানাদিকে ছিটকে গেল কাঠের কুচি। কাণ্ডের পাশ দিয়ে উঁকি দিল রানা। টেলিস্কোপিক সাইট ঠিক করে নিচ্ছে লোকটা।

'দৌড়াও, সোহানা!'

ঝড়ের গতিতে ছুটল ওরা। একটু দূরেই সেনোটের উঁচু প্রাচীর। ওটার পাশ কাটিয়ে প্রবেশদ্বারের দিকে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছুল সরু ফাটলে, ঢুকে পড়ল ভিতরে। সোহানাকে সেনোটের কাছে যেতে দিয়ে নিজে থেমে গেল রানা। ব্যস্ত হয়ে জড় করছে ছোট-বড় পাথর। দু'দেয়ালের মাঝের ফাঁকে তৈরি করবে দেয়াল।

ওদিকে ব্যাকপ্যাকের কাছে পৌঁছে গেছে সোহানা, দেরি না করে ঝটপট বের করল ওদের পিস্তল, ম্যাগাযিন ও গুলির বাক্স। অস্ত্র পুরোপুরি লোডেড আছে দেখে নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল দুটো পিস্তল।

'ওরা কারা?' আনমনে বলল সোহানা। 'কথা নেই, বার্তা নেই আমাদেরকে শত্রু ভাবছে কেন?'

'জানি না, তবে ফ্ল্যাশের আলো দেখেই এসেছে।' প্রাচীর দেখাল রানা। 'দেখা যাক এই দেয়াল ব্যবহার করে বাঁচা যায় কি না।'

'দেয়াল থেকে ওদের ওপর চোখ রাখব,' বলল সোহানা।

'মাথা নিচু রেখো।'

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ক্যাপের কানা কপালে টেনে নিয়ে

বিড়বিড় করল সোহানা, 'এরা কারা?' সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে গেল প্রাচীন দেয়ালের পাশে। উপরে একটা জায়গা ভেঙে গেছে, সাবধানে ওদিক দিয়ে চোখ রাখল।

চওড়া এক নালায় পৌঁছেছে শত্রুরা, আসছে রাইফেল হাতে।

সোহানাকে দেয়ালের মাথায় পিস্তল তুলতে দেখল রানা। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে সোহানা, ভাবল। যদি চায়, জাতীয় শুটিং কম্পিটিশনে নাম লেখালে মহিলাদের মাঝে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ওর জন্য কোনও কঠিন কাজ নয়।

নীচে থেকে বলল রানা, 'ওরা গুলি না করা পর্যন্ত নিজে গুলি কোরো না। এখনও জানে না আমরা কোথায়।' প্রবেশদ্বারের কাছে চলে গেল ও, একটু আগে তৈরি পাথরের নিচু বাধা ডিঙিয়ে এক দৌড়ে হাজির হলো কাছের গাছগুলোর পিছনে। ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে ছুটছে, পৌঁছল সমতল নালার পাশে। এদিক দিয়েই আসতে হবে লোকগুলোকে। লুকিয়ে পড়ল ঘন ঝোপে। সামান্য দূরেই পাকা চাতালের মত নালা। ওখানে সুবিধা করতে পারেনি গাছপালা।

বুকের কাছে রাইফেল ধরে দৌড়ে এল তারা, ভাব দেখে মনে হলো পিছু নিয়েছে লোভনীয় শিকারের। জানা নেই, প্রতিপক্ষের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে।

হাঁটু ভাঁজ করে ঝোপে বসে আছে রানা, অপেক্ষা করছে।

ওর ধারণা ছিল ওই দলে পনেরোজন, কিন্তু এবার দেখল বারোজন। পরনে খাকি প্যান্ট ও হাতকাটা শার্ট। ক'জনের হাতে বোল্ট অ্যাকশন হান্টিং রাইফেল। বহু দূরে লক্ষ্যভেদ করবে না ওগুলো। দু'লোকের হাতে শটগান, বোধহয় শিকারের কাজে ব্যবহার করে। দু'জনের কোমরে পিস্তলের হোলস্টার দেখা গেল। অন্যদের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। শেষেরগুলো চিনল রানা। আমেরিকান এআর-১৫এস। বোধহয় গৃহযুদ্ধের সময় এ দেশে

আনা হয়েছে।

কাছের লোকটার হাতে হান্টিং রাইফেল। ওটা কাঁধে তুলল সে, তাক করল সেনোটের উঁচু দেয়ালের উপর অংশে।

রানা বুঝল, সোহানাকে দেখতে পায়নি সে। আশা করছে, শত্রু একবার মাথা তুললেই গুলি করে উড়িয়ে দেবে মাথাটা।

একটা গাছের পাশে থামল এক লোক, হাতে পিস্তল। গলা উঁচিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'আমরা জানি ওখানে আছ! বেরিয়ে এসো! নইলে খুন হয়ে যাবে!'

টিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে গলা ছাড়ল রানা, 'আমরা কোনও ক্ষতি করিনি তোমাদের! চলে যাও!'

দলের তিনজন পিছনে ঘুরে চাইল। তাদের একজন অস্ত্র হাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, গুলি করতে তৈরি।

প্রথম লোকটা আবারও বলল, 'তোমরা এমনি এমনি যাওয়ার লোক নও! বেরিয়ে এসো! তোমাদেরকে দূরে দিয়ে আসব!'

ওই কণ্ঠে ওদের জন্য দুঃসংবাদ আছে, টের পেল রানা। এরা ধরেই নিয়েছে, খুবই সহজে ধরবে শিকার। বিদেশী দম্পতি, কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই— এবার যাবে কই! হয়তো ঠিক করে ফেলেছে, মুক্তিপণ হিসাবে ওদের আত্মীয়দের কাছে কত চাইবে। টাকা পেলেও ছাড়বে না জিম্মিদেরকে, মেরে ফেলবে নির্ঘাত।

কাছের লোকটার বুকে পিস্তল তাক করল রানা।

ওই লোক দেয়ালের মাথার দিকে নিশানা করেছে রাইফেল। ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই বুঝি দেখা দিল শত্রু।

তাদের দলের নেতা নীরবে ইশারা করল, সবাইকে যেতে বলছে দেয়ালের দিকে।

ঝোপের আড়াল নিয়ে পিছু নিল রানা। শত্রুরা প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে গেলেই বাধা দেবে।

কাছের লোকটা কেন যেন ঝট্ করে ঘুরল। রাইফেল তুলেছে

কাঁধে।

সরাসরি তার বুকে গুলি করল রানা, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোপের ওদিকের নিচু জমিতে।

ধুপ্ করে সমতল নালায় পড়ল গুলি খাওয়া লোকটা, মৃত।

তাকে পড়তে দেখেছে অন্যরা। ভাল করেই জানে, কোন্‌দিকে তাক করেছিল অস্ত্র। দেরি না করেই অচেনা শত্রুর উদ্দেশে গুলি পাঠাল তারা। মাত্র দু'জন ঠিক দিকে গুলি করল। রানার ঝোপে ঢুকল অন্তত গোটা দশেক বুলেট।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে রানা দেখল, পড়ে গেছে আরেকজন। এর হাতে এআর-১৫এস রাইফেল ছিল। এরা যখন আন্দাজে গুলি পাঠাতে ব্যস্ত, তাদের দলের সেরা বলে যাকে মনে হয়েছে, তাকে শিকার করেছে সোহানা।

দলের নেতা এক দৌড়ে লাশের কাছে পৌঁছে রাইফেল ও গুলির ব্যাগ তুলে নিয়ে সরে গেল। প্রাচীরের মাথা লক্ষ্য করে তাক করল রাইফেল।

কিন্তু নিচু হয়ে অপেক্ষা করছে সোহানা। ভাল করেই জানে, একবার ওকে দেখতে পেলেই গুলি শুরু করবে শত্রুরা।

ওদিকে নতুন এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে রানা।

এক লোক রাইফেল হাতে রওনা হয়েছে ওর ঝোপের দিকে। জানতে চায় কোথায় পড়ে আছে রানার লাশ। আর যদি ও আহত হয়ে থাকে, খতম করে দেবে। ঝোপে ঢুকে শুকনো ডাল ভেঙে খুব কাছে পৌঁছে গেল সে।

পায়ের শব্দ অনুযায়ী তিনটে গুলি পাঠাল রানা।

'বুম্!' করে উঠল লোকটার রাইফেল। পরক্ষণে ধড়াস্ করে নীচে পড়ার আওয়াজ।

পিস্তল হাতে ক্রল শুরু করল রানা। পৌঁছে গেল শত্রুর পাশে। গুলিতে ফুটো হয়েছে লোকটার কপাল।

রাইফেলটা নিল রানা, বোল্ট টেনে প্রস্তুত রাখল। চলে এল ঝোপের কিনারায়, ডালপালার মাঝ দিয়ে বের করল মাযল।

প্রাচীরের পাশে পৌঁছে গেছে এক শটগানধারী।

তার দিকে রাইফেল তাক করেই ট্রিগার টিপল রানা।

রানার তৈরি দেয়ালের এদিকে পড়ল লাশটা।

আবারও বোল্ট টেনে অস্ত্র তৈরি রাখল রানা, খুঁজতে শুরু করেছে নতুন টার্গেট। একটা গাছ বেয়ে উঠছে স্কোপ ফিট করা রাইফেল কাঁধে এক লোক। মগডালে একবার উঠতে পারলে অনায়াসেই খতম করবে সোহানাকে।

রাইফেল তাক করেই গুলি পাঠাল রানা।

শিথিল হয়ে গেল লোকটা, গাছের পনেরো ফুট উপর থেকে ধপ্ করে মাটিতে পড়ল। সামান্যতম নড়ল না আর।

বোল্ট আবারও টেনে চেম্বারে শেষ গুলিটা ভরল রানা। লাশের পাশে আবারও ফিরল, কিন্তু তখনই বুঝল, ওকে দেখে ফেলেছে আরেক লোক। সময় নেই, ঘুরেই গুলি করল রানা। লোকটার পরিণতি দেখবার জন্য অপেক্ষা করল না, রাইফেল হাতে এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে। ওখানে থামল না, ঘুর পথে চলেছে প্রাচীরের দিকে। পিছনে পায়ের ধুপধাপ নেই। দৌড়ের ফাঁকে রাইফেলের বোল্ট বের করে নিল ও, ফেলে দিল ঘন ঝোপে। আরও এক শ' ফুট যাওয়ার পর আরেক ঝোপে ফেলল রাইফেল। কমল না দৌড়ের গতি।

প্রবেশ পথের কাছে পৌঁছে সতর্ক হলো, পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল দুই দেয়ালের মাঝের ফাটলে। তখনই দেখল ক্রল করছে এক লোক, হাতে শটগান। এবার উঠে দাঁড়িয়ে শেষ করবে সোহানাকে।

দেরি না করেই পিস্তল ব্যবহার করল রানা, গুলি বিঁধল লোকটার ঘাড়ে। মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লাশ। ওই

একই সময়ে 'বিং!' আওয়াজ তুলে রানার পাশের দেয়ালে লাগল বুলেট। আরেকটু হলে উড়িয়ে নিত ওর কান।

চমকে সরে গেছে রানা, এক পলক আগে যেখানে ছিল সেখানে এসে লাগল এআর-১৫এস রাইফেলের কমপক্ষে পনেরোটা বুলেট। নানাদিকে ছিটকে গেল পাথরের কুচি। নিজের তৈরি দুই ফুটি দেয়াল এক লাফে পেরোল রানা, ঢুকে পড়ল ভিতরে। নিচু স্বরে বলল, 'সোহানা, আমি পৌঁছে গেছি।'

'ভয় লাগছিল কী হলো তোমার,' বলল সোহানা।

সিঁড়ি বেয়ে সঙ্গিনীর পাশে পৌঁছল রানা। সঙ্গে এনেছে পাম্প শটগান। বলল, 'ওরা বারোজন ছিল। এখন ছয়।'

'জানি,' বলল সোহানা। 'বোধহয় বুঝতে শুরু করেছে, এত সহজ হবে না আমাদের খুন করা।'

'আপাতত ভাল অবস্থানে আছি,' বলল রানা।

'তা বোধহয় নয়,' আস্তে করে মাথা নাড়ল সোহানা। 'শুরুর দিকে আরও লোক ছিল। তাদের দু'জন আবারও ফিরেছে জঙ্গলে। প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাকে শেষ করতে চায়, কিন্তু তা নয়, পিছনের ওই ঢালু টিলা বেয়ে ওদিকে গেছে। বোধহয় আরও লোক আনতে।'

'সেক্ষেত্রে দেরি করা ঠিক হবে না,' বলল রানা। 'ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে নিয়েই বেরিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, এ ছাড়া উপায় নেই। আশা করি ওদের ক্যাম্প দূরে।'

সোহানার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বন্দুকটা রাখল রানা। 'চারপাশে চোখ রেখো। কেউ রেঞ্জে এলেই গুলি করবে।'

আবারও নেমে এল রানা, গুছিয়ে নিতে চাইল দরকারী জিনিস। পড়ে রইল ডাইভিং গিয়ার ও তাঁবু। বাড়তি গুলি রাখল ব্যাকপ্যাকে। বাদ পড়ল না ম্যাচেটি ও আর্টিফ্যাক্ট। দেয়ালের পিছনে উঠে এসে তুলে নিল বন্দুক। 'ঠিক আছে, চট্ করে জঙ্গলে

গিয়ে ঢুকবে। অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। চারদিক দেখে নিয়ে...' থেমে গেল রানা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সোহানার মুখ। 'কী হলো, সোহানা?'

দূরের টিলার দিকে আঙুল তাক করল সোহানা। সন্ধ্যার আবছা আলোয় দেখা গেল, এক সারিতে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে একদল লোক। সবার কাঁধে রাইফেল বা বন্দুক।

'এখন আর ছয়জন নয়, ওরা কমপক্ষে ছত্রিশজন,' বলল সোহানা, 'গুলির আওয়াজ পেয়েই এসেছে। অথবা, ওদের কাছে রেডিয়ো আছে। এই এলাকা এতই দুর্গম, অনায়াসেই বেতার ব্যবহার করতে পারবে। কে-ই বা শুনবে ওরা কী বলছে!'

'ভেবেছিলাম এ সুযোগে সরে যাব,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'খারাপ লাগছে।'

'কীসের জন্যে?'

'ভুল করে ফেলেছি তোমাকে সঙ্গে করে এনে।'

চট্ করে রানার গালে চুমু দিল সোহানা। 'সত্যি বলব? তুমি একটা পাগল! আর তোমার কিছু হলে আমি নিজেই তো বাঁচতে চাইব না! ...আর মনে পড়ে গেল মৌমাছিদের কথা।'

'ওদের আবার কী?'

'কেউ মধুর লোভে চাকে হামলা করলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হারতেই হয় মৌমাছিদের। কিন্তু যে আসে, তাকে বুঝিয়ে দেয়: না এলেই ভাল করত। তোমাকে চিনি সৈনিক মৌমাছি হিসেবে, আর সেজন্য অন্তর থেকে শ্রদ্ধাও করি। আমার কথা ভাবতে হবে না তোমাকে, এসো দেখি দু'জন মিলে কী করতে পারি।'

মাথা দোলাল রানা, 'বেশ!'

'প্রতিটা ম্যাগাযিন ভরে নেব, ভুলব না শটগানের কথাও,' বলল সোহানা।

'ঠিক আছে,' আস্তে করে ঠোঁট দিয়ে সোহানার গাল স্পর্শ

করল রানা, তারপর নেমে এল নীচে। একটু আগে গুলিতে মৃত লোকটার ব্যাগ নিয়ে সরে গেল নিরাপদ জায়গায়। খুলল ওটা, ভিতরে এক বাক্স কার্তুজ। আরও কিছু ফালতু জিনিস— পানির ক্যান্টিন, তেল-চিটচিটে হ্যাট, বাড়তি পুরনো পোশাক, একটা বোতলে সামান্য উইস্কি। নিজের তৈরি দেয়ালের কাছে থামল রানা। ওটার উপর জড় করল শুকনো ডাল। দরকার পড়লে জ্বেলে দেবে আগুন।

সেনোটেয় ডাইভ দেয়ার সময় যে শক্তিশালী আণ্ডারওয়াটার ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করেছে, ওটা নিয়ে উপরের করিডোরে সোহানার পাশে পৌঁছে গেল। পরখ করল দু'জনের পিস্তলের ম্যাগাযিন ভরা কি না। অন্য বাড়তি দশটা ম্যাগাযিনও বাদ পড়ল না। খালি হয়ে যাওয়া দুটোও ভরে নিল। কাজ শেষে জানতে চাইল, 'কাউকে দেখলে?'

'না,' বলল সোহানা। 'ওরা এখনও পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে। মনে হয় পুরো আঁধার নামার পর হামলা করবে।'

'আমি হলেও তা-ই করতাম,' বলল রানা।

'কীভাবে ঠেকাবে ঠিক করেছ?'

'একটা কৌশলের কথা ভাবছি।'

তখনই ওদের এক গজ দূরের দেয়ালে এসে লাগল কমপক্ষে বারোটা গুলি।

'নাহ্, অনেক দেরি হয়ে গেছে,' একটু হতাশা সোহানার কণ্ঠে। 'ওরা চাইছে যাতে মাথা নিচু রাখি। আর সেই সুযোগে ছুটে এসে শেষ করতে পারে।'

শটগান হাতে নীচের মেঝেতে নেমে এল রানা, থামল ওর তৈরি নিচু পাথুরে দেয়ালের কাছে। একটু আগে এখানেই স্তূপ করে রেখে গেছে ডাল। ঠিক তখনই ঝড়ের গতিতে প্রবেশদ্বারে ঢুকল দুই লোক, পরক্ষণে উল্টে পড়ল লাশ হয়ে। তৃতীয়বারের

মত শটগান পাম্প করল রানা, এক লাফে বাঁধ পেরিয়ে গিয়ে কুড়িয়ে নিল দুই লাশের একজনের অস্ত্র। আবারও ফিরল আগের জায়গায়।

অস্ত্রটা খাটো ব্যারেলের সাবমেশিনগান ইনগ্রাম-১০। এক যুগ আগে তৈরি করেছে কোম্পানি, তবে ঠিকই কাজ করবে।

সামান্যতম মৃত্যু-ভয় পাত্তা না দিয়েই ছুটে এল এক লোক। পুরো তৈরি ছিল রানা, ব্যবহার করল শটগান। বিক্ষত লাশ ফেলে পিছিয়ে এল কয়েক পা। টের পেল, প্রাচীরের উপরে বার কয়েক টাশ্ টাশ্ আওয়াজে গর্জে উঠেছে পিস্তল। মুখ তুলে দেখল, ঝপ্ করে বসে পড়েছে সোহানা। ও যেখানে ছিল, সেখানে লাগল গোটা ত্রিশেক গুলি। কুঁজো হয়ে এক দৌড়ে দশ ফুট দূরে গিয়ে থামল সোহানা।

প্রাচীরের পাশে উঠে উঁকি দিল রানা। সেনোটেয় হামলা করতে ছুটে আসছে চার আততায়ী। কিন্তু তারা দশ গজ দূরে পৌঁছে যেতেই সাবমেশিনগান ব্যবহার করে ব্রাশ ফায়ার করল রানা। উপর থেকে গুলি করেছে, পরিষ্কার দেখল ঝাঁঝরা হয়েছে লোকগুলোর বুক। কিন্তু খুলে গেছে ওর অস্ত্রের ব্রিচ, আর গুলি নেই। তুমুল বৃষ্টির মত বুলেট লাগছে দেয়ালের ওদিকে। ওয়াকওয়েতে চুপ করে বসে অপেক্ষা করল ও। প্রায় আধমিনিট পর থামল শত্রুপক্ষের বুলেট-বৃষ্টি। থমথম করছে চারপাশ।

'ক'জন?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সোহানা।

'সাতজন বোধহয়।'

'আমি মাত্র দু'জন,' বলল সোহানা। 'তোমার ওই নতুন কৌশল কী? ফুরিয়ে আসছে আমাদের অ্যামিউনিশন।'

'অপেক্ষা করো,' বলে নীচের মেঝেতে নেমে এল রানা। দরজার ফাটলের কাছে গিয়ে উঁকি দিল। দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ফিরে এসে নিচু বাঁধ টপকে ওটার উপর নতুন করে গুছিয়ে নিল

শুকনো ডাল। তার উপর ঢালল উইস্কি, তারপর ম্যাচ জ্বেলে ধরিয়ে দিল আগুন। ভালভাবে জ্বলে উঠেছে উইস্কিখোর ডাল। শটগান হাতে অপেক্ষা করল রানা। বাইরের দিকে তাক করেছে অস্ত্র। লকলক করে আকাশ চাটতে চাইছে কমলা আগুন। ওখান থেকে জ্বলন্ত চার খণ্ড ডাল নিল ও, বাঁধের এপাশ থেকে গায়ের জোরে প্রথম ডাল ছুঁড়ল দূরে। এরপর একে একে অন্য তিন ডাল। দেরি না করেই উঠে এল ওয়াকওয়েতে। তখনই উঁচু দেয়ালের ওপাশে মাথা খুঁড়ল কমপক্ষে তিরিশটা বুলেট।

সতর্ক হয়ে একটা একটা করে গুলি করছে সোহানা। বসে পড়ে সরে যাচ্ছে দূরে। 'তিন,' রানাকে জানিয়ে দিল।

'গুড!'

'তোমার কৌশল কই গেল... সর্বনাশ!' রানার কাঁধের পিছনে দেয়ালের ওপাশ দেখছে সোহানা।

শটগান হাতে ঝট্ করে ঘুরল রানা, বিস্মিত হয়ে দেখল ওর তৈরি ডালের মশাল জঙ্গলে জ্বেলে দিয়েছে লেলিহান আগুন। চড়-চড় আওয়াজে ফাটছে শুকনো ডাল ও ঝোপ। তিন সেকেণ্ড পর বসে পড়ল রানা। শতখানেক গুলি বিঁধল দেয়ালের ওদিকে। মাথার উপর দিয়ে গেল বেশ কিছু বুলেট।

দাউ-দাউ আগুন লকলক করে আসছে সেনোটের দিকে। গুলির ঝড় থেমে গেল, চারপাশে শুধু নীরবতা। তারপর শোনা গেল স্প্যানিশ ভাষায় চেঁচামেচি। এক দৌড়ে নেমে এল রানা, অবশিষ্ট তিন জ্বলন্ত ডাল তুলে নিয়ে আবারও উঠে এল ওয়াকওয়েতে। সোহানার পাশে থেমে গায়ের জোরে ডালগুলো পাঠিয়ে দিল দেয়াল পার করে অনেক দূরে।

'কী করো?' বলল সোহানা। 'ওরা তো ওদিকে!'

'আলো, সেই সঙ্গে দরকার একটু সময়, তাই এই ব্যবস্থা,' বলল রানা।

'এতে কী লাভ?'

'লুকিয়ে থাকতে না পেরে বেরিয়ে আসবে আলোয়।'

মৃদু হাসল সোহানা, সেনোটের দেয়ালের উল্টোদিক দেখিয়ে দিল। 'ওদিকটা কাভার করো।'

তার আগেই রওনা হয়ে গেছে রানা, পৌঁছে গেল একটু দূরের দেয়ালের পিছনে। অপেক্ষা করছে। দু'জনই ওরা প্রস্তুত। এবার আসুক শত্রুরা, পাখির মত তাদেরকে শেষ করবে ওরা।

কিন্তু একজনও বেরোল না খোলা জায়গায়।

'কিছুক্ষণের জন্যে পিছিয়ে গেছে,' রানাকে বলল সোহানা।

ফিরে এসে ওর পাশে ওয়াকওয়েতে বসল রানা। পরবর্তী কয়েক মিনিট পর পর উঠে চোখ রাখল চারপাশে। চওড়া নালার পাশের গাছ ও ঝোপঝাড় পুড়ছে, কিন্তু আগুন ধরেনি মূল জঙ্গলে। মাটিতে চাপা পড়া প্রাচীন বাড়ি বা পিরামিডগুলো যথেষ্ট দূরে।

কিছুক্ষণ পর ছয়টি নালা দেখে নিয়ে বলল রানা, 'চাঁদ ডুবে গেছে। যে-কোনও সময়ে আসবে। আরও বেড়েছে সংখ্যায়।'

'কিন্তু এরা কারা, কেনই বা আমাদের খুন করতে চাইছে,' আনমনে বলল সোহানা।

পকেট হাতড়ে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কয়টা গুলি আছে, সোহানা?'

'একুশটা। প্রতিটা পিস্তলে আটটা করে। এ ছাড়া আরেকটা ম্যাগাযিনে পাঁচটা।'

'আমার ষোলোটা বুলেট। শটগানের কার্তুজ সাতটা।'

রানার কাঁধে মাথা রাখল সোহানা। 'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু বিদায়ের সময় বুঝি ঘনিয়ে এল।'

'মনে হয় না,' বলল রানা।

'কেন মনে হয় না?' জানতে চাইল সোহানা।

'ওটা সাধারণ সেনোটের মত নয়।'

'তাতে কী?'

'তুমি নিজেই তো দেখেছ, ওখানে মৃদু স্রোত আছে। একদিকে সরে গিয়েছিল সব আর্টিফ্যাক্ট। আমরা সেনোটেয় নেমে ওদিকেই যাব। এই সিঙ্ক হোলের নীচে পাতাল নদী আছে।'

'এত বড় ঝুঁকি নেবে? যদি পানির নীচে আটকা পড়ি? শ্বাস আটকে...'

'এখানে রয়ে গেলেও তো মরতেই হবে। বাঁচতে দেবে না এরা। তার চেয়ে বাঁচার চেষ্টা করে ডুবে মরাও ভাল।'

দেয়ালের উপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে চাইল সোহানা। 'নিভে আসছে আগুন। দূরে নড়াচড়া চলছে। দেরি করলে নেমে যাওয়ার সময় পাব না।'

হাতে হাত রেখে নীচে নেমে এল ওরা, পোশাক ছেড়ে পরে নিল ডাইভিং গিয়ার। নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে আর্টিফ্যাক্টের ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ নিল রানা, ওটার মুখ খুলে বলল, 'পিস্তল, ফোন, পার্স, মানিব্যাগ আর গুলি সব এখানে রাখো।'

সব জড় করে সোহানা ব্যাগে পুরে দেয়ায় ওটার মুখ আটকে দিল রানা। দুটো করে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, গেঞ্জি ও জুতো নেটের ব্যাগে রাখল। নিজের নেটের ব্যাগে জিন্স প্যান্ট ও গেঞ্জি পুরল সোহানা। পানিতে নামিয়ে দিল ওরা ব্যাগ।

'আগুনের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাটাই ভাল ছিল না?' দ্বিধা নিয়ে বলল সোহানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা অনেক।'

দ্বিতীয়বার মুখ খুলল না সোহানা, ফ্ল্যাশলাইট হাতে নেমে পড়ল সেনোটেয়।

কিনারা থেকে নামবার আগে রানা বলল, 'এত বড় ঝুঁকি নিতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে, সোহানা। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই।'

রানা নেমে আসতেই বলল সোহানা, 'তুমি বলছ, সিঙ্ক হোলে নামলে কোথাও না কোথাও ওঠা যাবে?'

'যদি যথেষ্ট বাতাস থাকে ট্যাঙ্কে। আর যদি ওঠা যায় ঠিক জায়গায়। ভেসে উঠতে পঁচিশ মিনিট মত সময় পাব আমরা।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহানা।

তখনই দরজার ফাটল দিয়ে এল কমপক্ষে বিশটা গুলি। দেয়াল থেকে ছিটকে নানাদিকে গেল পাথরের কুচি।

চট্‌ করে সোহানার ঠোঁটে চুমু দিয়েই পরক্ষণে ডাইভিং মাস্ক পরে নিল রানা, মুখে আটকে নিয়েছে মাউথপিস। সোহানার পর পর নেমে গেল সেনোটেয়।

ষোলো ফুট নীচে পৌঁছে টের পেল টেনে নিয়ে চলেছে হালকা স্রোত।

নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক মৃত্যু কানের কাছে ফিসফিস করছে, কিন্তু কিছুই পাত্তা না দিয়ে চলল ওরা পাতাল-নদী পেরোতে।

বারো

আঁধার পানিতে স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটছে রানা-সোহানা। এক শ' ফুট যাওয়ার পর মনে হলো, সেনোটের কিনারা থেকে ওদের ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখবে না কেউ।

বাটন টিপে আলো জ্বেলে নেয়ার পর বাড়ল চলার গতি। কিছুক্ষণ পর ঢুকে পড়ল ওরা পাতাল নদীর স্রোতে।

ছাত পর্যন্ত পানি, বাতাসের কোনও পকেট নেই। চাইলেই ভেসে উঠতে পারবে না ওরা।

শুরুর দিকে বিশ ফুট চওড়া ছিল গুহা পথ, এরপর তা হয়ে উঠল আরও চওড়া। গভীরতা হলো চল্লিশ ফুট।

কিন্তু বারবার সরু হয়ে এল পানি ভরা পাতাল করিডোর।

প্রতিবার রানা-সোহানার মনে হলো, আটকা পড়েছে ইঁদুরের খাঁচায়।

একই গতি বজায় রেখে সাঁতরে চলেছে ওরা। পিছন থেকে সহায়তা করছে স্রোত। সামনে আলো ফেলছে। কিন্তু প্রতিবার একই দৃশ্য দেখছে। একের পর এক বাঁক পেরিয়ে বহু দূরে চলে গেছে পানি ভরা টানেল।

রানার মনে হলো, এটা পাথরের বুকে সামান্য কোনও ফাটলও হতে পারে। এসব এলাকায় ভূমিকম্পে এমন হয়, কিছুদূর গিয়ে হয়তো দেখবে চওড়া গুহা সরু হতে হতে ছয় ইঞ্চিতে দাঁড়িয়েছে!

সেক্ষেত্রে ফেঁসে যাবে ওরা। না সামনে যেতে পারবে; না পিছনে; বাতাসের অভাবে মরবে দু'জন।

সাঁতারের ফাঁকে বারবার ঘড়ি দেখছে রানা।

গতকাল সকালে একবার ডুব দিয়েছে, তখন পনেরো মিনিট নীচে ছিল। অর্থাৎ, অ্যালিউমিনিয়াম ট্যাঙ্কে পঁচিশ মিনিটের বাতাস থাকবার কথা। তার মানে, প্রথম বারো মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারলে ভাল, নইলে উচিত হবে ফিরতি পথ ধরা। সেক্ষেত্রে আবারও উঠতে পারবে সেনোটের মুখ দিয়ে।

কিন্তু তখনও হয়তো ওদের জন্য ডাঙায় অপেক্ষা করবে আততায়ীরা। এটা নিশ্চিত, চট্ করে সরে যাবে না লোকগুলো।

অন্তরের কাছে জানতে চাইল রানা: আচ্ছা, পাতাল নদীতে শ্বাস আটকে মরলে ভাল, নাকি ডাঙায় উঠতে গিয়ে মরলে? যে পথেই চলুক, শেষে হয়তো মরতেই হবে। দেখা যাক।

তেরো মিনিট পর রানা বুঝল, চাইলেও হয়তো আর ফিরতে

পারবে না ওরা, তার আগেই ফুরিয়ে যাবে বাতাস।

পনেরো মিনিট পেরোবার পর সিদ্ধান্তে এল রানা।

আর বড়জোর দশ মিনিট চলবে ট্যাঙ্কের অক্সিজেনে।

কে জানে, হয়তো বেশি আশা করছে ও।

একই গতিতে চলেছে ওরা, খরচ করেছে বেশিরভাগ বাতাস।

নিশ্চয়তা নেই যে আগামী পাঁচ মিনিটে উঠতে পারবে নতুন কোনও কূপে।

আরেকটা চিন্তা এল রানার মনে।

ওজনে ওর চেয়ে অনেক কম সোহানা, খরচ করেছে কম অক্সিজেন। আকারেও ছোট, যদি দুটো ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে, বাঁচবার দ্বিগুণ সুযোগ পাবে ও।

সব হিসাব শেষ রানার। পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলতে চাইল ট্যাঙ্ক। এবার বন্ধ করবে ভালভ, ট্যাঙ্ক ধরিয়ে দেবে সোহানার হাতে, তারপর এক পলক দেরি না করে ফিরতি পথে চলবে মৃত্যু মেনে নিয়ে।

কিন্তু ওর উপর চোখ রেখেছে সোহানা। খপ্ করে ধরল রানার কবজি।

ওর হাতের জোর দেখে অবাক হলো রানা।

ঘন ঘন মাথা নাড়ছে সোহানা।

ওর মত একই কথা ভাবছিল সোহানা, টের পেল রানা।

এদিকে সোহানা রানার কবজি শক্ত করে ধরতেই ফ্ল্যাশলাইটের আলো গিয়ে পড়েছে উপরে। ওখানে কী যেন খুব অস্বাভাবিক!

আলো অনুসরণ করে আবার উপরে চাইল রানা।

এতক্ষণ ছাতে গিয়ে আটকা পড়ছিল বুদ্বুদগুলো, কিন্তু এখন উপরে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে সব!

সোহানার হাত ধরে উপরে উঠতে লাগল রানা। একই সময়ে

ওরা ভেসে উঠল গম্বুজের মত এক জায়গায়।

দশ ফুট উপরে লাইমস্টোনের ছাত।

মুখ থেকে মাউথপিস সরাল রানা, সাবধানে বুকে টেনে নিল সামান্য বাতাস। তিন সেকেণ্ড পর বলল, 'বাতাস তাজা!'

'তাই তো দেখছি,' বলল সোহানা। রানার মত একই সময়ে খুলেছে মাউথপিস। 'ভয় ছিল আগ্নেয়গিরির কার্বন মোনোক্সাইড বা হাইড্রোজেন সালফাইড থাকতে পারে বাতাসে।'

'মিষ্টি বাতাস,' বলল রানা।

'কিন্তু কোথা থেকে আসছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'বাতিটা নিভিয়ে দিলে হয়তো বাইরের আলো দেখব।'

চেষ্টা করে দেখল ওরা, কিন্তু কোনওদিকে আলো নেই, শুধু ঘুটঘুটে আঁধার। আবারও ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ওরা।

'আরও কিছুক্ষণ বাতাস পাব, তাই বা কম কী,' বলল রানা। 'স্রোতের সঙ্গে গিয়ে দেখা যাক কোথায় যাই।'

আবারও রওনা হলো ওরা।

নেমে এল না ছাত।

বাতাস মিষ্টি।

একটু পর বলল রানা, 'বুঝতে পেরেছি এই জায়গাটা কী।'

'তাই?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ। বৃষ্টির সময় পাথুরে ফাটল দিয়ে নীচে আসে সেনোটের পানি, এই পাতাল নদীতে এসে মেশে। বৃষ্টির মৌসুমে পুরো টইটম্বুর থাকে। কিন্তু শুকনো মৌসুমে কমে যায় পানি, তৈরি করে ভ্যাকিউম, আর টান খেয়ে ফাটল দিয়ে ভেতরে ঢোকে বাতাস।'

'হতে পারে,' বলল সোহানা।

সামনের দিক দেখাল রানা। 'যতটা পারা যায় এই বাতাস ব্যবহার করব। বাধ্য না হলে ব্যবহার করব না ডাইভিং ট্যাঙ্ক।'

'একটা কথা গেঁথে নাও মগজে,' হঠাৎ কড়া সুরে বলল

সোহানা, 'আবার যদি দেখি চিট্ করতে চাইছ, তার ফল কিন্তু ভাল হবে না।'

'চিট্? আমি?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'সব জানি আমি!' রাগী সুরে বলল সোহানা, চোখ গরম করল। 'আবারও যদি দেখেছি...'

বুঝে গেছে রানা। 'আহ্-হা, আমি শুধু যৌক্তিক...'

'ব্যস, যথেষ্ট শুনেছি! যদি দেখি আমার জন্যে প্রাণ দিতে চাইছ, আমি নিজেই মরে দেখাব যে-কেউ মরতে পারে! তোমার মৃত্যুর বিনিময়ে আমি বাঁচতে চাইব, ভাবলে কী করে!'

'আসলে...' শুরু করেছিল রানা। আরেক ধমকে থেমে গেল।

'তোমার একটু লজ্জাও করে না, একটা মেয়েকে এই বিপদে ফেলে স্বার্থপরের মত নিজে মরার কথা ভাবো?'

'যাব্বাবা!' বিড়বিড় করল রানা।

আঁকাবাঁকা টানেলে চলেছে ওরা। পুরো একঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর সামনে দেখা গেল পানির নীচে নেমে গেছে ছাত। শেষ মাথায় পৌঁছে ডাইভিং গিয়ার ব্যবহার করবার আগে বেকায়দা ভঙ্গিতে পরস্পরকে চুমু দিল ওরা। ফলে রানার চুমু লাগল সোহানার নাকে, আর সোহানার ঠোঁট স্পর্শ করল রানার চিবুকের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে।

'লোকটা যদি দাড়িও কাটত!' বিরক্ত হয়ে বলল সোহানা। 'খবরদার! আর কোনও চালাকি নয়! যদি বাঁচি, একসঙ্গে বাঁচব, নইলে মরব একসঙ্গেই।'

মাস্ক ও মাউথপিস পরে নিয়ে ডুব দিল সোহানা।

পাশে রানা।

সোহানার ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে দেখা গেল দীর্ঘ করিডোরের মত নদীখাত। আগেও এমনই ছিল এই পাতাল পুরী।

একবার সোহানার মনে হলো, চট্ করে দেখে নেবে ঘড়ি।

জানবে, আর কতক্ষণ বাতাস পাবে ওরা। ওই বাতাসের পকেটে পৌঁছবার সময় দেখেছে, আগে পেরিয়ে এসেছে ষোলো মিনিট। ওর মন বলল, সত্যিই কি আর নয় মিনিট চলবে এই ট্যাঙ্কের বাতাসে? তারপর? কোথাও যদি উঠতে না-ই পারে ওরা? ভাল ছিল না রানাকে ওর ট্যাঙ্ক দিয়ে দিলে? কিন্তু রানাই বা নেবে কেন?

চুপচাপ রানার পাশে সাঁতরে চলেছে সোহানা।

পল পল করে পেরিয়ে চলেছে মুহূর্ত। তারপর করিডোর গিয়ে পড়ল চওড়া এক জায়গায়। নদীর মেঝে বড় এবড়োখেবড়ো। পড়ে আছে পাথরের বড় বড় বোল্ডার। এমন ছিল না আগে। এক সেকেণ্ড পর সোহানা টের পেল, এসব দেখছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে নয়, বাইরের আলোয়। ওই আলো আসছে উপর থেকে। রানার কবজি ধরে উপরে রওনা হয়ে গেল ও। আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মৃদু আলো। চট্ করে রানার দিকে চাইল। জবাবে ডলফিনের মত কয়েকটা বড় বুদ্বুদ উপরে পাঠিয়ে দিল রানা। বুঝতে পেরেছে।

পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ভেসে উঠল দু'জন, হাসছে। জায়গাটা গম্বুজের মতই, আর মাথার অনেকটা উপরে ছাতে গোল গর্ত। ওখান থেকে আসছে হাজার খানেক নক্ষত্রের আলো। নদীর মাঝে উঠেছে ওরা, কিন্তু ওই গম্বুজের ছাতের গর্তের কিনারা ওদের হাতের নাগালের বাইরে।

'এবার?' রানার দিকে চাইল সোহানা। 'উঠতে পারব না তো!'

'এক চক্কর কেটে আসি, অপেক্ষা করো,' বলল রানা। মাস্ক পরে আবারও ডুব দিল। কিছুক্ষণ পর উঠে এল।

সোহানা জানতে চাইল, 'এবার কী?'

নদীর মাঝে বড় কয়েকটা পাথরের উপর দাঁড়িয়েছে রানা।

ওর পাশে পৌঁছে গেল সোহানা।

ঠাঁই পেয়ে যাওয়ায় পানির উপর ওদের কোমর।

'কোনও এক সময়ে ছাতের মস্ত সব পাথর পড়েছিল নদীতে,' বলল রানা। 'তখনই ওই গর্ত তৈরি হয়েছে।'

'কিন্তু বেরোবে কী করে?' কাজের কথায় এল সোহানা।

গম্বুজের গর্ত দেখল রানা। 'বেরোতে পারব, কিন্তু খাটুনি আছে। ভারী পাথর টানার জন্যে তৈরি হয়ে যাও।'

এক মিনিট পর ডাইভ দিল ওরা। নেমে এল নদীর মেঝেতে। পাথরের টুকরো জড় করে আবারও নিল বড় এক বোল্ডারের পাশে, ওটার উপর তুলে রাখল হাতের পাথর। উপরের গর্তের ঠিক নীচে তৈরি করতে শুরু করেছে স্তূপ।

কিছুক্ষণ পর পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক খুলে ফেলল ওরা, তার অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে ভাল্‌ভ্‌। বড় একটা পাথরের উপর ট্যাঙ্ক রেখে শুরু করেছে ফ্রি ডাইভ। ছোট-বড় সব পাথর জমছে বলে ধীরে ধীরে গর্তের দিকে উঠছে স্তূপ। রানা-সোহানা বিশ্রাম নিচ্ছে না বললেই চলে। তবুও কখনও কখনও কিছুক্ষণের জন্য থামতেই হচ্ছে।

পাথরের উঁচু জায়গা তৈরি হওয়ার পর থামবে। কিন্তু একটু পর ভেসে উঠল দু'জন।

'আর পাথর নেই,' হতাশ শোনাল সোহানার কণ্ঠ।

'এবার ট্যাঙ্কের শেষ বাতাসটুকু ব্যবহার করে পাথর আনতে হবে,' বলল রানা। 'আরও অন্তত কয়েক ফুট উপরে তুলতে হবে পাথরের সিঁড়ি।'

'এ ছাড়া উপায়ও নেই,' সায় দিল সোহানা।

আবারও ট্যাঙ্ক পরে নিল ওরা, সাঁতরে সরে গেল দূরে। নীচে হয়তো পাথর পাবে।

পেলও, সবই লাইমস্টোন। কোনও সময়ে পড়েছিল ছাত

থেকে। স্তূপ আরও উঁচু না করে পাশেই জড় করতে লাগল পাথর। পরে তুলে রাখবে স্তূপের উপর। দু'জনই জানে, ফুরিয়ে এসেছে ট্যাঙ্কের অক্সিজেন। আরও কয়েক মিনিট পর ভেসে উঠল রানা, পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলল ট্যাঙ্ক। এক মিনিট পর সোহানাও খুলে ফেলল ওর ট্যাঙ্ক।

'আর বাতাস নেই, না?' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহানা।

'ঠিক আছে, আগে যা এনেছি, সেগুলো পাথরের স্তূপের ওপর রাখি,' বলল রানা। মাঝারি একটা পাথর তুলল ও। একই কাজ করছে সোহানা।

ধৈর্য ও যত্নের কাজ।

নদীর উপরে উঠে এসেছে ওদের তৈরি নড়বড়ে মঞ্চ।

পাথর স্থির রাখতে ট্যাঙ্কগুলো ব্যবহার করল রানা।

আরও কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে থামল ওরা।

চুপ করে বসল স্তূপের উপর।

রানা বলল, 'ব্যস, যথেষ্ট।'

'উঠতে তো পারব না।'

'কাঁধে তোমাকে তুলে নেব, সেনোটের কিনারা ধরবে। তুমি উঠে গেলে পরে ভেবে দেখব কী করা যায়।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল সোহানা।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পা দুটো সামান্য ভাঁজ করল, আস্তে করে ওর হাঁটুর উপর উঠল সোহানা। তারপর কাঁধে। উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে সোহানার গোড়ালি। কয়েক সেকেণ্ড পর ঝাঁকি খেয়ে রানা বুঝল, দুই হাতে সেনোটের কিনারা ধরতে চাইছে সোহানা। পাথরে খ্যাস-খ্যাস আওয়াজ, কিন্তু খামচে ধরতে পারছে না কিছুই।

'আমার হাতের তালুর ওপর পা রাখো,' বলল রানা। দুই

কনুই ভাঁজ করে কাঁধের একটু উপরে তুলল।

নীচে চেয়ে নিয়ে ডান পা রানার তালুর উপর রাখল সোহানা, তারপর বাম পা।

'এবার চেষ্টা করে দেখো,' বলল রানা। নীরবে বহন করছে সোহানাকে। উপরের দিকে তুলে দিল দুই হাত, সোজা করছে কনুই। আরও দু' সেকেণ্ড পর সেনোটের বাইরে বেরিয়ে গেল সোহানার বুক। একটু দূরেই এক ঝাড় ঘন ঝোপ। ভালভাবে পাথরে আটকে নিয়েছে শেকড়। এক সেকেণ্ড পর খপ্ করে মোটা দুটো শেকড় ধরল সোহানা, টেনে হিঁচড়ে নিজেকে তুলে নিল পাথরের চাতালে।

'বেরিয়ে এসেছি,' কিনারা থেকে বলল সোহানা।

'শুনে খুশি হলাম,' হাসল রানা, 'মাঝে মাঝে দেখা করে যেয়ো। আর সপ্তাহে দু' সপ্তাহে একটা দুটো স্যাণ্ডউইচ ফেলতেও ভুল কোরো না।'

'হ্যাঁ, খুব হাসির কথা,' গম্ভীর হয়ে গেল সোহানা। 'এবার দড়ি পাই কোথায়?'

'আমার ওয়েট সুট ব্যবহার করব,' বলল রানা। 'ওটা ফালি করে ছুঁড়ে দেব ওপরে। তার আগে বড় কোনও পাথর খোঁজো। যেন নিতে পারে আমার ওজন।'

'দেখছি।'

সেনোটের কিনারা থেকে সরে গেছে সোহানা।

ডাইভ সুট খুলে কাজে নামল রানা। বেল্ট থেকে ছোরা নিয়ে কাটতে শুরু করল নিয়োপ্রেন সুট। অল্পক্ষণেই বেশ কিছু ফালি করে পাকিয়ে গিঁঠ দিয়ে তৈরি করে ফেলল দড়ি।

সেনোটের কিনারা থেকে উঁকি দিল সোহানা। 'তোমার দড়ি দাও, একটু দূরেই মোটা গাছ।'

'নাও,' বলল রানা। দু'হাতে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ মাথার উপর

তুলে পাক্কা বাস্কেট বল প্লেয়ারের মত লাফ দিয়ে উপরে পাঠিয়ে দিল ব্যাগ। এবার বেঁধে নিল বেল্টে নিয়োপ্রেন দড়ি, নিচু স্বরে বলল, 'তুমি রেডি তো?'

'হ্যাঁ, রেডি,' বলল সোহানা।

বারকয়েক ফিতার দড়ি দুলিয়ে নিল রানা, তারপর ছুঁড়ে দিল সোহানার দিকে।

খপ্ করে দড়ি গুচ্ছের শেষ অংশ ধরল সোহানা। 'পেয়েছি,' বলে চলে গেল আরেক দিকে। তিরিশ সেকেণ্ড পর আবারও হাজির হলো কিনারায়। ওর হাতে ডাইভ নাইফ দেখল রানা। 'আরও দড়ি লাগবে। একটু অপেক্ষা করো।'

পাঁচ মিনিট পর সোহানার চাঁদ মুখ দেখল রানা।

'বেঁধে দিয়েছি, এবার উঠে এসো।'

দু'হাতে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে রানা। কিন্তু এক ফুট উঠতেই আবারও নেমে এল। লম্বা হয়ে গেছে নিয়োপ্রেন তন্তু। ওজন নিচ্ছে না বলে আবারও পাথরের মঞ্চে নেমে এসেছে রানা। অবশ্য ওজন নিতে গিয়ে টানটান হয়ে উঠেছে সব ফালি। মনে হলো আর ঢিল হবে না। হলোও না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় অনায়াসেই উঠে পড়ল রানা সেনোটের পারে। হাঁচড়ে-পাছড়ে উঠে এল উপরে। গড়ান দিয়ে চিত হয়ে দেখল আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র। এক সেকেণ্ড পর দেখল সোহানাকে। চোখ বিস্ফারিত হলো রানার। পরক্ষণে বলল, 'তোমার সুট তো দারুণ, খুবই ভাল লাগছে এই সুন্দর পোশাকে।'

'তুমি নিজেও তো ন্যাংটো খোকা!' লজ্জা পেয়ে সরে গেল দিগম্বর সোহানা। 'খবরদার, আমার দিকে তাকাবে না!' ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ থেকে পোশাক বের করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। জিন্সের প্যান্ট ও গেঞ্জি পরতে লাগল মাত্র আধ মিনিট। পুরো সময় একদৃষ্টে চেয়ে থাকল নির্লজ্জ রানা। ওর দিকে থ্রি কোয়ার্টার

প্যান্ট ও গেঞ্জি ছুঁড়ে দিল সোহানা। 'হয়েছে, এবার ওঠো, পোশাক পরে নাও, কোনও গ্রাম বা শহরে যেতে হবে।'

তারার আলোয় প্রথমবারের মত চারপাশে চাইল সোহানা।

সবুজ পাতা ভরা তিন ধরনের গাছে ভরে আছে চারদিক।

যত দূরে চোখ যায়, শুধু ওসব জাতের গাছের সারি।

'আমরা আছি দুনিয়ার সব চেয়ে বড় গাঁজা, কোকা আর পপি চাষের খামারে,' মন্তব্য করল রানা, 'মস্ত কোনও ড্রাগ লর্ডের আঙিনায়।'

তেরো

গভীর মনোযোগে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি আর্কাইভ রুমে মায়ান কোডেক্সের তৃতীয় পাতার গ্লিফ ডিসাইফার করছেন বাঙালি প্রফেসর আক্তার রশিদ। আগেও দেখেছেন প্রথম দুটো গ্লিফের কলাম। অন্য কোডেক্স এবং অন্যসব আর্কিয়োলজিকাল সাইটের লিখিত ভাষায় এগুলো ছিল। আট শ' একষট্টি গ্লিফের বাইরের কিছু নয় এসব। কিন্তু প্রথম পাতায় পেয়েছেন নতুন দুটো গ্লিফ, আগে কখনও দেখা যায়নি ওগুলো। বহু পুরনো ভাষা, কখনও কখনও বাধ্য হয়েই আঁচ করে নিতে হবে কী লেখা হয়েছে। এমন কী ইংরেজিতেও এমন অনেক শব্দ আছে। হয়তো কোনও কারণে একবার ব্যবহার করা হয়েছে। আর তারপর দুই শতাব্দী ধরে তর্ক করেছেন ভাষাবিদরা।

রঙিন কোডেক্সের একটু উপরে বাতিওয়ালা ম্যাগনিফায়ার, ওটার ওপর ঝুঁকে আছেন ডক্টর রশিদ। প্রতিটি পাতার ছবি

নিয়েছেন, তবে কোনও গ্লিফ নিয়ে সন্দেহ থাকলে বুদ্ধির কাজ খুব কাছ থেকে মূল জিনিস লক্ষ্য করা। খেয়াল করতে হবে ব্রাশের আঁচড়ে ওই পদ, শব্দ বা বাক্য কীভাবে লেখা হয়েছে। হতে পারে, এই দুই গ্লিফ ধার নেয়া হয়েছে অন্য কোনও মায়ান ভাষা থেকে। বা ব্যবহার করা হয়েছে ঐতিহাসিক কোনও চরিত্রের নাম, অথবা একই লোকের দুটো আলাদা বিশেষণ। এমনও হতে পারে, তাঁরই পরিচিত কোনও বিষয় ওটা, কিন্তু এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সেজন্যেই বুঝতে পারছেন না।

গভীর মনোযোগে গ্লিফের দিকে চেয়ে আছেন প্রফেসর, তাই বেমক্কাভাবে চমকে গেলেন দরজায় জোর শব্দ শুনে। একবার মন চাইল ধমকে উঠবেন: 'অ্যাই, যাও তো এখান থেকে!' কিন্তু সামলে নিলেন নিজেকে। ভুললে চলবে না তিনি এই দালানে অতিথি। উঠে গিয়ে খুললেন দরজা।

সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর জিম ক্রিশ্চান। তিনি অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ভাইস চ্যান্সেলার। পিছনে সুট পরনে ক'জন লোক। খুবই চটপটে মানুষ ক্রিশ্চান, সত্যিকারের এগযেকিউটিভ। চ্যান্সেলার ব্যস্ত থাকেন পাবলিক রিলেশন্স ও ফাণ্ড জোগাড় করতে, কাজেই ক্রিশ্চানই আসলে নিয়ন্ত্রণ করেন গোটা ক্যাম্পাস। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে একেবারে ধসে গেছেন ভদ্রলোক।

'হ্যালো, ক্রিশ্চান,' হাসলেন রশিদ। 'আসুন। এই মাত্র...'

'দরজা খোলার জন্যে ধন্যবাদ, প্রফেসর,' বললেন ভাইস চ্যান্সেলার। চোখের কাতর দৃষ্টি যেন বুঝিয়ে দিল, দয়া করে সতর্ক থাকুন।

ডক্টর রশিদ বুঝলেন, ক্রিশ্চানের সঙ্গের ওই লোকগুলোর কারণেই আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

জিম ক্রিশ্চান বললেন, 'পরিচয় করিয়ে দিই: ইনি রিপাবলিক

অভ মেক্সিকোর সংস্কৃতি মন্ত্রী কার্লোস হুয়ের্তা, সঙ্গে তাঁর ডেপুটি মিনিস্টার রাউল সান্তেয। আর ইনি এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট মিল্টেন ওয়েলস, সঙ্গে ইউএস কাস্টমসের টম লেইটন।'

পরিচয় দেয়ায় ফেডারাল আইডেন্টিফিকেশন ব্যাজ দেখাল দুই এজেন্ট।

'আসুন,' দরজা থেকে পিছিয়ে এলেন ডক্টর রশিদ। ঝড়ের গতিতে ভাবতে শুরু করেছেন। জিম ক্রিশ্চানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ভাল, কিন্তু এইমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন: সাবধানে এড়িয়ে যেতে হবে আইনের প্যাঁচ, নইলে মস্ত বিপদে পড়বেন, সেই সঙ্গে ফেঁসে যাবে ইউনিভার্সিটি।

মেক্সিকোর সংস্কৃতি মন্ত্রী কার্লোস হুয়ের্তার নাম আগেও শুনেছেন ডক্টর রশিদ, কাজেই হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যাণ্ডশেকের জন্য। 'সেনর হুয়ের্তা, খুশি হলাম পরিচিত হয়ে। আপনি নীল জেড পাথরের ওপর যে-লেখা প্রকাশ করেছেন, ওটা থেকে জরুরি অনেক তথ্য পেয়ে উপকৃত হয়েছি।'

'ধন্যবাদ,' হ্যাণ্ডশেক করে বললেন সেনর হুয়ের্তা। লম্বা লোক তিনি, সরু পিলারের মত। ব্যাকব্রাশ চুল। পরনে অত্যন্ত দামি ধূসর সুট ও চকচকে কালো শু্য।

পুরনো পোশাকে নিজেকে সামান্য এক মাছিমারা কেরানি মনে হলো ডক্টর রশিদের। খেয়াল করলেন, একটুও হাসলেন না মন্ত্রী।

'চিপাসের কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করতেই সরাসরি মেক্সিকো সিটি থেকে এখানে এসেছি,' বললেন হুয়ের্তা। দেখলেন টেবিলে খোলা মায়ান কোডেক্স। গবেষণা করছিলেন প্রফেসর রশিদ। 'ওটাই কি মায়ান কোডেক্স?' জবাবের জন্য অপেক্ষা করলেন না মন্ত্রী, 'ওটাই পাওয়া গেছে ভালকান টাকানার মন্দির থেকে?'

'জী,' বিনয়ের সঙ্গে বললেন রশিদ। 'লুকিয়ে রাখা হয়েছিল

ক্লাসিক আমলের এক হাঁড়ির ভেতরে। যাঁরা পেয়েছেন, সরিয়ে এনেছেন এখানে। নইলে জিনিসটা ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতে নষ্ট হতো। চুরিরও সম্ভাবনা ছিল। চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হয়েছে কয়েকবার। বাধ্য হয়েই এখানে এনেছেন তাঁরা। হাঁড়ি খোলার পর জানা গেছে ভেতরে কোডেক্স আছে। আপনার যদি সময় থাকে, আমরা ওই মন্দির বা কোডেক্স সম্পর্কে আলাপ করতে পারি।'

এক পা পিছিয়ে গেলেন হুয়ের্তা, ঘুরে চাইলেন এফবিআই ও কাস্টমস এজেন্টের দিকে। কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'না, সে সময় আমার হাতে নেই। আপাতত যা শুনলাম, তা-ই যথেষ্ট।'

ডক্টর রশিদ সত্য বলবেন ভেবে নিয়েই যেন অপেক্ষা করছিল দুই আইনী সংগঠনের এজেন্ট। সামনে বেড়ে চলে গেল তারা টেবিলের কাছে।

এক পলকে ডক্টর রশিদ বুঝলেন, এইমাত্র স্বীকার করে নিয়েছেন কোডেক্স এসেছে মেক্সিকো থেকে! এখন যা-ই বলুন, তার কোনও মূল্য নেই!

তবুও জিনিসটা নিজের কাছে রাখতে মুখ খুললেন: 'দয়া করে আমার কথা শুনুন, জেন্টলমেন! এ কোডেক্স ছিল ক্লাসিক সময়ের একটি হাঁড়ির ভেতরে। এক মায়ান রাজপুত লুকিয়ে রাখতে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই মন্দির চাপা পড়েছিল লাভার নীচে, ফলে ঢাকা পড়ে সব। গত মাসে ওটা বেরিয়ে আসে ভূমিকম্পে। তখন জাতীয় বিপর্যয়ের সময়ে মানবতামূলক সেবা কাজে ব্যস্ত ছিলেন দু'জন বাঙালি। ওই হাঁড়ি তাঁরাই আবিষ্কার করেন, কিন্তু কোনও আর্টিফ্যাক্টের লোভে ওখানে যাননি। তাঁরা যা করেছেন, তা করেছেন শুধু জিনিসগুলোকে রক্ষা করতে।'

স্পেশাল এজেন্ট মিল্টেন ওয়েলস বলল, 'নিশ্চয়ই জানেন আন্তর্জাতিক আইন? এসব ক্ষেত্রে দেরি না করেই সংশ্লিষ্ট দেশের

সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, সরানো চলে না কোনও আর্টিফ্যাক্ট।'

'জী, আইন জানি। কিন্তু তখন হাঁড়ি বা কোডেক্স কেড়ে নিতে চেয়েছিল একদল চোর। আবিষ্কারকারীরা সরিয়ে না ফেললে আজ ওই কোডেক্স উঠত চোরাই মার্কেটে। তাঁদের কারণেই...'

'আর এখন মেক্সিকো সরকারের তরফ থেকে কোডেক্সের সব দায়িত্ব বুঝে নেব আইনী কারণেই,' বললেন মিনিস্টার হুয়ের্তা। 'আপনার কোনও দায় থাকছে না কোডেক্সের বিষয়ে।'

'গবেষণা মাত্র শুরু করেছি, নিশ্চয়ই এখনই কোডেক্স নেবেন না?' নিজেকে পাগল-পাগল লাগল ডক্টর রশিদের। হায়, আল্লা, এত বড় সুযোগ পেয়েও হারাতে চলেছেন তিনি! এদের ক্ষমতা আছে বলেই কেড়ে নেবে মায়ান কোডেক্স? 'মাত্র দেখতে শুরু করেছি...'

'ছবি তুলেছেন ওটার?' জানতে চাইল কাস্টমসের লেইটন।

'কিছু ছবি তুলেছি,' স্বীকার করলেন রশিদ, 'তথ্য নিরাপদ রাখতে...'

'ওসব ছবি ফেরত দিতে হবে মেক্সিকান সরকারের কাছে,' বলল লেইটন। 'কোনও কপি রাখা চলবে না। ওসব কি আপনার ব্রিফকেসে?'

'অ্যাঁ... কেন?'

'সেক্ষেত্রে ফেডারাল আইন ভাঙার কারণে এক্ষুনি আপনাকে গ্রেফতার করব,' বলল স্পেশাল এজেন্ট ওয়েলস। 'আপনি কি ধরে নিয়েছিলেন ওই কোডেক্স আপনার? ওটা পাওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত ছিল। এটা মস্ত বড় অপরাধ।'

'কিন্তু...' থেমে গেলেন ডক্টর রশিদ, পরক্ষণে বললেন, 'মেক্সিকোয় বহুবার এক্সকেভেশনে গেছি, কখনও আইন ভাঙিনি। এবার যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি এটা, তাঁরা খুব তাড়াহুড়োর

ভেতরে ছিলেন। তাই... নইলে কখনও তাঁরা...'

এফবিআই এজেন্ট কঠোর স্বরে বলল, 'নিজেই সব বুঝিয়ে দেবেন, না সার্চ করব এ ঘর? সেক্ষেত্রে হয়তো হাজতে পচতে হবে আপনাকে।'

টেবিলের উপর ব্রিফকেস, ওটা খুললেন ডক্টর আক্তার রশিদ, নয় ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চির পুরু এনভেলপ বের করলেন। ভিতরে বেশ কিছু ছবি। করুণ চোখে চাইলেন ভাইস চ্যান্সেলারের দিকে। তাঁর মনে হলো অসুস্থ বোধ করছেন জিম ক্রিশ্চান। 'স্যর...'

'দুঃখিত, প্রফেসর। আমাকে ব্যাখ্যা করে আইন জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটির লিগাল স্টাফ। যে-দেশে কোডেক্স পাওয়া গেছে, ওই জিনিস তাদেরই। অফিশিয়াল অনুরোধ আসার পর কিছুই করার ছিল না।'

এনভেলপের ছবি চট্ করে দেখে নিল এফবিআই এজেন্ট, এবার তুলে নিল প্রফেসর রশিদের ব্রিফকেস। বলল, 'আপনার ল্যাপটপ কমপিউটারটাও দিতে হবে।' ওটা চালু অবস্থায় রয়েছে কোডেক্সের পাশে।

'কেন?' জানতে চাইলেন আক্তার রশিদ। 'ওটা তো মেক্সিকান সরকারের নয়!'

এফবিআই এজেন্ট ওয়েলস শান্ত স্বরে বলল, 'আমাদের টেকনিশিয়ানদের হার্ড ডিস্ক দেখা শেষ হয়ে গেলেই ওটা আপনাকে ফেরত দেয়া হবে।' কড়া চোখে বাঙালি প্রফেসরের দিকে চেয়ে রইল। অনুভূতিহীন দৃষ্টি। সন্দেহজনক কাউকে ওই চোখে দেখে পুলিশ। 'কয়েকটা কথা মাথায় গেঁথে নিন, প্রফেসর। যদি ওটার ড্রাইভে এমন কিছু পাওয়া যায়, যে কারণে প্রমাণ হয় আপনি মেক্সিকান কোডেক্স বিক্রি করতে চেয়েছেন, লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন, বা কোথাও সরিয়ে ফেলতে চেয়েছেন—সেক্ষেত্রে এখনই আপনার উচিত ভাল উকিল ঠিক করা। নিশ্চয়ই

জানেন, ভাইস চ্যান্সেলার আপনাকে ইউনিভার্সিটির উকিল দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না? নিজের পক্ষে লড়তে ব্যক্তিগত উকিল নিয়োগ করতে হবে আপনার।'

ডক্টর রশিদের চোখে চোখ রাখতে পারলেন না ভাইস চ্যান্সেলার।

অসহায়ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর রশিদ।

সরিয়ে নেয়া হলো কোডেক্স, তাঁর সব নোট, ফোটোগ্রাফ ও ল্যাপটপ কমপিউটার। মেক্সিকান দুই কর্তৃপক্ষের দিকে ফিরলেন রশিদ। 'মিনিস্টার হুয়ের্তা, সেনর সান্তেয... প্লিয, আমার কথা শুনুন! আমরা কোনও অপরাধ করিনি। কোনও অন্যায় করিনি। যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই কোডেক্স রক্ষা করেছেন, তাঁরাও কোনও ভুল করেননি। গ্রামের মেয়রকে সবই বলেছেন। তাঁদের কথা শুনেই দুনিয়া-সেরা সব স্কলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তাঁদের ভেতরে মেক্সিকোর স্কলাররাও আছেন।'

সংস্কৃতি মন্ত্রী সহজ স্বরে বললেন, 'নিশ্চয়ই জানেন, যা করেছেন সেজন্য পুরস্কার বা শাস্তি, কোনওটাই দেয়ার ক্ষমতা মেক্সিকান সরকার বা আমার নেই? আপনারা যা করেছেন, তাতে কর্তৃপক্ষের যা করার ছিল, শুধু তাই করেছে। ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে যে-দেশের কোডেক্স, সে দেশে। মেক্সিকোর জিনিস এ দেশে নিয়ে এসে রক্ষা করার চেষ্টা ভাল চোখে দেখছি না আমরা।' আক্তার রশিদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন মন্ত্রী। পিছু নিলেন তাঁর ডেপুটি সেনর সান্তেয।

তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর অস্বস্তির ভিতর পড়ল এফবিআই এজেন্ট ও কাস্টম্স্ অফিশিয়াল। মাত্র এক মিনিটে সব প্যাকিং শেষে বেরিয়ে গেল তারাও। ঘরে রয়ে গেলেন প্রফেসর আক্তার রশিদ ও ভাইস চ্যান্সেলার জিম ক্রিশ্চান।

'সরি, রশিদ,' নরম স্বরে বললেন ভাইস চ্যান্সেলার,

'ইউনিভার্সিটির কিছুই করার ছিল না। আমরা শুধু আইন অনুযায়ী চলেছি। দরকার পড়লে আদালতে শপথ করে বলব, আপনার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। এবং জেনে বুঝে কোনও আইনও ভাঙেননি। তবে এফবিআই এজেন্ট যা বলে গেল, তা মনে রাখাই বোধহয় ভাল।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমার উচিত উকিল নিয়োগ করা?'

কয়েক সেকেণ্ড পর কাঁধ ঝাঁকালেন ভাইস চ্যান্সেলার। 'প্রথম আদালত আপনার পক্ষে রায় না দিলে, পরের আদালত আগের সিদ্ধান্ত পাল্টে দেবে, তা খুব কমই হয়।'

লাইব্রেরি দালানের বাইরে কালো একটি লিংকন টাউন কারে চেপে রওনা হয়ে গেল অফিশিয়ালরা। একটু পর স্যান ডিয়েগো ফ্রিওয়েতে উঠে চলল দক্ষিণে, স্যান ডিয়েগো ডাউন টাউনের দিকে। ফ্রিওয়ে ধরে পৌঁছে গেল বালবোয়া পার্কের একধিটে। ঢুকল গিয়ে স্যান ডিয়েগো চিড়িয়াখানার বিশাল পার্কিং লটে। সাধারণ মানুষ যেদিকে গাড়ি রাখে, সেদিক এড়িয়ে চলেছে লিংকন গাড়ি, কিছুক্ষণ পর থামল দ্বিতীয় এক কালো গাড়ির পাশে। ওই গাড়ি অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। দুই গাড়ি পাশাপাশি হতেই দুই ড্রাইভার নামিয়ে দিল পিছনের জানালার কাঁচ।

অপেক্ষারত গাড়ির পিছনের সিট থেকে অত্যন্ত ধনী পরিবারের শিক্ষিত এক ব্রিটিশ মহিলা বলল, 'আশা করি সবই ঠিকঠাক চলেছে?'

'জী, ম্যাম,' বলল স্পেশাল এজেন্ট মিল্টেন ওয়েলস। বড়সড় ব্রিফকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমে উঠে পড়ল অন্য গাড়ির পিছন সিটে। এলেনা হিউবার্টের পাশে রাখল ব্রিফকেস। ডালা খুলতেই

দেখা গেল সাদা প্লাস্টিকের মোড়কের ভিতর শুয়ে আছে মায়ান কোডেক্স।

'বাদ পড়েনি তো কিছু? ওই লোকের ফোটো, নোট... সবই এখানে?'

'জী, ম্যাম,' বলল মিল্টেন। 'আমাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত ছিল কর্তৃপক্ষ। গটমট করে গিয়ে ডক্টর রশিদের ঘরে ঢুকতেই মনে হলো কুড়াল পড়েছে তার ঘাড়ে। তেমন কোনও তর্ক না জুড়েই দিয়ে দিয়েছে সব। ধরেই নিয়েছে আগেই আমাদের বিষয়ে খোঁজ নিয়েছে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ।'

'খোঁজ না নেয়ার কোনও কারণ নেই,' মৃদু হাসল এলেনা, 'নিশ্চয়ই নিয়েছে। তবে আপনাদেরকে দেয়া আইডেণ্টিফিকেশন কার্ডের নাম সত্যিকারের অফিশিয়ালদেরই।' ব্রিফকেসের ভিতরে চোখ রাখল সে। 'সবই এখানে?'

'না,' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মিল্টেন, পাশের গাড়ির সিট থেকে ল্যাপটপ কমপিউটার নিয়ে ধরিয়ে দিল মেয়েটির হাতে। 'এটা ওই লোকের। আর কিছু নেই।'

'সেক্ষেত্রে রওনা হোন, এই যে আপনাদের টিকেট।' এয়ারলাইনের চারটে টিকেট ধরিয়ে দিল এলেনা লোকটার হাতে। 'এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার আগেই নষ্ট করবেন নকল আইডি কার্ড। আগামীকাল সকালে খুশি করে দেব। বিশেষ বোনাস পৌঁছে যাবে আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।'

'ধন্যবাদ,' বলল নকল এফবিআই এজেন্ট।

'জানতে ইচ্ছে করছে না কত দেব?'

'না, ম্যাম। আপনি বলেছেন খুশি করবেন। আপনার বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও কারণ কখনও ঘটেনি। আর সন্তুষ্ট না হলেও তো বাড়তি টাকা আপনি দেবেন না।'

হাসল এলেনা, নিয়মিত ডেণ্টিস্ট দিয়ে সাদা করে নেয়া দাঁত

ঝিকঝিক করে উঠল। 'আপনার সত্যিই বুদ্ধি আছে। আমাদের কোম্পানির সঙ্গে লেগে থাকুন, কিছুদিনের ভেতর বড়লোক হয়ে যাবেন।'

'আমারও তাই ইচ্ছে,' বলল সে। ঘুরে উঠে পড়ল পাশের গাড়ির পিছন সিটে, আস্তে করে মাথা দোলাল ড্রাইভারের উদ্দেশে। রওনা হয়ে গেল কালো গাড়ি।

পিছন থেকে চেয়ে রইল এলেনা হিউবার্ট। গাড়িটা দূরে গিয়ে মিলিয়ে যেতে আটকে নিল ব্রিফকেসের ল্যাচ, নামিয়ে রাখল ওটা মেঝেতে। আনমনে হাসল। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে ওর গাড়ি। এলেনার মন চাইল গলা ফাটিয়ে হাসবে, ফোনে ক'জন বন্ধুকে জানাবে, দারুণ চালাকি করে জিতে গেছে। সত্যিই পেয়ে গেছে মায়াদের বই! এমন এক অতি দুর্লভ আর্টিফ্যাক্ট, যার মূল্য সত্যিই অকল্পনীয়! অথচ ওটা জোগাড় করতে গিয়ে খরচ হয়েছে অল্প কয়েকটা টাকা। আরে, মাঝারি মানের কোনও গাড়ি কিনলেও এর চেয়ে বেশি খরচ পড়ে! নকল আইডেণ্টিফিকেশন কার্ড, ব্যাজ, বিমানের টিকেট আর বোনাসের সব টাকায় বড়জোর দুটো মাঝারি মানের গাড়ি কেনা যেত।

আজ রাতে গুয়াতেমালা সিটি পৌঁছে সিকিউর ফোনে লণ্ডনে বাবার সঙ্গে কথা বলবে এলেনা। বোধহয় খুব অবাক হবেন ওর বাবা। ইউরোপিয়ান নয় এমন কোনও দেশের আর্ট বা কালচার নিয়ে সামান্যতম মাথা ঘামান না তিনি। শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য বর্ণের মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা: ওরা প্রায় বাঁদর! অবশ্য ওসব মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর কাছে টাকা এলে খুবই খুশি হন।

চোদ্দ

আঁধারে ভুট্টা গাছের মতই সার দিয়ে লাগানো রয়েছে গাঁজা, কোকা ও পপির গাছ, উচ্চতা স্বাভাবিক মানুষের বুক সমান। প্রতি সারি গাছের পাশ দিয়েই গেছে ফুটো করে দেয়া পাইপ, নিয়মিত পানিতে ভিজিয়ে দেয়া হয় শেকড়।

ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ থেকে স্নিকার নিয়ে পরল সোহানা। ব্যাগ থেকে বেরোল দুটো পিস্তল। একটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। অন্যটা গুঁজল ওয়েইস্ট ব্যাণ্ডে। গেঞ্জির নীচে ঢাকা পড়ল অস্ত্র। চাপা স্বরে বলল, 'বোঝা গেল, কারা মেরে ফেলতে চাইছিল আমাদের, এবং কেন।'

'হুঁ, নিয়মিত টহল দেয়, বাইরের কাউকে ড্রাগসের মাঠের কাছে দেখলেই হামলা করে,' বলল রানা।

'সালমার সঙ্গে কথা বলব,' জানাল সোহানা। স্যাটালাইট ফোন বের করেও রেখে দিল। 'আমার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে।' নিল রানার মোবাইল ফোন। 'যাহ্, এখন দেখছি তোমার ব্যাটারিও ডাউন।'

'আমার ব্যাটারি ফুল চার্জড্, চলো, আঁধার জঙ্গলে পরীক্ষা হয়ে যাক!' মুচকি হাসল রানা।

মুখ ঝামটা দিল সোহানা, 'যাও তো, খালি ইয়ে!'

'আর সালমা আলী কোনও সাহায্যে আসবে না, নিজেদেরই বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। মস্ত বিপদ হবে এরা দেখে ফেললে। সেনোটের ওই লোকগুলোর মতই খুন করতে চাইবে।'

রানার স্যাটালাইট ফোন ফিরিয়ে দিল সোহানা।

তখনই শোনা গেল দূরে ভারী ইঞ্জিনের আওয়াজ। একটু পর গর্জন আরও বাড়ল, সেই সঙ্গে কাবু স্প্রিঙের কিঁচকিঁচ আওয়াজ। বেআইনী ফসলের দুই মাঠের মাঝে ধুলোময়, সরু এক পথে আসছে ট্রাক।

বিপদ এড়াতে গাঁজার জঙ্গলে ঢুকল রানা ও সোহানা, সরে যেতে শুরু করেছে দূরে। অবশ্য খানিক যাওয়ার পর থামল ঘন এক ঝাড়ের পাশে। চোখ রাখল পথের ওপর।

ওদের কাছ থেকে দশ গজ দূরে, উঁচু জমিতে উঠে থামল ট্রাক। ক্যাবের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে নেমে এল মাঝবয়সী এক লোক। পরনে সাদা শার্ট, নীল জিন্সের প্যান্ট, পায়ে কাউবয় বুট। এক সারি গাছের পাশে থেমে বেছে নিল পছন্দমত গাছ, একটা পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরল। বার দুয়েক চিবিয়েই ফিরতি পথে রওনা হয়ে মাথা দোলাল। ওই ইশারার জন্য অপেক্ষা করছিল জনা বারো লোক। বস্তা হাতে ট্রাকের বেড থেকে নেমে পড়ল মাটিতে। গাছের সারির মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় কোকা পাতা, পপি ফুল ও গাঁজার পাতা ও ফুল তুলবে বস্তায়।

কাজে নেমে পড়ল তারা।

চোখের আড়ালে থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে রানা-সোহানা। একটু পর বাধ্য হয়ে সরে গেল আরেক খেতে। আর তখনই শুনল আরেকটি ইঞ্জিনের আওয়াজ। এদিকেই আসছে। এবারেরটা ট্র্যাক্টর, পিছনে ওয়্যাগন। ওটার উপর বসে আছে কয়েকজন। দ্বিতীয় খেতে পৌঁছে দেরি না করে নেমে এল ফসল তুলতে।

তারা কাজে ব্যস্ত, আর তাদেরকে এড়াতে গিয়ে ঘণ্টা খানেক এক খেত থেকে আরেক খেতে সরল রানা ও সোহানা। সঙ্গে সঙ্গে আসছে ট্রাক ও ট্র্যাক্টর, ভরে উঠছে ড্রাগসে।

একসময় কিছু গাছের সারির মাঝে থামল রানা ও সোহানা,

খেয়াল করল ট্রাক ও ট্র্যাক্টর পেরিয়ে গেছে ওদেরকে। চাষীরা এদিকে আসবার আগেই রওনা হয়ে গেল ওরা। ধূলিময় রাস্তা থেকে সরে খেতের সমান্তরালে চলেছে দূর থেকে দূরে। বেশ কিছুক্ষণ পর চলে এল জঙ্গুলে ঝোপঝাড়ের মাঝে।

ঝোপগুলো সাত থেকে দশ ফুট উঁচু।

'ইন্টারেস্টিং,' নিচু স্বরে বলল সোহানা। 'দেখতে ব্ল্যাকথর্নের মত, তাই না?'

'কিন্তু তা নয়,' বলল রানা। ছিঁড়ে নিয়েছে একটা পাতা। 'হাইব্রিড কোকা গাছ। প্রচুর পরিমাণে কোকেন দেবে।'

কোকা ঝাড় পেরিয়ে থমকে গেল ওরা। দূরে বার্নের মত দালান। সামনে অপেক্ষা করছে কমপক্ষে বিশটা ট্রাক। মাঠের মাঝ দিয়ে ঘুর পথে চলল ওরা, একটু পর গিয়ে পৌঁছুল দালানের পিছনে।

ট্রাক বহরের দিকে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল রানা, 'ওগুলোর একটায় উঠে রওনা হওয়া যায়।'

'পাহারায় অনেক গার্ড,' জবাবে বলল সোহানা।

এক জায়গায় একের পর এক বস্তা উজাড় করে কয়েক রকমের পেটি বাঁধছে ড্রাগের ফসল। রাইফেল হাতে কর্মীদের পাহারা দিচ্ছে গার্ডরা। কাঁধের স্লিঙে ঝুলছে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। পরিষ্কার দেখা গেল তিরিশ রাউণ্ডের বাঁকা ম্যাগাযিন।

'কর্মীদের ওপর চোখ রাখছে,' বলল রানা, 'ফসল চুরি করতে দেবে না।'

'এক কাজ করা যায়, পথে উঠে রওনা হতে পারি,' বলল সোহানা।

'উচিত হবে না,' বলল রানা। 'সেনোটেয় যারা খুন করতে চেয়েছে, তারা রাস্তার ওপরও চোখ রাখবে।'

'তার মানে, ট্রাক নিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে।'

'নিজেরা ড্রাইভ না করে উঠব গাঁজা, কোকা পাতা আর পপি ফুলে ভরা পেটির বেড়ে,' বলল রানা। 'ওদিকের কয়েকটা ট্রাকে মাল তোলা হয়ে গেছে।'

উঠান এড়িয়ে দূর দিয়ে চলল রানা-সোহানা। বড় সব গাছ ও ঝোপের আড়াল ব্যবহার করছে। সতর্ক চোখ উঠানে, ওখানে বাঁধা হচ্ছে ড্রাগসের পেটি। যে-কোনও সময়ে রাস্তা ধরে আসবে ট্রাক বা ট্র্যাক্টর, সেদিকেও খেয়াল রেখেছে ওরা।

দীর্ঘ লাইনের মত করে রাখা সব ট্রাক এড়িয়ে ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে চলেছে। বুঝে গেছে, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া কঠিনই হবে।

মাল ভরা প্রথম ট্রাকের সামনে এক প্রহরী। কুঁজো করেছে পিঠ, মনে হলো খুব ক্লান্ত এবং বিরক্ত। বাম কাঁধের স্লিং বুকের উপর দিয়ে গেছে ডানদিকে, কোমরের কাছে ঝুলছে রাইফেল। অস্ত্র তুলে গুলি করতে চাইলে কমপক্ষে লাগবে পাঁচ সেকেণ্ড।

ফিসফিস করে আলাপ করে নিল রানা ও সোহানা, তারপর রওনা হয়ে গেল। মাঝে দশ ফুট দূরত্ব। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাঁটছে নিঃশব্দে। দু'পাশ থেকে চলেছে গার্ডের দিকে। সোহানার হাতে পিস্তল।

ওকে প্রথমে দেখল গার্ড। অপরূপা এক মেয়ে জঙ্গলের ধারে! জিভে জল এসে গেল তার। কিন্তু তাকে বলে দেয়া হয়েছে, খুবই সতর্ক থাকতে হবে। বামহাতে স্লিং ধরল সে, ওটা মাথা গলিয়ে ছুটিয়ে নিল রাইফেল। অস্ত্র তুলতে শুরু করেছে সুন্দরীর দিকে। কিন্তু ততক্ষণে বামদিক থেকে হাজির হয়েছে রানা, দেরি না করেই পিস্তলের মাযল ঠেসে ধরল লোকটার মাথায়। তিন সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সোহানা, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল তার রাইফেল।

পিছন থেকে চোক হোল্ডে লোকটার ঘাড় ধরল রানা। রেহাই

পেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে গার্ড, দুই হাতে ধরল রানার হাত, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর একেবারেই নেতিয়ে গেল। রানা ছেড়ে দিতেই ধুপ করে মাটিতে পড়ল অচেতন দেহ।

ওরা দু'জন মিলে তার দুই গোড়ালি ধরে টেনে নিয়ে চলল জঙ্গলে। বড় এক ঝোপের ভিতর লুকিয়ে ফেলল। তার প্যান্ট খুলে নিজে পরে নিল রানা। মাথায় চাপিয়ে নিল স্ট্রর হ্যাট।

ওই সময়ে রাইফেল হাতে ট্রাক বহরের উপর চোখ রাখল সোহানা।

গার্ডের শার্ট খুলে ফালি ফালি করল রানা। দড়ির মত ব্যবহার করে বেঁধে দিল কবজি ও গোড়ালি। শেষ ফালি দিয়ে বাঁধল মুখ। বেল্ট ব্যবহার করে মোটা এক গাছের সঙ্গে শক্তভাবে বেঁধে দিল তাকে।

কাজ শেষে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রানার হাতে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। পরনে গার্ডের প্যান্ট ও হ্যাট। লাইন দিয়ে দাঁড়ানো ট্রাক বহরের সামনের দুটো ট্রাকে মাল ভরা হয়ে গেছে। প্রথম ট্রাক বেছে নিল ওরা, পাশ কাটিয়ে চলে গেল পিছনের বেডের কাছে। দেখে নিল চারপাশ। না, এদিকে কেউ নেই। মজুরদের পাহারা দিচ্ছে গার্ডরা।

কিন্তু হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন ঘুরে চাইল, হাত তুলে ইশারা করল রানার দিকে।

দুই ট্রাকের মাঝে সোহানা, ওকে চট্ করে দেখে নিল রানা। না, গার্ড জানে না ওরা এখানে দু'জন। নিচু স্বরে বলল, 'সোহানা, গার্ডরা আসতে পারে সেক্ষেত্রে এক দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকবে। পরে আসব আমি।' আগেই ট্রাকের পাশ থেকে পাল্টা ইশারা করেছে রানা, এবার সরে গিয়ে থামল মোটা এক গাছের সামনে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো জলবিয়োগে ব্যস্ত। চোখ রেখেছে গার্ডের উপর।

না, আসছে না লোকটা। আবারও ফিরেছে মজুরদের দিকে।

তবুও পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর আবারও ফিরতি পথ ধরল। থামল গিয়ে সামনের ট্রাকের পিছনে। দেরি না করে ট্রাকের পিছনে তুলে দিল সোহানাকে। নিজেও উঠল। পিছনের তারপুলিন সরিয়ে ক্রল করে ঢুকে পড়ল ড্রাগসের পেটির মাঝে। পিছনে ঠিক করে দিল তারপুলিন। দু'পাশে সাজিয়ে নিল বেশ কয়েকটা পেটি।

আধঘণ্টা পর পায়ের আওয়াজ পেল ওরা। হৈ-চৈ করছে গার্ডরা। ট্রাকে ড্রাগ্‌স্‌ তোলা শেষ। রানা ও সোহানা টের পেল, একটু ডেবে গেল ওদের ট্রাকের স্প্রিং। ড্রাইভিং সিটে উঠেছে এক লোক। ডানদিকে প্যাসেঞ্জার সিটে চাপল আরেকজন। দড়াম করে বন্ধ হলো দুই ধাতব দরজা। তিন সেকেণ্ড পর গর্জে উঠল ইঞ্জিন। খুবই ধীরে এগোতে শুরু করল ট্রাক। নুড়ি পাথরের রাস্তা ধরে চলেছে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনছে রানা। এক মিনিট পর সোহানার কানে কানে বলল, 'ওরা বোধহয় একেকবারে পাঁচটা করে ট্রাক ছাড়ছে।'

তিরিশ গজ গিয়ে আবার থামল ট্রাক।

তারপুলিন সামান্য উঁচু করে বামদিক দেখল সোহানা। 'একটা সাইনবোর্ডের পাশে থেমেছি আমরা।'

'পড়তে পারবে?'

'হ্যাঁ। এসতেনসিয়া মিগুয়েরো।'

হঠাৎ ট্রাকের চারপাশে ব্যস্ত হয়ে উঠল কারা যেন। উঠে আসছে বেড়ে। খপ করে রাইফেল ধরল রানা, কোমর থেকে হাতে উঠে এসেছে সোহানার পিস্তল। পিঠে পিঠ রেখে অপেক্ষা করল ওরা। ওদের মাত্র দু' ফুট দূরে তারপুলিনের দু'পাশে বসতে শুরু করেছে লোকগুলো। হাসছে, সেই সঙ্গে চলেছে গল্প।

ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে সামনে বাড়ল ড্রাইভার। গতি তুলছে।

গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। সেকেণ্ড গিয়ার ফেলা হলো। ওরা বুঝে গেল রওনা হয়েছে আরও কয়েকটি ট্রাক। থার্ড গিয়ার দেয়ার পর নিশ্চিত হলো, এখন আর থামবে না। পিছনের গেটের কাছেই ওরা। দু'পাশে এবং পিছনে ড্রাগসের পেটি।

অস্ত্র নামিয়ে রাখল ওরা, ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরস্পরের দিকে চাইল। আর কিছু করবার নেই, অপেক্ষা করতে হবে চুপচাপ।

গতি বাড়ছে ট্রাকের। এবড়োখেবড়ো নুড়ি পাথরের রাস্তায় নাচতে নাচতে চলেছে। স্প্যানিশ ভাষায় গল্প করছে কর্মীরা, খুশি যে আজকের কাজ শেষ।

দশ মিনিট পর ছোট এক গ্রামে থামল ট্রাক। নেমে গেল অর্ধেক লোক। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর গতি কমল ট্রাকের, পথে নামল আরও কয়েক কর্মী।

আরও দু'বার থামবার পর এগিয়ে চলল ট্রাক।

রানা ও সোহানা অপেক্ষা করল। আরও কিছুক্ষণ পর বুঝল ট্রাকের বেডে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। সাবধানে তারপুলিনের প্রান্ত তুলে চারপাশ দেখে নিল রানা। তিন সেকেণ্ড পর একই কাজ করল সোহানা। ফিসফিস করে বলল, 'সবাই গেছে তো?'

'ড্রাইভার আর ওর সঙ্গের লোকটা আছে, নইলে ট্রাক চালাবে কারা?' মৃদু হাসল রানা।

'ওরা থাকুক,' বলল সোহানা। 'এখানে যা ধুলো, আরেকটু হলে হাঁচি দিয়ে বসতাম।'

'এরা গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই নামতে হবে, নইলে খবর আছে,' বলল রানা। 'কাছের কোনও শহরে যাব।'

তারপুলিন সামান্য উঁচু করে চেয়ে রইল ওরা।

সরু, আঁকাবাঁকা এক পথে চলেছে ট্রাক। চারপাশে ঘন জঙ্গল। এটা কোনও উপত্যকা। মাঝে মাঝে গাছের চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো আকাশ। তাতে হরেক রঙে

জ্বলজ্বল করছে কোটি কোটি নক্ষত্র। কম-বেশি গতির কারণে ট্রাক বহরের মাঝে তৈরি হয়েছে অনেকটা দূরত্ব। বাঁক নেয়ার সময় দেখা যাচ্ছে আধ মাইল দূরে পিছনের ট্রাক।

সামনেই পড়ল খাড়াই পথ, সোজা উঠেছে পাহাড়ের বুক চিরে। পুরনো ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করছে, কমে আসছে গতি। নীচের গিয়ার ফেলল ড্রাইভার।

টেইল গেটে সোজা হয়ে বসে সামনের দিক দেখল সোহানা। 'একটু দূরে পাহাড়ের ওপর বোধহয় শহর।'

'ওখানে যাওয়ার আগেই নামতে হবে,' বলল রানা। 'তৈরি হয়ে নাও।' ট্রাকের ডানদিকের জঙ্গল দেখল। নুড়ি পাথরের পথের ধারেই নিচু ঝোপঝাড়, আশা করা যায় ওখানে শক্ত ডালের গাছ নেই।

প্রস্তুত হয়ে গেল দু'জন।

তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে খাড়া রাস্তা। সামনের দিক দেখতে হবে ড্রাইভারকে, এখন পিছনে তাকাবে না। আরও কমে এল ট্রাকের গতি।

'এবার!' বলেই ঝোপঝাড়ের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

ট্রাকের আরেক পাশ থেকে নামল সোহানা, ঝোপের মাঝে পড়েই গড়িয়ে দিল দেহ। থেমে গিয়ে দেখল ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে উঠছে ট্রাক। চূড়ার ওদিকে বড়সড় ক্রুশ। কোনও গির্জা। টিলার চূড়া পেরিয়ে ওদিকে হারিয়ে গেল ট্রাক।

মাটি ছাড়ল ওরা, জঙ্গলের মাঝ দিয়ে টিলার চূড়ার দিকে চলেছে। চট্ করে জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'তোমার পায়ে ওটা কী? রক্ত?' ঝুঁকে দেখল রানার বাম পা।

একবার দেখে নিয়ে বলল রানা, 'ঘষা লেগেছে। কোনও ব্যথা নেই।'

কিছুক্ষণ পর টিলার চূড়ায় উঠল ওরা। গির্জার এক পাশে

থেমে রানাকে বসিয়ে প্ায়ের ক্ষত পরীক্ষা করল সোহানা।

হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে গেছে রক্তে। কিন্তু শুকিয়ে আসছে এখন।

'সামান্য কেটেছে,' বলল রানা। 'সেরে যাবে।'

চোখ গরম করল সোহানা, ব্যাগ থেকে রুমাল নিয়ে বেঁধে দিল ক্ষতটা।

গির্জার ছায়া দেখে ওখানেই অপেক্ষা করল ওরা। একটু দূরে শহরের একমাত্র বড় রাস্তা। খানিক পর উঠে এল দ্বিতীয় ট্রাক। থামল না, বন্ধ এক রেস্তোরাঁ এবং কয়েকটি দোকান পাশ কাটিয়ে নেমে গেল উৎরাই বেয়ে। হারিয়ে গেল দূরের বাঁকে।

ওরা জানে, একের পর এক আসবে ট্রাক। এ শহর পেরিয়ে যাবে গন্তব্যের উদ্দেশে।

আড়াল থেকে বেরোল না ওরা।

প্রায় ভোর পর্যন্ত ওদের পাশ কাটিয়ে গেল ট্রাকের মিছিল। তারপর আর কোনও ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া গেল না।

একটু পর পুব আকাশে ফুটল ধূসর আলো।

খুলতে শুরু করেছে দোকানপাট।

গির্জার আঙিনা থেকে বেরিয়ে শহরে ঢুকল ওরা।

একটা দোকানের পাশে কাঠের চুলোয় আগুন জ্বেলেছে এক লোক। রুটি, কেক ইত্যাদি তৈরি করে। বাড়ি থেকে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ। মহিলারা ব্যস্ত ডিম সংগ্রহে, ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছে মুরগির খাবার। কেউ জ্বালছে চুলোয় আগুন।

'মারাত্মক খিদে লেগেছে,' বলল রানা।

'আমারও,' স্বীকার করল সোহানা। 'ব্যাগে না গুয়াতেমালান কেটযালেস আছে?'

'বোধহয় আছে, দেখছি।' ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ খুলল রানা। ঘাঁটতে শুরু করে পেয়ে গেল ওর মানিব্যাগ। 'গুড, টাকা আছে,

চলো দেখি নাস্তা জোগাড় করতে পারি কি না।'

দোকানের মালিকের দিকে চলল ওরা।

ওই লোক দেখেছে ওদেরকে, এ ছাড়া আরও দু'জন আসছে তার দোকান লক্ষ্য করে। একজনের পরনে কোঁচকানো সুট, অন্যজন যাজকের কালো কোট ও কলারে আস্ত দাঁড়কাক।

পৌঁছেই দোকানদারের সঙ্গে আলাপ জুড়েছেন যাজক। কিন্তু রানা ও সোহানা যেতেই ইংরেজিতে বললেন, 'গুড মর্নিং। আমি ফাদার দিয়েগো স্যান মার্টিন। আর ইনি ডক্টর কার্লোস প্যাডিয়ো, আমাদের শহরের একমাত্র ডাক্তার।'

এঁদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'আমি মাসুদ রানা, আর ইনি আমার স্ত্রী সোহানা চৌধুরী।'

চট্ করে একবার রানাকে দেখে নিয়ে বলল সোহানা, 'এত ভোরে যাজক এবং ডাক্তার, রাতে কেউ মারা গেছে?'

'না,' হাসলেন যাজক। 'একটু আগে একটা বাচ্চা হয়েছে। ওই পরিবার থেকে ডেকেছিল ব্যাপটাইয করতে। ডাক্তার আর আমি ভাবলাম নাস্তাটা সেরেই নিই। জেইম সালাযার আমাদের দেখেই নাস্তা তৈরি করছে। ...জানতে পারি, আপনারা হঠাৎ এ শহরে কেন?'

'কোব্যানের উত্তরে হাইকিং করছিলাম, কিন্তু হারিয়ে যাই জঙ্গলে,' অনায়াস মিথ্যা বলল রানা। 'বেশিরভাগ গিয়ার ফেলে আসতে হয়েছে। তারপর রাস্তা পেয়ে হাজির হয়েছি এই শহরে।'

'আমাদের সঙ্গে নাস্তা করুন?' আমন্ত্রণ জানালেন ডাক্তার কার্লোস প্যাডিয়ো।

'আমাদের কোনও আপত্তি নেই,' মৃদু হাসল সোহানা।

চেয়ারে বসে আলাপ করছে ওরা, এমন সময়ে দুই ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো বেকারের স্ত্রী, ব্যস্ত হয়ে উঠল রান্নার কাজে।

কিছুক্ষণ পর রানাদের সামনে নামিয়ে রাখল প্লেট ভরা টর্টিলা,

ভাত, কালো বিন, ভাজা-ডিম, কাঁচা পেঁপে, ফালি করা পনির ও ঘিয়ে ভাজা প্ল্যান্টিন (কাঁচকলা)।

এ এলাকা, পরিবেশ ও মানুষের বিষয়ে দু'চার কথা শেষে ফাদার দিয়েগো স্যান মার্টিন বললেন, 'আপনারা পাহাড়ি পথে চার্চের ওদিক থেকে এসেছেন?'

'জী,' বলল সোহানা।

'এসতেনসিয়া মিগুয়েরোয় থামেননি?'

দ্বিধা করে বলল সোহানা, 'ওখানে অতিথিকে বোধহয় ভাল চোখে দেখা হয় না।'

পরস্পরকে দেখলেন ডাক্তার এবং যাজক।

ডক্টর কার্লোস প্যাডিয়ো বললেন, 'ঠিকই জানেন আপনারা।'

রানা বলল, 'ওদিকটা দেখে এসেছি আমরা। তারা গুলি করছিল, ফলে বাধ্য হয়ে সব গিয়ার ফেলে আসতে হয়েছে।'

'শুনেছি আগেও এমন হয়েছে,' বললেন যাজক। 'আমাদের শহরের বদনাম হয়ে গেছে ওদের জন্যে।'

'বছর খানেক ধরে তাদের বিরুদ্ধে লড়ছি ফাদার আর আমি। প্রথমে চিঠি দিই ওই খামারের মালকিন ব্রিটিশ মেয়েটার কাছে। তার নাম এলেনা হিউবার্ট। ভেবেছিলাম জানলে চমকে যাবেঃ তার সম্পত্তির বিশাল এক অংশ জুড়ে ড্রাগসের খামার করা হয়েছে।'

সোহানাকে একবার দেখে নিয়ে বলল রানা, 'কী ব্যবস্থা নিল সেই মেয়ে?'

'মুখে বা চিঠিতে কিছুই জানাল না। তবে তার হয়ে আমাদেরকে ধমকে গেল স্থানীয় পুলিশের বড় কর্তা। তার সোজা কথাঃ আখের খেতের সঙ্গে গাঁজা, কোকা অথবা পপি গাছের তফাৎ চেনেন না? খামোকা আমাদের সময় নষ্ট করেন!'

'আপনারা ব্যক্তিগতভাবে মিস হিউবার্টকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'না, কখনও দেখিনি,' বললেন যাজক। 'থাকে গুয়াতেমালা সিটি, লণ্ডন বা নিউ ইয়র্কে, আসলে বোধহয় ড্রাগসের ব্যাপারে জানেই না কিছু।'

'এদিকে জঙ্গলে ঘুরছে সশস্ত্র একদল লোক, কয়েক রাত পর পর শহর পেরিয়ে যাচ্ছে তাদের ড্রাগস ভরা ট্রাকের বহর। আশপাশের গ্রামের তরুণ ছেলেরা তাদের ওখানে চাকরি নিয়েছে। এই শহরেরও দু'চারজন আছে। কেউ কেউ বাড়ি ফিরতে পারে, অন্যরা হারিয়ে যায় কোথায় যেন।'

'আমরা গুয়াতেমালা সিটিতে পৌঁছলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাব এখানে কী ঘটছে,' বলল সোহানা। 'কখনও কখনও বাইরের দেশের মানুষের কথা বেশি শোনে পুলিশ। হয়তো ব্যবস্থা নেবে তারা।'

'আমরাও এ কথাই ভেবেছি,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। 'আরেকটা কথা, ড্রাগস ট্র্যাফিকাররা যখন গুলি করেছে; এমন হতে পারে এখনও আপনাদেরকে খুঁজছে। কাজেই দেরি না করে আপনাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে এই শহর থেকে। আমার গাড়ি আছে, ওতে করে পৌঁছে দেব আপনাদের পরের শহরে। ওখান থেকে গুয়াতেমালা সিটির বাস পেয়ে যাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'খুবই উপকৃত হব তা হলে।'

'বাস এখানে থামে না?' জানতে চাইল সোহানা।

'আজকাল আর থামে না,' বললেন যাজক। 'আসলে যথেষ্ট বড় শহর নয় স্যাণ্টা মারিয়া দে লস রকাস। সব মিলে আমরা শ' দুয়েক মানুষ। বাইরে কোথাও কারও ব্যবসাও নেই তেমন।'

'আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করব, এর ভেতর বুঝব ড্রাগসের সব ট্রাক বিদায় নিয়েছে কি না, তারপর নিজেরাও রওনা হব,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো।

'অপেক্ষা যখন করতেই হবে, চলুন আপনাদের দেখিয়ে আনি

গির্জাটা,' বললেন যাজক, 'ডোমিনিকানরা ওটা তৈরি করে ষোলো শ' শতাব্দীতে।'

'বাব্বা! এত প্রাচীন দালান! চলুন দেখে আসি,' দাঁড়িয়ে পড়ল সোহানা।

যাজকের সঙ্গে হাজির হলো ওরা চার্চে। সামনেই নিচু দুই বেল টাওয়ার, মাঝে সমতল ফ্যাসাড। শেষে দালানের কাঠের বিশাল দরজা পেরিয়ে ছোট প্লাযা। ওটার এদিকে সদর রাস্তা। সোহানার মনে পড়ল, এমনই চার্চ দেখেছে ক্যালিফোর্নিয়ার মিশনে, অবশ্য ওগুলো ছোট। চার্চের ভিতরে মেরি মাতার কারুকার্যময় মূর্তি। পাশের দোলনায় শিশু যিশু। দু'পাশে দুই দেবতা, হাতে ঢাল ও বর্শা।

'আঠারো শ' শতাব্দীতে স্পেন থেকে আনা হয় এই দুই মূর্তি,' বললেন ফাদার মার্টিন। 'আর এসব বেঞ্চ তৈরি করেছে সে আমলের প্যারিশিয়ানরা।' রানা-সোহানাকে নিয়ে সামনের সারির বেঞ্চে বসলেন তিনি। 'দুঃখের কথা, আজ এই শহর হয়ে উঠেছে ড্রাগ ট্র্যাফিকারদের স্বর্গ।'

'হাল ছাড়বেন না,' বলল রানা। 'হয়তো গুয়াতেমালা সিটিতে ব্যবস্থা নেবে ন্যাশনাল পুলিশ। আমরা তাদের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে জানাতে পারি কী দেখেছি।'

'সেক্ষেত্রে হয়তো টনক নড়বে এলেনা হিউবার্টের। ডাক্তার আর আমারও ধারণা, বেশিরভাগ বিদেশি জমি মালিকের মতই সে-ও জানে না কী চলছে তার জমিতে। জানলেই ব্যবস্থা নেবে।'

'হতে পারে,' বলল সোহানা। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কোথায়?'

'আপনাকে দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে, এর কারণ কী?' জানতে চাইলেন যাজক।

'কয়েক দিন আগে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার, ওই

মেয়ে সম্পর্কে ভাল কিছু শুনিনি। মনে হয়েছে, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না, বুঝতে চায়ও না সে।'

'তা হলে আপনাদের ধারণা, জেনে-শুনে ড্রাগস স্মাগলিঙে জড়িয়ে পড়েছে মেয়েটা?'

'আমরা নিশ্চিত নই,' বলল সোহানা। 'কারও ব্যবহার খারাপ হওয়ার মানেই এমন নয় যে সে ক্রিমিনাল। মনে হয়েছে, নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বার্থপর এক মেয়ে সে। আইন মানতে রাজি নয়।'

'বুঝলাম,' আস্তে করে মাথা দোলালেন যাজক। 'তবুও দয়া করে পুলিশকে জানান। এসব ড্রাগস ট্র্যাফিকারদের কারণে ভয়ে আছি আমরা। এ এলাকা থেকে ড্রাগস দূর হলে এদিকটা হবে স্বর্গ।'

'আমরা আমাদের সাধ্যমত করব,' কথা দিল রানা।

'সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ। চলুন, এবার ডক্টর প্যাডিয়োর ওখানে যাই। পরের শহরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে রোগী।' উঠল ওরা, দুই সারি বেঞ্চের মাঝ দিয়ে চলেছে। কিন্তু দরজার কাছে এসে থমকে গেলেন যাজক মার্টিন। সামান্য ফাঁক করলেন দরজা। চাপা স্বরে বললেন, 'এক মিনিট! অপেক্ষা করুন!'

ফাদারের পাশ থেকে চাইল রানা ও সোহানা।

রাস্তায় পারসোনেল পুলিশ ক্যারিয়ার। ওটা থেকে নেমে ডক্টর প্যাডিয়োর গাড়ি থামিয়েছে সশস্ত্র ছয়জন। সার্জেন্ট কথা বলছে প্যাডিয়োর সঙ্গে। জবাবে কী যেন বললেন ডাক্তার। বিরক্ত মনে হলো। গাড়ি থেমে নামলেন, সার্জেন্টের সঙ্গে হেঁটে গেলেন একটা দোকানের সামনে। দরজা খুলে দিলেন।

অন্য দুই কর্পোরাল সহ দোকানে ঢুকল সার্জেন্ট, ভিতরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারও বেরিয়ে এল।

দরজায় তালা দিলেন ডাক্তার, সার্জেন্টের সঙ্গে ফিরলেন গাড়ির কাছে। এবার খুললেন গাড়ির ট্রাঙ্ক। ভিতর দিক দেখে নিল

সার্জেন্ট। কেউ নেই ওখানে। মাথা দুলিয়ে কী যেন বলে পারসোনেল ক্যারিয়ারের প্যাসেঞ্জার সিটে গিয়ে উঠল পুলিশ অফিসার। পিছনের বেঞ্চিতে উঠল তার লোক। গাড়ি রওনা হয়ে গেল এসতেনসিয়া মিগুয়েরো লক্ষ্য করে।

দরজা সামান্য খুলে চার্চে এসে ঢুকলেন ডাক্তার। 'মিস হিউবার্টকে চিঠি দেয়ার পর ওই স্কোয়াড পুলিশই আমাদেরকে ধমক দিয়ে গিয়েছিল।'

'এখন কীজন্যে এসেছিল?' জানতে চাইলেন ফাদার মার্টিন।

'দু'জন মানুষকে খুঁজছে। তারা নাকি ড্রাগ স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত। এলাকায় নতুন। কোন্ দেশি জানে না। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে তাদেরকে দেখা গেছে। ওই ক্যাম্পে রেইড দিয়ে ব্যাকপ্যাকে কয়েক পাউণ্ডের কোকেন পেয়েছে পুলিশ।'

'ভুয়া কাহিনি গুছিয়ে নিয়েছে,' সোহানার দিকে চাইল রানা।

'দেরি না করেই শহর ছাড়া উচিত আপনাদের,' বললেন ফাদার মার্টিন।

'হ্যাঁ, চলুন, যাওয়া যাক,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো।

'আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না,' বলল সোহানা। 'পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে আমাদেরকে ধরতে চাইছে, আপনাকেও বিপদে ফেলতে পারে।'

'হুমকি দিয়েছে, তবে আপাতত বিপদ হবে না,' বললেন ডাক্তার। 'সার্জেন্ট ভাল করেই জানে, ড্রাগের লোকদের হয়ে যা খুশি তাই করলে চলবে না; যে-কোনও দিন ডাক্তারের সাহায্য লাগতে পারে তার নিজের। বহু মাইলের ভেতর আমিই একমাত্র ডাক্তার।'

'ফাদার, আমরা এলেনা হিউবার্টের সঙ্গে কথা বলার পর আপনাকে জানিয়ে দেব ফলাফল কী হয়েছে,' বলল সোহানা।

'আশা করি এতেই কাজ হবে,' বললেন ফাদার। 'ঈশ্বর আপনাদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করুন।'

ওরা গাড়িতে চেপে বসতেই রওনা হয়ে গেলেন ডাক্তার। এবই পথে গতরাতে গেছে ড্রাগসের ট্রাক। শহরের শেষ প্রান্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর ফুরিয়ে গেল পেভমেন্ট, নতুন করে শুরু হলো নুড়ি পাথরের সড়ক। এঁকেবেঁকে নেমেছে জঙ্গুলে উপত্যকার মাঝ দিয়ে।

'স্যান্টা মারিয়া দে লস রকাস আসলে শেষ দিকের মায়া বসতি,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। 'মস্ত সব শহর পরিত্যক্ত হওয়ার কয়েক শ' বছর পর এ শহরের পত্তন হয়। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ওখানে উঠতে মাত্র দুটো খাড়া রাস্তা আছে? মায়াদের সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর এখানে আশ্রয় নিয়েছিল অল্প কিছু মানুষ।'

'স্প্যানিয়ার্ডদের জন্যে কঠিন হয়েছে শহর দখল করা,' বলল সোহানা।

'পারেইনি,' হাসলেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। 'এদিকের ইণ্ডিয়ানরা ভীষণ লড়াকু। কিন্তু অন্য কারণে মাথা নত করে। ডোমিনিকান মিশনারি ফ্রায়াররা এসেছিল লাস কাসাসের নেতৃত্বে, শান্তি বজায় রেখে ধর্মান্তরিত করে সবাইকে।'

'ফ্রায়ার বার্তোলোমে দে লাস কাসাস?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ, জাতীয় বীর। র‍্যাবিনালে মিশন করেন, ইণ্ডিয়ানদেরকে বুঝিয়ে ব্যাপটাইয করেন এক এক করে। এ কারণে এই এলাকার নাম লাস ভারাপাসেস। এর অর্থ: সত্যিকারের শান্তির এলাকা।'

ড্রাইভ করছেন ডাক্তার, তাঁর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে রানা। 'কী হলো, ডক্টর?'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'লাস কাসাস সম্পর্কে

ভাবছিলাম। তিনি চেয়েছিলেন মায়ারা যেন গুয়াতেমালায় সমান অধিকার পায়। কিন্তু কখনও তা হয়নি। শত শত বছর ধরে বঞ্চিত হয়েছে মায়ারা। আর গৃহযুদ্ধের সময় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গরীবরাই।'

'এ কারণেই কি প্রায় বিনা পয়সায় দুর্গম এই এলাকায় ডাক্তারি করেন?' জানতে চাইল সোহানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন প্যাডিয়ো। 'যাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, তাদের পাশেই আছি, এ-ই তো যৌক্তিক কাজ। কখনও চলে যেতে ইচ্ছে হলে, এই কথাটা নিজেকে মনে করিয়ে দিই।'

'সামনে বোধহয় আরেকটা ড্রাগসের ট্রাক,' বলল সোহানা।

'মাথা নিচু রাখুন,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। 'ওদেরকে এড়িয়ে যেতে হবে। শুয়ে পড়ুন সিটের সামনের জায়গায়। কম্বল আছে সিটে। গায়ের ওপর টেনে নিন।'

পিছনের সিট ছেড়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা। সিটে চিত হয়ে শুলো সোহানা। দু'জনের উপর বিছিয়ে নিল ব্ল্যাঙ্কেট। কেউ দেখলে ভাববে রোগী নিয়ে চলেছেন ডাক্তার।

ড্রাইভ করছেন প্যাডিয়ো। রাস্তার মাঝে থেমেছে ট্রাক। ওটার দিকে চলেছেন। ক্যাব থেকে নেমে এসেছে ড্রাইভার ও গার্ড। গাড়ি থামাতে হাতের ইশারা করল।

'ইঞ্জিন নষ্ট হয়েছে ওদের, আমাদের গাড়িটা চেয়ে বসতে পারে,' বললেন প্যাডিয়ো।

'সেক্ষেত্রে হয়তো কিছুই করতে পারবেন না,' বলল রানা। 'দেখা যাক কী হয়।'

ট্রাকের পিছনে থামলেন প্যাডিয়ো।

জানালার পাশে চলে এল ট্রাকের ড্রাইভার। স্প্যানিশ ভাষায় জানাল এই গাড়ি তাদের চাই।

জবাবে হাতের ইশারা করে কম্বল চাপা সোহানাকে দেখালেন

ডাক্তার। তিনি দ্রুত কী যেন বলতেই তড়াক্ করে তিন লাফে পিছিয়ে গেল ড্রাইভার। ভয়-ভয় চেহারা করে ঘন ঘন হাতের ইশারা করল, যেন বলতে চায়ঃ আরে ভাই, জলদি যান তো গাড়ি নিয়ে এখান থেকে!

অলস ভঙ্গিতে আবারও রওনা হয়ে গেলেন ডাক্তার।

দু'জনের সব কথাই শুনেছে রানা ও সোহানা।

জানতে চাইল সোহানা, 'ডক্টর, প্যারোটাইড কী?'

'খুবই সাধারণ ভাইরাল ইলনেস,' মৃদু হাসলেন ডাক্তার। 'ইংরেজিতে বলে মাম্পস। ওকে বললাম সবচেয়ে ছোঁয়াচে পর্যায়ে আছেন আপনি। এ রোগে কখনও কখনও বন্ধ্যা হয় পুরুষরা।'

'ভাল বুদ্ধি করেছিলেন,' হাসল সোহানা। সরিয়ে দিল কম্বল। আবারও ওর পাশে আসীন হলো রানা।

একঘণ্টা পর বড় এক গ্রামে ওদেরকে নামিয়ে দিলেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। কিছুক্ষণ পর চেপে বসল ওরা কোব্যান শহরে যাওয়ার বাসে। কোব্যান থেকে এক শ' তেত্রিশ মাইল দূরে গুয়াতেমালা সিটি, বাসে সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টা।

গুয়াতেমালা সিটিতে পৌঁছে ট্যাক্সি চেপে হাজির হলো ওরা যোনা ভিভা ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল হোটেলে। শহরের এদিকটা খুব পশ, সেরা সব রেস্তোরাঁ ও নাইট ক্লাব এখানে। হোটেল কক্ষে উঠে প্রথমেই স্যাটালাইট ফোনের চার্জার কাজে লাগাল ওরা। দ্বিতীয় কাজ হিসাবে গুয়াতেমালা সিটির আমেরিকান ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করল রানা। ওই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে ওর। অনায়াসেই পেয়ে গেল স্বল্প খরচে সেফ ডিপোযিট বক্স।

হোটেল থেকে বেরিয়ে তিন ব্লক গেলেই ব্যাঙ্ক, ওখানে গেল ওরা, ভাড়া করা বক্সে রাখল পাতাল নদীতে পাওয়া সোনা ও জেডের আর্টিফ্যাক্ট।

আবারও হোটেলে ফিরবার সময় দামি কয়েকটা দোকান ঘুরে

কিনে নিল প্রয়োজনীয় পোশাক ও দুটো সুটকেস। তারপর সালমা আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করল মোবাইল ফোনে।

'আপনারা কোথায় ছিলেন, সোহানা?' জানতে চাইল সালমা। 'দুই দিন ধরে খুঁজছি।'

'পাতাল এক নদীতে নেমেছিলাম, তাই ডাউন হয়ে যায় আমাদের মোবাইল ফোনের ব্যাটারি,' বলল সোহানা। নিজেদের হোটেলের নাম ও ঘরের নাম্বার দিল। অল্প কথায় জানাল কী হয়েছে। শেষে বলল, 'ওখানে আপনাদের কী খবর?'

'খারাপ সংবাদ আছে,' বলল সালমা আলী। 'খুবই খারাপ।'

'স্পিকার চালু করে দিলাম, রানাও শুনবে,' বলল সোহানা।

'ঠিক আছে। চারজন লোক গিয়েছিল ওই ইউনিভার্সিটিতে। এফবিআই আর কাস্টমসের লোক বলে পরিচয় দেয় দু'জন। অন্য দু'জন মেক্সিকান কালচারাল অফিশিয়াল। ক্রেডেনশিয়াল দেখায় ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষকে। সত্যিই ওই নামের লোক আছে, নিশ্চিত হওয়ার পর আর সন্দেহ করেনি কর্তৃপক্ষ। তখন...'

'কোডেক্স চুরি হয়নি তো?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, তাই হয়েছে,' বলল সালমা। 'দোষ দেয়া যায় না ডক্টর রশিদকে। ইউনিভার্সিটির উকিলরা জানিয়ে দিয়েছিল, মেক্সিকান অফিশিয়ালদের হাতে তুলে দিতে হবে মায়ান কোডেক্স। লোকগুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে ডক্টরের সঙ্গে দেখা করেন ভাইস চ্যান্সেলার। তখন আর্কাইভ রুমে কোডেক্স নিয়ে কাজ করছিলেন ডক্টর রশিদ। উনি বাধা দিতে পারেন ভেবে তাঁকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে তৈরি ছিল ক্যাম্পাস পুলিশ।'

'আমরা ডক্টর রশিদকে দোষ দিচ্ছি না,' বলল রানা, 'সালমা, দেখুন তো সে সময়ে কোথায় ছিল এলেনা হিউবার্ট। কোডেক্স কিনতে চেয়েছিল, উকিলও সঙ্গে আনে। হয়তো নকল লোক তারা। স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ আসছে ওই মেয়ের ওপরেই।'

'খোঁজ নিয়েছি। চুরির রাতে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে টেক অফ করে তার বিমান,' বলল সালমা আলী। 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করার পর সেই বিকেলেই ফ্লাই করার কথা ছিল, কিন্তু পরে নতুন ফ্লাইট প্ল্যান করা হয়। কোডেক্স চুরি হয়ে যাওয়ার পর রাতেই ইউএসএ ত্যাগ করে সে।'

'কোথায় যাচ্ছিল?' জানতে চাইল রানা।

'সোজা গুয়াতেমালা সিটি।'

'তার মানে সে এখন এখানে?' আনমনে বলল সোহানা। 'বোধহয় সঙ্গে এনেছে কোডেক্স।'

'হতে পারে,' বলল সালমা। 'প্রাইভেট বিমানের এই এক সুবিধে, লাগেজে চোরাই মাল রাখলেই হলো, কারও কাছে লুকাতে হয় না।'

পনেরো

দুই শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে গুয়াতেমালা সিটিতে রয়েছে এলেনা হিউবার্টের বিশাল ম্যানশন, আগে ওটার মালিক ছিল ধনাঢ্য মিগুয়েরো পরিবার। আর সব স্প্যানিশ প্রাসাদের মতই, সামনে প্রকাণ্ড পাথুরে সিঁড়ি গিয়ে উঠেছে ফ্যাসাডে। ওটা পেরিয়ে দুইপাল্লার বিশাল দরজা। চাঁদের মত বেঁকে গেছে দোতলা বাড়ি, পিছনে মস্ত উঠান ও অপূর্ব বাগান।

রানা ও সোহানা টোকা দেয়ার কয়েক সেকেণ্ড পর দীর্ঘদেহী, পেশিবহুল এক লোক এসে খুলল দরজা। বয়স হবে ত্রিশ। ভঙ্গি দেখে মনে হলো বক্সার। বাটলারের কাজ করে, আরেকটা কাজ

বোধহয় সিকিউরিটি চিফ হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। 'মিস্টার মাসুদ রানা ও মিস সোহানা চৌধুরী?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি, আসুন,' এক পাশে সরে দাঁড়াল লোকটা। রানা-সোহানা ভিতরে পা রাখতেই একবার দেখে নিল রাস্তা, তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। 'লাইব্রেরিতে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

ফয়েতে আট ফুটি দুই পাথরের স্ল্যাব, সেসবের গায়ে খোদাই করা মায়াদের ভয়ঙ্কর চেহারার দুই দেবতা, পাহারা দিচ্ছে বাড়ি। ফয়ের এক দরজা দিয়ে ওদেরকে নিল লোকটা। ওই দরজার উপর পাথরের লিন্টেল প্রাচীন কোনও মায়ান বাড়ির। এপাশে এসে ওরা দেখল প্রকাণ্ড লাইব্রেরি। অনেকটা ইংলিশ কাউন্টি ভবনের গ্রন্থাগারের মতই। তাকের ওপর লাখ লাখ ডলারের বই কাতারে কাতারে রাখা। পুরনো আমলের চামড়ার কাউচে রানা-সোহানা বসবার পর বেরিয়ে গেল লোকটা।

বংশের আভিজাত্য প্রমাণের সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে এই ঘরে। এক পাশের স্ট্যাণ্ডে চার ফুটি অ্যান্টিক গ্লোব। দেয়ালের কাছে লেকটার্ন, সেগুলোর উপর খোলা অবস্থায় মোটা সব বই। তার একটা পুরনো স্প্যানিশ ডিকশনারি, অন্যটা হাতে রং করা সতেরো শ' শতাব্দীর অ্যাটলাস। দেয়ালে দেয়ালে বুকশেলফে চামড়া মোড়া পুরু সব বই। পিছনের বুকশেলফগুলোর উপরে উনিশ শতকের শিল্পকর্ম— স্প্যানিশ মহিলাদের পোর্ট্রেট, চুলে ম্যান্টিলা, পরনে লেসের গাউন। স্প্যানিশ ভদ্রলোকদের পরনে কালো কোট।

সোহানা বুঝে গেল, এ কামরা গোছাবার কাজ এলেনা হিউবার্ট করেনি। স্রেফ বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। আরও নিশ্চিত হলো, কাছের শেলফে বইয়ের সোনালী শিরদাঁড়া দেখে।

প্রতিটি বই স্প্যানিশ ভাষায় লেখা।

ঘরের আরেক দিকে গ্লাসের কেসে এক মায়ান রাজপুত্র। হাতে, গলায় আর কানে সোনা ও খোদাই করা জেডের গহনা। পরনে ক্লাসিক পোশাক। পাশের তাকে মাটির তৈরি মায়ান পট। কোনওটা ব্যাঙের মত, কোনওটা কুকুরের মত, অথবা পাখির মত। আরেক পাশে সোনা দিয়ে গড়া ছোট ছোট আটটা দেবতা।

পালিশ করা পাথরের মেঝেতে হাই-হিলের খট্‌খট্‌ আওয়াজ শুনল ওরা। ফয়ে পেরিয়ে চপল পায়ে লাইব্রেরিতে ঢুকল এলেনা হিউবার্ট, ঠোঁটে হাসি। 'আরে, সত্যিই মিস্টার রানা আর মিস চৌধুরী দেখছি! স্বপ্নেও ভাবিনি আবার দেখা হবে। তা-ও আবার গুয়াতেমালায়!' এলেনার পরনে কালো শার্ট, তবে ওই সেটের সুট পরেনি। জ্যাকেট ও জুতোও কালো নয়। সাদা সিল্কের ব্লাউস কুঁচকে আছে গলার কাছে। বোধহয় কাজে ব্যস্ত ছিল বাড়ির অন্য কোথাও। চট্‌ করে একবার দেখে নিল হাতঘড়ি, চালু করল টাইমার, তারপর ঘুরল রানা ও সোহানার দিকে।

ভদ্রতা বজায় রেখে উঠে দাঁড়াল রানা ও সোহানা। 'হ্যালো, মিস হিউবার্ট।'

যেখানে ছিল, সেখানেই রইল এলেনা, মনে হলো না করমর্দনের ইচ্ছা আছে। 'আমাদের দেশে এসে কেমন লাগছে?'

'আপনার সঙ্গে স্যান ডিয়েগোতে দেখা হওয়ার পর থেকেই আলটা ভেরাপায ঘুরে দেখেছি,' বলল সোহানা, 'বোধহয় আমাদের সচেতন করে তুলেছে ওই কোডেক্স। কাজেই ঘুরে এসেছি মায়াদের অঞ্চল থেকে। অনেক কিছুই দেখলাম ওখানে।'

'সত্যিকারের অভিযাত্রীর মতই? গুড! আজকাল আসলে সামান্য কৌতূহলের কারণে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে না কেউ। রীতিমত হিংসে হচ্ছে আপনাদেরকে।'

'নতুন জিনিস সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত না থাকলে আপনিও সময়

পেতেন,' বলল রানা।

'সত্যি, কাজের অভাব নেই আমার,' হাসল এলেনা। 'মাত্র গড়ে তুলছি নিজ সাম্রাজ্য। এখানে পৌঁছেই দেরি না করে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, রীতিমত সম্মানিত বোধ করছি।'

'যে কারণে দেখা করতে চেয়েছি,' কাজের কথায় এল রানা, 'আপনার এস্টেটের খুবই কাছে গিয়েছিলাম আমরা। ওটার নাম তো বোধহয় এসতেনসিয়া মিগুয়েরো?'

'গিয়েছিলেন? ইন্টারেস্টিং!' বলল এলেনা। হয়ে উঠেছে সতর্ক, যদিও চেহারায় কোনও ভাবান্তর নেই।

'আমরা ওদিকে যেতে বাধ্য হই একদল সশস্ত্র লোক তাড়া করায়। আমাদেরকে দেখেই গুলি শুরু করে। বাধ্য হয়েই যেতে হয় আপনার জমির ওপর দিয়ে। তখনই দেখি ওখানে চাষ করা হয়েছে হাজার হাজার গাঁজা, কোকা ও পপি গাছ। অন্তত এক শ' লোক কাজ করছিল ওখানে। পেটি বেঁধে ট্রাকে করে পাঠানো হচ্ছে ড্রাগস দূরে কোথাও।'

যুবতীর চোখে চেয়ে আছে রানা।

'খুব ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন দেখছি আপনারা,' বলল মিস হিউবার্ট। 'জানতে পারি কীভাবে অত লোক এড়িয়ে বেরিয়ে এলেন?'

'তার আগে বলুন, এতজন ক্রিমিনাল কী করছিল আপনার খামারে?' জানতে চাইল সোহানা।

হাসল এলেনা হিউবার্ট। 'একবার ভাবুন এভারগ্লেড ন্যাশনাল পার্কের কথা, তা হলেই বুঝবেন কী জবাব দেব। ওটা দেড় মিলিয়ন একর, আর ওটার দ্বিগুণ বড় এসতেনসিয়া মিগুয়েরো। আর গুয়াতেমালার কয়েকটি রিজিয়ন জুড়ে রয়েছে আমার জমি। চাইলেও সবাইকে সরিয়ে দিতে পারব না ওই জমি থেকে। এমনও জায়গা আছে যেখানে পায়ে না হেঁটে পৌঁছুনো যায় না।

হাজার বছর ধরে ওই জমির ওপর দিয়ে চলাচল করে স্থানীয়রা। আর তাদের অনেকেই খুবই খারাপ মানুষ। ওদিকের রিজিয়নের অফিশিয়ালদের জানিয়েছি: তারা যেন কমার্শিয়াল লগিং, দুর্লভ প্রাণী বা আর্কিয়োলজিকাল লুট বন্ধের ব্যবস্থা করে। আসলে আপনাদেরকে বুঝতে হবে, সশস্ত্র ড্রাগ গ্যাং ঠেকাবার দায়িত্ব সরকারের, আমার নয়।'

'মনে হয়েছে আপনাকে জানানো উচিত, আপনার জমিতে বেআইনী কাজ হচ্ছে,' বলল রানা।

ছোঁ দেয়া চিলের মত সামনে ঝুঁকে গেল এলেনা হিউবার্ট, মনে হলো এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের উপর। 'আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি কোনও অপরাধ করেছি!'

'আমরা শুধু জানালাম ওখানে কী চলছে,' এলেনার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সোহানা। মেয়েটি হ্যাণ্ডশেক করতে বলল, 'কয়েক মিনিট সময় দিলেন বলে অনেক ধন্যবাদ।' দেরি না করে দরজা পেরিয়ে ফয়েতে চলে এল সোহানা।

পিছু নিল রানা।

ওর পর এল এলেনা হিউবার্ট। বিরক্ত সুরে বলল, 'কঠোর ব্যবস্থা নেব আমি।' বাড়ির আরেকদিকে রওনা হয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনারা আমার মায়ান কোডেক্স নিয়ে কিছু বলবেন।'

ঝট্ করে ঘুরে চাইল সোহানা। '*আপনার* মায়ান কোডেক্স?'

না থেমেই হাসল এলেনা। 'তাই বলেছি নাকি? অবাক কাণ্ড তো!' চলে গেল সে দূরের আরেক দরজা দিয়ে।

রানা ও সোহানার পিছনে খুলে গেছে বেরিয়ে যাওয়ার দরজা। যে ওদেরকে ঢুকতে দিয়েছে, তার সঙ্গে এখন সুট পরনে আরও দু'জন। হাট করে খুলে রেখেছে দরজা, যেন বলতে চাইছে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার বেরোন তো এখান থেকে।

বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে বলল সোহানা, 'ওই মেয়ে আমাদের কথা পাত্তাই দেয়নি।'

'অন্য পথে এগোতে হবে,' বলল রানা।

সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে নেমে এল ওরা সদর রাস্তায়। ডানদিকে রওনা হয়ে চলে এল এক শ' গজ দূরে, তারপর ট্যাক্সি ডাকল রানা। 'যাব বাংলাদেশ এমব্যাসিতে।'

গন্তব্যে পৌঁছবার আগে কয়েক জায়গায় খোঁজ নিতে হলো, তারপর পৌঁছে গেল ঠিক বাড়িতে।

ডেস্কের পিছন থেকে তথ্য দিল রিসেপশনিস্ট, কয়েক মিনিট পর দেখা করবেন সেকেণ্ড অফিসার।

পাঁচ মিনিট পর সুন্দরী মেয়েটি উদয় হয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, 'আমি মুস্তাফিজা হোসেন মুক্তা। বাংলাদেশ এমব্যাসির সেকেণ্ড অফিসার। আসুন আমার সঙ্গে।' ওরা অফিসে ঢুকে বসবার পর বলল, 'কী করতে পারি আপনাদের জন্যে?'

নিজেদের নাম জানাল রানা ও সোহানা।

চট্ করে একবার রানা আরেকবার সোহানাকে দেখে নিল মেয়েটি। যার যার অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত ছিল এই দুই বিসিআই রত্ন, গতবছরের সিলেকশন টিমে ছিল না। মুক্তা চাকরি পাওয়ার পর সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং শেষে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয় গুয়াতেমালার বাংলাদেশ এমব্যাসিতে। ফলে পরিচিত হতে পারেনি মাসুদ রানা বা সোহানা চৌধুরীর সঙ্গে। এবার দু'চার কথায় মুক্তা বুঝিয়ে দিল, যে-কোনও সহায়তা দিতে তৈরি ও।

রানা জানাল কী ঘটেছে এসতেনসিয়া মিগুয়েরোয়। ওদের উপর হামলা করেছে ড্রাগ ট্র্যাফিকাররা। বিশাল খামার করা হয়েছে গাঁজা, কোকা ও পপি ফুলের। ট্রাক কে ট্রাক পাচার হচ্ছে ড্রাগস। ওরা সবই জানিয়েছে এলেনা হিউবার্টকে, কিন্তু জবাবে স্রেফ হেসেছে মেয়েটি।

শেষে মায়াদের কোডেক্সের কথা বলল রানা: 'কোডেক্স এখন তার কাছে, অথবা নকল ফেডারাল অফিশিয়ালদের মাধ্যমে স্যান ডিয়েগোর ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সরিয়ে ফেলেছে অন্য কোথাও।'

নিয়ম অনুযায়ী রিপোর্ট লিখল মুক্তা, মাঝে মাঝে থেমে জিজ্ঞেস করে নিল, কোন্ তারিখে কোথায় কী ঘটেছে। ওদের মোবাইল ফোনের নম্বর টুকে নিল। কাজ শেষে বলল, 'এসব তথ্য গুয়াতেমালান গভার্নমেন্টের কাছে দেব আমরা। তবে এতে কোনও কাজ হবে, এমন ভাবছি না।'

'সেক্ষেত্রে কী করা উচিত?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'বিশাল এলাকার জঙ্গল ধ্বংস করছে ড্রাগ উৎপাদনকারী আর ট্র্যাফিকাররা মিলে, তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়ছে সরকার, বিশেষ করে পেটেন রিজিয়নে,' বলল মুক্তা। 'কিন্তু ড্রাগ লর্ডদের লোকবল সরকারের চেয়ে ঢের বেশি। টাকা বা অস্ত্রেরও অভাব নেই। তারপরও এদের কাছ থেকে গত এক বছরে তিন লাখ একর জমি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে ওই জমি আসলে কিছুই নয়। হয়তো তাদেরই কারও সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ওই এলেনা হিউবার্ট।

'এ দেশে আসার পর থেকে উঁচু সমাজে জায়গা করে নিয়েছে বিপুল টাকার জোরে। সুন্দরী, বড়লোক, আনম্যারেড— ফলে এই শহরে রীতিমত সেলেব্রিটি হয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস: প্রফেসার রশিদকে ধোকা দিয়ে মায়ান কোডেক্স হাতিয়ে নেয়ার বুদ্ধি এই মেয়ের। এলেনা মনে করে: সাধারণ, বোকা মানুষের জন্যে আইন, ক্ষমতাশালীদের জন্যে নয়। বেশিরভাগ ধনীর মতই নিজে ও অপকর্ম করে না, একদল বদমাশকে দিয়ে সব করিয়ে নেয় টাকার জোরে। ওই লোকগুলোই চুরি করেছে মায়ান কোডেক্স। কিন্তু এলেনা যা-ই করুক, বিপুল টাকার কারণে এ দেশের

আইনে তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব বলে মনে করি না।'

'এলেনা কিন্তু আমাদের মতই বিদেশি এখানে,' মন্তব্য করল সোহানা।

'আপা, আপনার বা মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ,' ম্লান হাসল মুক্তা। 'কয়েক বছর ধরে ক্ষমতাশালীদের উঁচু সমাজে মিশছে। অঢেল টাকা ঢালছে রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে। আর বিপুল জমি কিনে নিয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তারচেয়েও বড় কথা, শুধু সরকারী দলের লোক নয়, বিরোধী দলেরও বড় বড় সব নেতাকে পুরেছে পকেটে। নির্বাচনে যে দলের লোকই জিতুক বা হারুক, তার ক্ষমতা কমে না। ও মাত্র একটা ফোন করলেই ব্যস্ত হয়ে উঠবে উচ্চপদস্থ অনেকে।'

'বুঝলাম,' আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'তারপরও চেষ্টা করতে দোষ নেই। একবার গুয়াতেমালান পুলিশ এসতেনসিয়া মিগুয়েরো দেখে এলে কোনও ব্যবস্থা তাদেরকে নিতেই হবে। ওখানে হাজার হাজার একর জমিতে ড্রাগসের চাষ হচ্ছে। সব এখন বিক্রির জন্যে তৈরি, লুকাতে পারবে না কেউ। আর যদি একবার এলেনার অফিস বা বাড়ি সার্চ করে, পেয়ে যাবে...'

'মায়ান কোডেক্স?' একটু ঝুঁকে এল মুক্তা।

'প্রমাণ পেয়ে যাবে, ড্রাগসের অপারেশনে পুরোপুরি জড়িত ওই মেয়ে,' বলল সোহানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল মুক্তা। 'এত বড় ঝুঁকি পুলিশ নেবে না, সোহানা আপা। তাদের বড়কর্তারা ভাল করেই জানে, দেশের উত্তর ও পশ্চিম এলাকায় কী চলছে। তারাও চায় বন্ধ হোক ড্রাগের ব্যবসা। কিন্তু তাদের মাথার ওপর আছে সরকারী দলের প্রভাবশালী নেতারা, তারা চাইবে না এলেনা হিউবার্টকে বিব্রত করা হোক। চাইলেও ওই মেয়েকে গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ। বরং জোরেশোরে সরকার থেকে ধমক মারা হবে,

খামোকা নিরীহ এলেনা হিউবার্টকে হয়রানি করা হচ্ছে। সরকারই পুলিশকে নির্দেশ দেবে, যেন শত শত মায়ান নিরীহ লোক ধরে জেলে চালান দেয়া হয়। আসলে রাজধানীতে নোংরা সব চুক্তি, কালো টাকার লেনদেন, সবই থাকে দামি মানুষের বিলাসবহুল বাড়ির চারদেয়ালের ওপাশে। সত্যি যদি কেউ গুয়াতেমালায় কয়েক লক্ষ একর জমির মালিক হয়, সে কখনও গ্রামে থাকে না, প্রাচুর্যের মাঝে থাকে গুয়াতেমালান রাজধানীতে।'

'তার মানে, পুলিশকে জানাব আমরা, কিন্তু আসলে কিছুই হবে না, এই তো?' বলল সোহানা।

'ঠিক তাই, আপা,' বলল মুক্তা। 'আপনি বা মাসুদ ভাই চাইছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুক পুলিশ। কিন্তু আসলে ড্রাগসের ব্যবসা সাধারণ কোনও অন্যায় নয়, বেপরোয়া খুনি একদল টাকার কুমিরের বিরুদ্ধে লড়তে হবে সেক্ষেত্রে। এটা মস্ত এক লড়াই। পুলিশ বা আর্মি সেজন্যে এখনও তৈরি নয়। তারা কিছু করতে চাইলে সরকারই বাধা দেবে। কারণ ওই খুনিরাই চালায় দেশটা।'

'অর্থাৎ ফেডারাল পুলিশ কিছুই করতে পারবে না?' জানতে চাইল রানা।

'চেষ্টা করছে ওরা। কেউ কেউ। আপনাদের যদি সময় থাকে, চলুন ঘুরে আসি তাদের অফিস থেকে?' রানা ও সোহানা মাথা দোলাতেই মোবাইল ফোন বের করে কল করল মুক্তা। সংক্ষেপে স্প্যানিশ ভাষায় কার সঙ্গে যেন কথা বলল। কথা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

অফিস থেকে বেরিয়ে নীল এক টয়োটা প্রিমিও গাড়ির পাশে থামল মুক্তা। 'ওদের অফিস যোন ফোরে। বেশ দূরে, গাড়িতে যাওয়াই ভাল।'

পনেরো মিনিট পর পৌঁছে গেল ওরা অ্যাভেনিডা ৩-১১-এ,

ফেডারাল পুলিশ স্টেশনের সামনে। অফিসের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ চেনে মুক্তাকে, হাতের ইশারা করে দেখিয়ে দিল অপেক্ষা করছেন অফিসার।

করিডোরে ঢুকে শেষ মাথায় এলিভেটরে উঠল মুক্তা। রানা ও সোহানাকে নিয়ে এল পঞ্চম তলায়। ডানদিকের একটা অফিসে ঢুকল ওরা।

টেবিলে নেই অফিসার, দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে। ওরা ঢুকতেই ঘুরে চাইল। বয়স হবে বড়জোর পঁচিশ। ঝিকমিক করছে দু'চোখ। আনুষ্ঠানিকভাবে বলল মুক্তা, 'ইনি কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায। এঁরা মিস্টার মাসুদ রানা ও মিস সোহানা চৌধুরী। বাংলাদেশি। এঁরা এমন কিছু দেখেছেন, যেটা আপনি জানতে চাইবেন। মিস্টার রানা...'

সবাই বসবার পর সংক্ষেপে নিজেদের অভিজ্ঞতা খুলে বলল রানা। মাঝে মাঝে সাহায্য করল সোহানা। নির্দিষ্ট এলাকার জিপিএস লোকেশন দিল ওরা।

চুপচাপ সবই শুনল ফেডারাল অফিসার।

'আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এসব তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। আজই আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে রিপোর্ট ফাইল করব সেণ্ট্রাল কমাণ্ডে।'

চেয়ার না ছেড়ে বলল রানা, 'এর ফলে কোনও লাভ হবে, অফিসার? এলেনা হিউবার্টের স্থাবর সম্পত্তি সার্চ করা বা তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করা হবে?'

দুঃখিত মনে হলো কমাণ্ডারকে। আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'সরি, তেমন কিছুই হবে না। দেশের উত্তর অংশে যেসব ড্রাগ লর্ড খামার করেছে, বা ড্রাগসের চালান দিচ্ছে, সে এলাকা অত্যন্ত দুর্গম। আমাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই এলেনা হিউবার্ট তাদের সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত। বিশাল জঙ্গলে বা জাতীয়

কোনও পার্কে এসব অপকর্ম করছে ক্রিমিনালরা। আমরা রেইড দিই, কিন্তু দেখা যায় এরা সরে যায় অন্য কোথাও। আমরা ফিরে এলে আবারও আগের জায়গায় ফেরে। কখনও কখনও জমির মালিককে টাকাও দেয়া হয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তা করে না। আপনারা জানিয়েছেন পপি বা কোকা গাছের বিশাল খামার দেখেছেন। সত্যি বলতে, এসব শুনে বিচলিত হয়েছি। আমরা চাই না এসব জিনিস এ দেশে চাষ করা হোক। এতদিন শুধু দক্ষিণ আমেরিকার রুটে আসা কোকেন ও হেরোইনের চালান ঠেকাতে ব্যস্ত ছিলাম। এখন জানলাম এই দেশেই চাষাবাদ শুরু হয়েছে।'

রানা জানতে চাইল, 'যদি কোনও কারণে এলেনা হিউবার্টের বাড়িতে রেইড দেন, তার ব্যবসায়ীক অফিস সার্চ করেন বা তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করেন, এবং তার ফলে যদি প্রমাণ হয় সে অপরাধী, সেক্ষেত্রে আপনারা কি তাকে গ্রেফতার করবেন?'

'যথেষ্ট আইনী কারণ থাকলে তার বাড়ি, ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান সার্চ করব আমরা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অডিটও করতে পারব,' বলল কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায। 'কিন্তু এ মুহূর্তে সরাসরিভাবে তাকে জড়িত বলার উপায় নেই।' রানার মনে হলো কী যেন সিদ্ধান্ত নিল অফিসার। তারপর বলল, 'গোপন একটা কথা আপনাদের বলছি: অন্য বড়লোকদের মতই মাঝে মাঝে এলেনা হিউবার্টের ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে তদন্ত চালাই আমরা। আমি এই অফিসে আসার পর দু'বার সার্চ করা হয়েছে তার অফিস। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'অসৎ পথে অর্জিত হয়েছে এমন কিছু পাননি, বা কোনও আর্টিফ্যাক্ট?' বলল সোহানা, 'নিজেকে সে কালেক্টর বলে, তার বাড়িতেও দেখেছি নানান আর্টিফ্যাক্ট।'

'তার টাকার অভাব নেই,' বলল কমাণ্ডার। 'আর সেসব

কোথা থেকে পেয়েছে তাও কোনও রহস্য নয়। অসংখ্য দেশে সম্পত্তি তার। মস্ত বড়লোক পরিবারের মেয়ে। এখন যে বাড়িতে আছে, ওখানে রেইড দিলে পরিষ্কার বলে দেবে: মায়ান আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছে আগের মালিকের কাছ থেকে। আর নতুন কিছু হলে বলবে: সেসব পেয়েছে নিজের এস্টেটে, এখনও রিপোর্ট করে উঠতে পারেনি কর্তৃপক্ষের কাছে। এখন পর্যন্ত কোনও ক্রিমিনাল অফেন্স করেনি যার কারণে তাকে গ্রেফতার করা যায়। এই দেশ থেকে সরিয়েও ফেলেনি কিছুই।'

'আপাতত আমাদের কী করা উচিত?' জানতে চাইল সোহানা।

'মিস মুক্তা বোধহয় আপনাদেরকে সবই খুলে বলেছেন। আপাতত বাড়ি ফিরে যান। কোডেক্সের জন্যে চোখ রাখতে পারেন অনলাইন মার্কেটে। কখনও কখনও আর্টিফ্যাক্টের অংশ বিক্রি করে দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে অভিযোগ পেলে ওই কোডেক্স খুঁজব আমরা।'

'বেশ,' বলল সোহানা। সন্তুষ্ট নয়।

চেয়ার ছাড়ল রানা, হ্যাণ্ডশেক করল কমাণ্ডারের সঙ্গে। 'আমাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছেন বলে ধন্যবাদ।'

'আপনাদেরকেও অজস্র ধন্যবাদ, চোখের সামনে তুলে ধরেছেন অনেক কিছু,' বলল কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায। 'দয়া করে হতাশ হবেন না। কখনও কখনও খুব ধীর পথে চলে আইন।'

এমব্যাসিতে ফিরবার পথে রানা ও সোহানাকে ওদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল সেকেণ্ড অফিসার মুক্তা।

ঘরে ফিরে ওরা ফোন দিল সালমা আলীকে, জানিয়ে দিল বিমানের টিকেট পেলেই ফিরছে।

বিমানের টিকেট কনফার্ম হতেই হোটেলের লবিতে নেমে এল

ওরা, ঢুকল গিয়ে ইংরেজি বইয়ের দোকানে। যাত্রাপথে পড়বার জন্য দুটো বই কিনল সোহানা। রানা নিল মোটাসোটা একটা থ্রিলার বই। আবারও ফিরল হোটেল কক্ষে।

এয়ারপোর্টে কোনও ঝামেলা হলো না। ওদের বিমান একবার থামল ইউস্টনে। গন্তব্যে পৌঁছুতে লাগল সাত ঘণ্টা তেতাল্লিশ মিনিট। পুরোটা সময় ব্যয় করল সোহানা গুয়াতেমালার ইতিহাস পড়ে। অর্ধেক সময় ঘুমিয়ে নিল রানা, তারপর মন দিল রোমাঞ্চ উপন্যাসে। এর বহুক্ষণ পর উচ্চতা কমাল বিমান, নেমে যেতে লাগল স্যান ডিয়েগো এয়ারপোর্টের রানওয়ে লক্ষ্য করে।

হঠাৎ করেই বলল সোহানা, 'একটা ভুল করেছি আমরা!'

'কী?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধুর কথা ভুলে গেছি!'

'সে কে?'

'বার্তোলোমে দে লাস কাসাস!'

ষোলো

এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকে বেরিয়েই সালমা আলীর ভলভো সেডান দেখল রানা ও সোহানা। পিছন সিটে গম্ভীর হয়ে বসে আছে কাল্লু, পাশে সোহানা বসতেই আদর করে চেটে দিল ওর হাত।

'কাল্লু, ইয়্যানোইযটাল!' বলল সোহানা।

খুশি হয়ে মৃদু ঘেউ করে উঠল কুকুরটা।

'এ আবার কী ভাষা?' ড্রাইভিং সিট থেকে বলল সালমা।

'আমি তোমাকে মিস করেছি!'

'রীতিমত কষ্ট পেলাম যে আমার দাম কাল্লুর চেয়ে কম,' বলল সালমা। 'মাসুদ ভাই, এর একটা ন্যায্য বিচার চাই।'

'ঠিক,' সায় দিল রানা। 'এর শাস্তি, বাড়ি ফিরে আমাদেরকে কাচ্চি বিরিয়ানি রেঁধে খাওয়াবে সোহানা।'

'সকালে সব স্টাফ অফিসে আসবে,' হাসল সালমা। 'ওদেরও হক আছে খাওয়ার।'

'নো পরোয়া, রাতে সবার দাওয়াত,' ড্যাম কেয়ার ভঙ্গিতে বলল সোহানা। ক'দিন আগে বিশ হাজার টাকা খরচ করে ঢাকার সেরা বাবুর্চির কাছ থেকে শিখে নিয়েছে কয়েক পদের দারুণ বিরিয়ানি। সাধারণ চুলাতেই রাঁধা যায়। এবং বাড়িতে বিসিআই এজেন্টদেরকে দাওয়াত করে পরীক্ষায় একবারও ডাব্বা মারেনি। তার সাক্ষী রানা নিজে।

এবার সিরিয়াস কথায় এল সালমা, 'আপনারা কবে আসবেন সেজন্যে প্রতিদিন ফোন করেন ডক্টর আক্তার রশিদ। বড় লজ্জার ভেতর আছেন। আমি অবশ্য বলেছি, লজ্জার কিছুই নেই, যে কারও কাছ থেকে যে-কোনও কিছু চুরি হতে পারে।'

'আজ রাতে দাওয়াত দেয়া যেতে পারে তাঁকে,' রানাকে বলল সোহানা।

'ভাল হয়,' বলল রানা। 'এরপর দেরি না করে যাব স্পেনে।'

'আপনাদের জন্যে ওখানে ভাল হোটেল খুঁজে দেব,' কথা দিল সালমা। 'ও, একটা কথা বলিইনি, আমাদের অফিসের সব মেরামতি কাজ শেষ, দু'এক দিনের ভেতরেই অফিস খুলব।'

আগেও সালমার সঙ্গে কথা হয়েছে সোহানার, ও জানতে চাইল, 'অন্য চার মায়ান কোডেক্স আর লাস কাসাস সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন, সালমা?'

'হ্যাঁ,' বলল সালমা, 'আপনি বলার পর থেকেই তথ্য জোগাড়

করছি।'

রাতে রানা এজেন্সির অন্যান্য শাখার এজেন্টরা বিদায় নিল দারুণ সুস্বাদু কাচ্চি বিরিয়ানি, টিকিয়া ও বোরহানি খেয়ে। পেট পুরে খেয়েছে সবাই। নিজেদের ভেতর গল্প করছে ওরা, একজন বলল, 'এবার মাসুদ ভাই আর সোহানা আপার বিয়েটা হয়ে গেলে আমাদের আর চিন্তা থাকত না। যখন তখন হামলা করা যেত খিদে পেলেই।'

'কচু!' বলল আরেকজন। 'তখন খেতে চাইলেই এক ধমকে বিদায় করে দিত মাসুদ ভাই, তার ওপর আমাদের ওপর চাপিয়ে দিত কঠিন সব অ্যাসাইনমেন্ট।'

বিয়ের কথা ওখানেই শেষ হয়ে গেল। সবাই বিদায় নেয়ার পর রয়ে গেছে সালমা, নীচতলায় কনফারেন্স টেবিলে বসেছে ওরা। সামনে ফ্রায়ার বার্তোলোমে দে লাস কাসাসের সেই চিঠির কপি।

'সত্যিই দুর্দান্ত ছিল ডিনার,' বললেন ডক্টর রশিদ। 'অনেক দিন পর মনে পড়ল, ঠিক এমনই বিরিয়ানি রাঁধতেন আমার মা। অনেক ধন্যবাদ, সোহানা, দেশে যাই না ক-ত...বছর, আপনি মনে করিয়ে দিলেন আমার মাকে। ও, আপনাদেরকে বলিনি, আমার মা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।'

বাঙালি এক মুক্তিযোদ্ধা মায়ের কথা শুনে গর্বিতা হলো সোহানা। সত্যিই তো, ভাগ্যিস বাংলাদেশের লাখো মা জন্ম দিয়েছেন লাখো মুক্তিযোদ্ধার! নইলে বাংলাদেশটাকে ড্রাকুলার মত চুষে খেত পাকিস্তানী লোভী শয়তানের দল।

'সোহানা শুরু করুক,' বলল রানা।

'প্রথমে ধন্যবাদ দেব সালমাকে,' বলল সোহানা, 'তিনি বার্তোলোমে দে লাস কাসাসের চিঠি কপি করেছেন।' সালমার দিকে চাইল। 'আপত্তি না থাকলে সালমা খুলে বলুন সব।'

'প্রথমে ড্রেসডেন কোডেক্স নকল করেন এক ইতালিয়ান স্কলার,' বলল সালমা। 'তখনও মাদ্রিদ কোডেক্স পাওয়া যায়নি বা রাখা হয়নি মিউসো অ্যামেরিকা দে মাদ্রিদ-এ। পরে ওটা কপি করেন এক ফ্রেঞ্চ অ্যাবট। প্যারিস কোডেক্স কপি করেন এক ইতালিয়ান স্কলার, ইনি সেই একই মানুষ, ড্রেসডেন কোডেক্স আবিষ্কার করেন। মূল অরিজিনাল কোডেক্স কেউ ফেলে দিয়েছিল বিবলিয়োথেক ন্যাশনালের এক ঘরের বাস্কেটে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওটা। আমাদের কপাল ভাল, ওটার কপি ছিল।'

'ভাগ্য কাকে বলে,' বললেন ডক্টর রশিদ। '...এবার ওই চিঠি নিয়ে কী করবেন ভাবছেন আপনারা?'

'আমরা জানি এক সময়ে ওই মায়ান কোডেক্স ছিল ফ্রায়ার বার্তোলোমে দে লাস কাসাসের হাতে,' বলল সোহানা। 'ওই চিঠি প্রমাণ করে, তিনি ওটা দেখেছেন, জানতেন ওটা খুবই জরুরি বই, কাজেই রক্ষা করা উচিত।'

'স্থানীয়দের সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে অনেক লড়েছেন তিনি, ওই ভাষাও শিখেছিলেন,' বলল সালমা। 'বুঝতেন তাদের চিন্তা ও ভাবনা।'

চড়াৎ করে কপালে চাপড় দিলেন ডক্টর আক্তার রশিদ। 'এবার বুঝতে পেরেছি! আপনারা বলতে চাইছেন লাস কাসাস হয়তো মায়ান কোডেক্স কপি করেছেন!'

'যদিও আমরা নিশ্চিত নই,' বলল সোহানা। 'তবে খুঁজে দেখা যেতে পারে। দোষ তো নেই!'

'হয়তো আছে, অথবা নেই, আমরা জানি না,' বললেন ডক্টর রশিদ। 'কোথাও বলা হয়নি কোনও মায়ান বই তিনি কপি করেছেন। অবশ্য লিখেছেন, যাজকরা পুড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার বই।'

'হয়তো সে কারণেই কপি করার কথা উল্লেখ করেননি,' বলল

সালমা। 'ওই সময়ে অনেক কিছুই পোড়ানো হতো।'

সোহানা বলল, 'র‍্যাবিনালের দুর্গম মিশন ছেড়ে যাওয়ার পর মেক্সিকোর চিয়াপাসের বিশপ হন। ওখান থেকে ফেরত যান স্প্যানিশ রাজদরবারে। কলোনির ইণ্ডিয়ানদের বিষয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী উপদেষ্টা হয়ে ওঠেন। আর সে কারণেই আশা করা যায়, তিনি পনেরো শ' ছিষট্টি সালে মারা যাওয়ার আগে ভ্যালাডোলিড-এর কলেজ অভ স্যান গ্রেগোরিয়োতে যে বিশাল লাইব্রেরি দান করেন, ওখানে থাকতে পারে তাঁর নকল করা কোডেক্স।'

'হয়তো আপনার ধারণাই ঠিক,' বললেন ডক্টর রশিদ। 'ইউরোপে যাঁরাই মায়ান কোডেক্স দেখেছেন, বুঝে গেছেন জিনিসটা অত্যন্ত জরুরি, কাজেই কপি করতেও দেরি করেননি। ফোটোগ্রাফিক কপি করেছিলাম আমিও, কিন্তু আমারই ভুলে ওই চোরগুলো সব নিয়ে গেল।' আফসোস তাঁর কণ্ঠে।

চট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে লাস কাসাসের দিকে ফিরল সালমা আলী, 'অর্থাৎ আমরা একমত। আগেও ওই বই দেখেছেন লাস কাসাস, এবং স্বাভাবিক ছিল কপি করা। তা-ই যদি সত্যি হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই অন্য বইয়ের সঙ্গে রেখেছিলেন, কখনও জমা দেননি স্প্যানিশ রাজদরবারে। আর ওসব বই এখন আছে ভ্যালাডোলিড-এ। সেক্ষেত্রে মায়ান কোডেক্সের কপি গুয়াতেমালার ভেজা পরিবেশে নষ্টও হয়নি, আছে শুষ্ক পরিবেশে স্পেনে।'

'বহু "যদি" আর "হয়তো" আমাদের সবার কথায়,' বললেন প্রফেসর, 'তবে এ-ও ঠিক, নতুন পাওয়া পৃথিবীর অদ্ভুত বই সরিয়ে ফেলারই কথা ফাদার লাস কাসাসের। নইলে সব বিনষ্ট করবে ফ্র্যান্সিসকান বা এনকোমিয়েনডাসরা। তো কী করবেন তিনি? অবশ্যই নিজের সঙ্গে স্পেনে নেবেন মায়ান কোডেক্সের

কপি।'

'সত্যিই অনেক "যদি" বা "হয়তো" রয়ে গেছে, কিন্তু নানান যুক্তিও আছে ওই কপির অস্তিত্বের,' বলল সোহানা। 'আর এসব যুক্তির বিপক্ষে খুব বেশি জোরালো প্রমাণও নেই।'

'একে বলা চলে এডুকেটেড গ্যেস,' বলল সালমা। 'দেখাই যাক না? সত্যিই হয়তো আছে মায়ান কোডেক্সের কপি।'

'ঠিক আছে, আগের কথা অনুযায়ী সোহানা আর আমি যাব ভ্যালাডোলিড-এ,' বলল রানা। 'সঙ্গে নেব লাস কাসাসের চিঠির কপি। মিলিয়ে দেখব তাঁর হাতের লেখা। আর যদি পেয়েই যাই কোডেক্সের কপি, মূল বই হারিয়েছি বলে আর দুঃখ থাকবে না।'

গুয়াতেমালা সিটির প্রাচীন অংশে মিগুয়েরো অফিস ভবনে প্রকাণ্ড কক্ষের মস্ত টেবিলের ওপাশে চেয়ারে আরাম করে বসে আছে এলেনা হিউবার্ট। কয়েক বছর আগেও ক্ষমতাশালী এবং ধনাঢ্য মিগুয়েরো পরিবারের ব্যবসায়িক অফিস ছিল এটা। কলোনি আমলে এখানে বসেই সব কাজ সারতেন পরিবারের কর্তা। কিন্তু এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শুরু হলো ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ, তখন মিগুয়েরো পরিবার ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেল ইউরোপের বিলাসবহুল জীবনে। দে প্যালাসিয়ো ন্যাসানাল থেকে সামান্য দূরেই এ ভবন। এখান থেকেই মস্ত রান্‌শ্‌ নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতেন তাঁরা।

উনিশ এবং বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় ধরে এ ঘরে অফিস করেছেন মিগুয়েরো পরিবারের বড়কর্তারা। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাট পরে নিয়ে পাশের র‍্যাক থেকে ওয়াকিং স্টিক তুলে, ঠোঁটে চুরুট জ্বেলে হেঁটে যেতেন সরকারী সব অফিসে পরিবারের বিস্তৃত ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর স্বার্থ আদায় করতে। সত্যিই প্রকাণ্ড দালান, সামনেই নিচু ব্যারোকো ফ্যাসাড। ভবন

থেকে বেরিয়ে ওখানে পা রাখতে হলে খুলতে হবে দুই কবাটের কাঠের কারুকার্যময় বিশাল দরজা। ওই দুই কবাট এতই ভারী, বাধ্য হয়ে খুলবার বা বন্ধ করবার জন্য ইলেকট্রিক মোটর বসিয়েছে এলেনা হিউবার্ট। ভবনের মেঝেতে যে বসিয়েছে অ্যান্টিক টাইলস, সেই একই কারিগর তৈরি করেছিল ইগলেসিয়া দে লা মার্সেড। গুয়াতেমালা সিটির এই ভবনের প্রথমতলা পঁচিশ ফুট উঁচু, কয়েক ফুট পর পর দীর্ঘ দণ্ডের গোড়ায় অলসভাবে ঘুরছে একের পর এক সিলিং ফ্যান, যদিও গোটা বাড়ি এয়ারকণ্ডিশণ্ড।

এখানে এলেই উনিশ শ' ত্রিশ সালের ডেস্ক টেলিফোন ব্যবহার করে এলেনা, সঙ্গে রয়েছে স্ক্র্যাম্বলার। প্রতিদিন দু'বার করে ওর সিকিউরিটির দক্ষ এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে, কারও সাধ্য নেই কান পাতবে ওই ফোনে।

'গুড মর্নিং, ডগসন,' ফোনে মিষ্টি করে বলল এলেনা। 'এই লাইন পুরো পরিষ্কার, অনায়াসেই কথা বলতে পারেন।'

অন্য প্রান্তে যে-লোক, গুয়াতেমালার সম্পত্তি কিনবার অনেক আগে থেকেই বহুবার তাকে নানা কাজে ব্যবহার করেছে এলেনার পরিবার। এই তো কিছুদিন আগেও স্যান ডিয়েগোতে এফবিআই এজেন্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সে।

'এবার আপনার জন্যে কী করতে পারি, মিস হিউবার্ট?'

'স্যান ডিয়েগো থেকে পাওয়া মালের কারণে সমস্যা হচ্ছে। গুয়াতেমালা সিটিতে আমার বাড়িতে এসেছিল মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরী। এখানে আসার আগে ওরা গিয়ে হাজির হয় এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে। আমার এবং আমার কোম্পানির বদনাম করতে চাইছে এখন। কেন যেন তাদের মনে হয়েছে, খামারে ওই ড্রাগসের অপারেশনের সঙ্গে আমি জড়িত। ভাবতেও পারি না আমাকে এসব নোংরা বিষয়ে জড়াতে চাইবে কেউ।

আমি কি সামান্য কোনও ড্রাগ ডিলার? পুলিশের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে বায়না ধরেছিল, যেন সার্চ করা হয় আমার বাড়ি বা অফিস। ভাবতে পারেন কতটা বেয়াদব-বেল্লিক?'

'পুলিশ কি সার্চ করতে পারে?'

'অবশ্যই না। কিন্তু দুই পয়সার যে-কেউ আমার বিরুদ্ধে আঙুল তুলবে, এ মেনে নিতে পারছি না। গতকাল ফিরে গেছে ইউএসএতে। ভাল করেই জানি, এ দেশে তাদের কথা শুনবে না কেউ। কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে আমার কী ক্ষতি করতে চাইছে, তা জানা কঠিন। তাই চাইছি সর্বক্ষণ তাদের ওপর চোখ রাখা হোক।'

'তা অনায়াসেই করা যায়, দু'ভাবে,' বলল ডগসন। 'আপনি চাইলে স্যান ডিয়েগোর স্থানীয় কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভকে ভাড়া করতে পারেন। অবশ্য, এর ফলে প্রমাণ থাকবে যে আপনি তাকে ভাড়া করেছিলেন। কোর্টে কোনও মামলা উঠলে...'

'অন্য পথ দেখুন, প্লিয,' চট্ করে বলল এলেনা। 'স্যান ডিয়েগোতে যা ঘটেছে, সে কারণে যে-কোনও সময়ে বড় ধরনের আইনী সমস্যায় পড়তে পারি। ওই মাসুদ রানাকে হালকা চোখে দেখছি না আমি আর। ওর চোখ খুনির মত। হাল ছাড়বে না। আর ভুলে যেতে চাইলেও তাকে ভুলতে দেবে না ওই মেয়ে— সোহানা চৌধুরী! ভীষণ হিংসুটে মেয়ে বলে মনে হয়েছে ওকে আমার। ওর ভয়, আমি ওর প্রেমিককে কেড়ে নেব। তার তো আর আমার মত হাজার হাজার কোটি টাকা নেই, আছে শুধু সামান্য রূপ, ওটা ভাঙিয়েই খেতে হবে। যখন টের পেল ওর চেয়ে ঢের সুন্দরী কেউ...'

'জী, বুঝতে পেরেছি,' বলল আর্ট ডগসন। 'ওরা তো আগে দেখেনি আমাকে। কাজেই চোখে চোখে রাখতে পারব। সঙ্গে আর একজন কেউ থাকলেই হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্যান ডিয়েগো

পৌঁছে যেতে পারি।'

'অনেক ধন্যবাদ, ডগসন। পাঁচ মিনিটের ভেতর খরচের টাকা আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ।'

'আশা করি এবার নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে পারব। সত্যিই জেনে ভাল লাগছে, আপনি নিজেই এ বিষয়টা দেখবেন। স্বীকার করতে না চাইলেও, এ তো আসলে ঠিক, একা আমি সব দিক দেখতে পারব না। কে কখন ক্ষতি করতে চাইছে, কে বলবে।'

'খরচের ব্যাপারে একটু জেনে নিতে চাই। কয় হাজার ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারি?'

'কোনও লিমিট নেই। ওরা যদি ইউএসএ ত্যাগ করে, ওদের পিছনে লোক রাখবেন আপনি। চাই না আবারও হঠাৎ করে হাজির হোক আমার দোরগোড়ায়। অবশ্যই দেখবেন, আপনাদের সঙ্গে যেন আমাকে জড়াতে না পারে কেউ। আমার বা আমার পরিবারের সুনাম যেন নষ্ট না হয়।'

কথাগুলো শুনতে শুনতেই যাত্রার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে গেছে আর্ট ডগসন। বের করে ফেলেছে ক্লসিট থেকে সুটকেস। বিছানার উপর ওটা রেখে বলল, 'এরা যা-ই করুক, সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট পাবেন আপনি।'

'ঠিক আছে, ডগসন, ধন্যবাদ।'

এলেনা হিউবার্ট ফোন রাখবার পর মোবাইল না রেখে অ্যাডেলমো লোপেযের নম্বরে কল দিল ডগসন। স্যান ডিয়েগোতে কোডেক্স চুরির সময় লোপেয ছিল নাক উঁচু মেক্সিকান সংস্কৃতি মন্ত্রী।

'হাই, লোপেয। আর্ট। আমার সঙ্গে যাবে নাকি? চোখ রাখার কাজ।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'আবারও ওই স্যান ডিয়েগো। তবে অন্য দেশেও যেতে হতে পারে। এক লোক আর তার প্রেমিকার ওপর চোখ রাখব। এলেনা হিউবার্ট যা দেবে, দু'ভাগে ভাগ করে নেব দু'জন।'

'ওই মেয়ের কাজ? আমি আছি ওস্তাদ!'

'ঠিক আছে, আধঘণ্টা পর তুলে নেব তোমাকে।'

ফোন রেখে আবারও সুটকেসের দিকে মন দিল আর্ট ডগসন। সার্ভেইল্যান্সের সুবিধার জন্য নিল কালো জিন্স প্যান্ট ও নেভি ব্লু শার্ট ও নাইলন উইণ্ডব্রেকার। পায়ের জুতোও কালো। মাথায় পরবার জন্য কয়েক রঙের বেসবল ক্যাপও ঢুকল সুটকেসের ভিতর। পাশেই স্থান পেল সবুজ কয়েকটা হাইকিং প্যান্ট। ওগুলোর হাঁটুর চেন খুলে ব্যবহার করা যায় হাফপ্যান্টের মত। নীল ও ধূসর স্পোর্টস কোট এবং খাকি প্যান্টও নিল। ঠিক করেছে, লোপেযকে নিয়ে বিমান থেকে নেমে ভাড়া নেবে গাড়ি, কয়েক দিন ব্যবহার করে ওটা ফেরত দিয়ে অন্য গাড়ি নেবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, সামান্য সব পরিবর্তনের ফলে বেশিরভাগ মানুষ টের পায় না, সে আসলে আগের সেই লোকই। হয়তো একটা হ্যাট বা জ্যাকেট পাল্টে নেবে। ড্রাইভ করবে অন্য গাড়ি। বা ড্রাইভিং সিটে থাকবে লোপেয। হয়তো চোখ রাখবে ওরা কোনও রেস্টুরেণ্টের টেবিল থেকে। কেউ সন্দেহ করবে না ওরা আসলে কী করছে।

সুটকেস গুছিয়ে নেয়ার পর বাড়তি কিছু ইকুইপমেণ্ট ভরল ডগসন। তার ভিতর থাকল শুটার্স ৬০-পাওয়ারের স্পোর্টিং স্কোপ, সঙ্গে ট্রাইপড। এ ছাড়া রইল.. গোপন কমপার্টমেণ্টে অস্ত্র ও অ্যামিউনিশন। এক্স-রে বা আর কোনও ডিটেকটিং মেশিন ওগুলো ধরতে পারবে না। জানা কথা, লোপেযও সঙ্গে পিস্তল নেবে। সবসময় তাই করে। এমন কী লস অ্যাঞ্জেলেসেও। বুটের ভিতর থাকে ছোরা। আগে একদল বদমাশ রাজনৈতিক নেতার

হয়ে চাঁদা তুলত ও। তারপর চাকরি নিল পুলিশে। কিন্তু ওই চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর এখন ওকে দেখলে মনে হয়, সত্যিকারের কোনও মেক্সিকান রাজনীতিক বা বিচারক। ওর অভিজাত ওই চেহারার কারণে বাড়তি অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। কেউ ভুলেও ভাবতে পারে না, এই লোক দুনিয়ার চিট। চমৎকার স্প্যানিশও বলে, অনেক সময় সেটাও কাজে আসে।

হাতে এ ধরনের কাজ নিলে সবসময় সবদিক বুঝে মাঠে নামে ডগসন, এবার তা হলো না। তবে ভাবনার কিছুই নেই, কোনও সমস্যা হলে সামলে নেবে। সঙ্গে নিল পাসপোর্ট, নগদ পাঁচ হাজার ডলার এবং ল্যাপটপ। বাড়ির সদর দরজা লক করে সুটকেস নিয়ে নেমে এল গাড়ির পাশে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। না, মনে পড়ল না এমন কিছু, যেটা ভুলে ফেলে এসেছে। গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেল লোপেযের বাড়ির উদ্দেশে। ভাবছে সামনের কাজটা নিয়ে।

ক্যাঙারুর মত বড় বড় লাফে এগোতে চাইছে এলেনা হিউবার্ট। বুঝতে চাইছে আসলে সে কে। অন্যায় করতে সামান্যতম দ্বিধা করছে না। ওর মত অনেকের হয়েই কাজ করেছে আর্ট ডগসন। এরা ছোট সব অপরাধ করেই ধীরে ধীরে বড় অপরাধ করবার সাহস পেয়েছে। ভাবতে শুরু করেছে অন্যদের চেয়ে বেশি বোঝে, কাজেই নেতৃত্ব দেয়ার অধিকারও আছে। বেপরোয়া সাহসের কাজ করে, ওসব থেকেই এসেছে বিপুল টাকা। এবং একবার প্রচুর টাকা হয়ে গেলেই ওই টাকার জোরে বাড়তি সুবিধা আদায় করেছে। এতে কোনও দোষও নেই, ভাবল ডগসন। এরা একসময় নিজেদের পথ পরিষ্কার রাখতে গিয়ে বাধ্য হয় মানুষ খুন করতে। নিজ হাতে যে খুন করে, তাও নয়, ভাড়া করে উপযুক্ত কাউকে। নিজ চোখে এদের দেখতে হয় না রক্ত। ড্রাগসের খেত করেছে বলে এলেনা হিউবার্টকে পয়সা

দিচ্ছে ড্রাগ লর্ড অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো। কেউ বলতে পারবে না, আসলে অন্যায় করছে এলেনা হিউবার্ট! পান থেকে চুন খসলেই মানবহত্যা করে অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো। ওই একই পথে চলেছে এলেনা। তার বাবা মিস্টার হিউবার্টও ওসব রাস্তা পেরিয়ে গেছেন অনেক আগেই। তাঁর হয়ে ডগসনের প্রথম কাজ ছিল, এক লোককে খুন করা। সেই লোক ছিল ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী। আদালতে মিস্টার হিউবার্টের বিরুদ্ধে কেস করতে গিয়ে খুন হয়ে যায়।

এখনও কাউকে হত্যা করতে বলেনি এলেনা হিউবার্ট, তবে প্রয়োজন পড়লেই নির্দেশ দেবে। এ শুধু সময়ের ব্যাপার। আর সেক্ষেত্রে শেষ করে দিতে হবে মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরীকে। ডগসন বুঝল, অফিসে থেমে বাড়তি আরও কিছু জিনিস গুছিয়ে নেয়াই ভাল।

কিছুক্ষণ পর গাড়ি রাখল তার অফিসের পিছনে। বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে অফিসের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। জ্বেলে নিল বৈদ্যুতিক বাতি। চলে গেল পিছন দেয়ালের ফাইল কেবিনেটের সামনে। দেরাজ খুলে বের করে নিল ক্ষুরের মত ধারালো দুটো সিরামিক ছোরা। ধরা পড়বে না মেটাল ডিটেক্টরে। এ ছাড়া, চামড়ার কেসে ভরল ডায়াবেটিক ট্র্যাভেল কিট, নিডল ও ইনসুলিনের বোতল। শেষ জিনিসটা সত্যিকারের ইনসুলিন নয়, সার্জনদের ব্যবহৃত ইনেকটিন। ওটা দিয়ে থামিয়ে দেয়া হয় হৃৎপিণ্ড। অস্ত্রোপচার শেষে আবারও ওই অঙ্গ চালু করতে অ্যাড্রেনালিন ব্যবহার করেন ডাক্তার। কিন্তু ওই জিনিস চাই না ডগসনের। তার কাজ একেবারেই আলাদা। চামড়ার কেস খুলে প্রেসক্রিপশন ডেট দেখে নিল। তারিখ অনুযায়ী কোম্পানি থেকে বাজারে এসেছে ওষুধ মাত্র একমাস আগে। অফিস থেকে বেরিয়ে এল সে। গাড়ির পিছন সিট থেকে সুটকেস নিয়ে ভিতরে রেখে

দিল মেডিকেল কিট ও সিরামিক ছোরা।

অ্যাডেলমো লোপেযের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে সন্তুষ্ট বোধ করল ডগসন। এলেনা হিউবার্ট একবার মনস্থির করলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে ওরা। সমাজের উঁচু পর্যায়ের কাস্টমাররা অনিশ্চয়তা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। অপেক্ষাও করতে চায় না। তারা আকাশের ঈশ্বরের মতই হুকুম জারি করে—এক্ষুনি সব হোক!

সতেরো

সব গুছিয়ে নিয়ে দু'দিন পর বিমানে করে স্যান ডিয়েগো ত্যাগ করল মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী। একবার থামতে হলো নিউ ইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্টে। ওখানে সন্ধ্যার দিকে ভিন্ন বিমানে চেপে পরদিন সকালে পৌঁছে গেল মাদ্রিদ-বারাজাস এয়ারপোর্টে।

গুয়াতেমালায় ইকো-টুরিস্টের মতই হাইকিং করেছে রানা ও সোহানা, পরনে ছিল পুরনো ট্রপিকাল পোশাক, পিঠে ব্যাকপ্যাক। কিন্তু এবার ইউরোপে পা রাখল ধনী দুই আমেরিকান টুরিস্টের মতই। যে-কেউ একপলক দেখলেই বুঝবে, এই প্রেমিক-প্রেমিকা চুটিয়ে ফুর্তি করছে বিয়ের ক'দিন আগে।

লাগেজ অত্যন্ত দামি। কোম্পানি থেকে সুটকেসের সঙ্গে সেলাই করা চামড়ার ট্যাগে এমবস করা ওদের নাম। রানার সুটকেস ভরা ব্রিওনি সুট। ক'দিন আগে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এক অ্যাসাইনমেন্টের সময় বাধ্য হয়ে রোম থেকে কিনতে হয়েছিল

ওগুলো। আর দ্বিতীয় লাগেজে রয়েছে সোহানার শখের কিছু পোশাক, স্যাণ্ডেল ও গহনা। রানা ওকে কিনে দিয়েছে ফেনডি পার্ফোরেটেড লেদারের সিল্ক লাইনিং করা স্লিভলেস ড্রেস। এ ছাড়া, আরও রয়েছে ডোলচে অ্যাণ্ড গ্যাবানা ফ্লোরাল প্রিন্টের ড্রেস, শর্ট জে. মেণ্ডেল সিল্ক ক্রু-নেক ড্রেস। শেষেরটি পরে শো-রুমে হেঁটে আসতেই চমকে গিয়েছিল রানা সোহানার চেহারার জৌলুস দেখে। যেসব মহিলার সঙ্গে প্রেমিক বা স্বামী ছিল, তারা গোপনে অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটির দিকে চাইতে গিয়ে ধরা পড়েছে সঙ্গিনীর কাছে। আর হিংসায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়েছে মহিলাদের হৃদয়।

সত্যিই যদি স্পেনের ওই লাইব্রেরি দালানে কোডেক্সের কপি থাকে, প্রচার হলে হৈ-হৈ করে উঠবে গোটা দুনিয়া, আর সেক্ষেত্রে জানা কথা, সরাতে পারবে না ওরা ওই কপি; শুধু তা-ই নয়, ছবিও তুলতে দেবে না কর্তৃপক্ষ। কাজেই ওদের লাগেজে রেখেছে খুদে ডিজিটাল স্পাই ক্যামেরা। তার দুটো আছে দুই হাতঘড়িতে, অন্য দুটো হালকা চশমার সঙ্গে। যদি পাওয়া যায় কোডেক্সের কপি, গোপনে ছবি ও ভিডিয়ো তুলবে ওরা।

ট্র্যান্সঅ্যাটলাণ্টিক ফ্লাইটে ফার্স্ট ক্লাসে করে এসেছে ওরা, এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল চ্যামার্টিন রেল-স্টেশনে, টিকেট কেটে উঠে পড়ল ভ্যালাডোলিড শহরগামী ঝকঝকে আলটা ভেলোসিড্যাড এস্পানোলা বুলেট ট্রেনে। এক শ' ত্রিশ মাইল দূর গন্তব্যে পৌঁছুতে লাগল ঠিক এক ঘণ্টা দশ মিনিট। পথের মাঝে ছিল সতেরো মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। ওদের জন্য যেনিস্ট ইমপেরিয়াল হোটেলে রিযার্ভেশন রেখেছে সালমা আলী। ওই প্রাসাদ পনেরো শ' শতাব্দীর, পাশেই টাউন হল ও প্লাযা মেয়র। সালমা জরুরি আরও একটি কাজ করেছে, ইণ্টারনেট থেকে সোহানার আইপ্যাডে ডাউনলোড করে দিয়েছে ভ্যালাডোলিড-এর ডিজিটাল গাইডবুক।

প্রথম দিন পুরো শহর ঘুরবে ঠিক করল রানা ও সোহানা। কেউ খেয়াল করলে বুঝবে, ওরা সত্যিই ধনী টুরিস্ট, সময়ের অভাব নেই। ভ্যালাডোলিড শহরের নতুন অংশ ব্যস্ত উৎপাদনে, বড় বড় সব কোম্পানি বা কারখানা হাজির হয়েছে ওখানে, সত্যিকারের যোগাযোগের মিলনস্থল, মস্ত বাজারে বিক্রি হচ্ছে কোটি কোটি ডলারের নানান জাতের শস্য। রানা ও সোহানার অবশ্য ভাল লাগল শহরের পুরনো অংশ। এদিকটা মধ্যযুগীয় চেহারা নিয়ে যেন গর্বিত।

দ্বিতীয় দিন এক জায়গায় এসে গাইডবুক পড়ে রানাকে বলল সোহানা, 'দ্বাদশ শতাব্দীতে মুরদের কাছ থেকে এ শহর দখলমুক্ত করেছিল স্প্যানিয়ার্ডরা। দুঃখের কথা, ওরা ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে ভুলে গিয়েছিল আসলে ভ্যালাডোলিড শব্দের মানে কী। কাজেই আমরাও জানি না।'

'আরও কী বলে তোমার গাইডবুক?' মৃদু হাসল রানা। 'আরও কিছু হারিয়ে যায়নি?'

'গেছে। তবে আমরা জানি তাদের কথা। ভ্যালাডোলিডে বাস করতেন ক্যাস্টাইল রাজবংশ। এখানেই বিয়ে হয়েছিল রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড আর রানি ইসাবেলার। এখানেই মারা যান কলাম্বাস। এখানেই ডন কুইক্সোটের একটা অংশ লেখেন সার্ভ্যান্টেস।'

দুপুরে ওরা গেল কোলেসিয়ো দে স্যান গ্রেগোরিয়োতে। নতুন দুনিয়া থেকে ফিরে এসে এখানেই কয়েক বছর বাস করেন লাস কাসাস। বিশাল পাথুরে দালানের সামনে দিয়ে হাঁটছে ওরা, চোখ বোলাল সোহানা গাইডবুকে। 'আমাদের সামনের ওই চ্যাপেলের পোর্টাল তৈরি করেছিলেন অ্যালনসো দে বার্গোস। তিনিই ১৪৮৮ সালে রানি ইসাবেলার কনফেসর ছিলেন। চ্যাপেলের সব কাজ শেষ হয় ১৪৯০ সালে।' পাথরের পেভমেন্ট দেখাল সোহানা। 'আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এখানেই একসময় পা

রেখেছেন রানি ইসাবেলা, রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড আর ক্রিস্টোফার কলাম্বাস।'

লম্বা হাই তুলল রানা। 'হয়তো আমার মতই এখানে শেয়ালের মত হাই তুলেছেন বার্তোলোমে দে লাস কাসাস।'

'যাহ্!' বলেও ফিক করে হেসে ফেলল সোহানা। 'দেখো কী অবিশ্বাস্য আর্কিটেকচার?'

'হুঁ। বাকিটা আমি বলছি,' বলল রানা। 'লাস কাসাস এখানে বাস করতে আসেন পনেরো শ' একান্ন সালে। কলেজ থেকে ভাড়া করেন একটা ঘর। তিনি তখন খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন সম্রাট চতুর্থ চার্লসের রাজদরবারে। মারা যান পনেরো শ' ছিষট্টি সালে মাদ্রিদে। কিন্তু তাঁর মস্ত গ্রন্থাগার দান করেন এই কলেজে। আর সোহানা বিবির পরের অ্যাসাইনমেণ্ট তাঁর কপি করা মায়ান কোডেক্স খুঁজে বের করা।'

'অঁউ?' শুনে পথের আরেক দিকে চাইল ওরা।

ওখানে থেমেছে কয়েক জার্মান টুরিস্ট।

তাদের ওপর লেকচার ঝাড়ছে তালগাছের মত লম্বা সোনালী চুলের এক মহিলা গাইড।

তাদের দলে ভিড়ে গেছে আরও দুই টুরিস্ট। এরা সেই আমেরিকা থেকে রানা ও সোহানাকে অনুসরণ করে হাজির হয়েছে স্পেনে। শিকার কলেজের এণ্ট্র্যান্স পেরিয়ে ভিতরে পা রাখতেই জার্মান টুরিস্টদের থেকে আলাদা হয়ে পিছু নিল আর্ট ডগসন ও অ্যাডেলমো লোপেয।

সোহানার কথায় চ্যাপেলে গিয়ে ঢুকল রানা। ধবধবে সাদা পাথরের কারুকার্যময় দালান, পাঁচ শ' বছর ধরে একই রকম ঝকঝক করছে। ভিতরে থমথমে নীরবতা। যেন বাইরে রয়ে গেছে সময়, ভিতরে ঢুকবার অনুমতি নেই তার।

'বোধহয় দোতলায় ঘর ভাড়া করেছিলেন লাস কাসাস,' বলল

সোহানা। 'ওখানে বসেই লিখেছিলেন শেষ কয়েকটি বই।'

চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে কলেজের মস্ত প্রাঙ্গণে ঢুকল ওরা। আবারও গাইডবুক পড়তে শুরু করেছে সোহানা। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এখানে সবসময় চমৎকার কাটেনি লাস কাসাসের জীবন। পনেরো শ' উনষাট সালে ভ্যালাডোলিডে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে সাতাশজন মানুষকে পুড়িয়ে মারে একটা ইনকুইযিশন। এক পর্যায়ে লাস কাসাসের বিরুদ্ধেও তৎপর হয়ে ওঠে শত্রুরা, মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষে কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে রক্ষা। লাস কাসাস যখন কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাঁর লেখা হিস্টরি অভ দ্য ইণ্ডিযের স্বত্ব দিয়ে দিলেন, শর্ত আরোপ করলেন: তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার আগে ওই বই ছাপা চলবে না। আরও বললেন, পাপের কারণে সত্যিই যদি স্পেনকে ধ্বংস করেন মহান ঈশ্বর, সেক্ষেত্রে পরবর্তী মানুষগুলো যেন জেনে যেতে পারে, কোন্ পাপে তাদের সর্বনাশ হচ্ছে। কখনোই ইণ্ডিয়ানদেরকে ভয়ঙ্করভাবে অত্যাচার, নির্যাতন বা খুন করা উচিত হয়নি স্প্যানিয়ার্ডদের।'

'আগামীকাল তাঁর লাইব্রেরি খুঁজে নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব,' বলল রানা।

হাঁটতে শুরু করে একটু পর ওরা পেয়ে গেল স্পেনের স্কাল্পচার বিষয়ক জাদুঘর। এণ্ট্র্যান্সের কাছেই ডেস্ক নিয়ে বসেছে এক লোক। কাছাকাছি পৌঁছে ফিসফিস করল সোহানা, 'দেখা যাক!' স্প্যানিশে জানাল, 'সেনর, আপনি কি জানেন, ঠিক কোথায় পাব বিশপ বার্তোলোমে দে লাস কাসাসের লাইব্রেরি?'

'নিশ্চয়ই জানি, মাদাম,' বলল লোকটা। 'হয়তো জানেন, ওটা আসলে ইউনিভার্সিটি অভ ভ্যালাডোলিডের অংশ?'

'সব বই কি সরিয়ে নেয়া হয়েছে আধুনিক কোনও ইউনিভার্সিটিতে?'

হাসলেন ভদ্রলোক। 'ওই ইউনিভার্সিটি চালু হয়েছে তেরো শ' ছেচল্লিশ সালে। আধুনিকই বলতে পারেন। আজও শিক্ষাদানে নিয়োজিত। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা একত্রিশ হাজার। ইউনিভার্সিটির ছোট একটা অংশ কলেজ অভ স্যান গ্রেগোরিয়ো, আর ওখানে আছে ওই হিস্টরি লাইব্রেরি। আজকাল অবশ্য ওই কলেজ ব্যবহার করা হচ্ছে শিল্প এবং স্থাপত্য বিষয়ক জাদুঘর হিসেবে।'

'কোন্ পথে গেলে পাব হিস্টরি লাইব্রেরি?'

'গোনডোমার স্ট্রিট ধরে যান মেইন ইউনিভার্সিটিতে। বাইরে প্যাটিয়ো, ওখান থেকে আট পিলারে ভর করে তিন ধাপে উঠেছে দালান। ডানদিকে পাবেন চ্যাপেল, বামদিকে প্রায় গোল একটা বারান্দা। ওদিকে গেলে প্রথমতলায় হিস্টরি লাইব্রেরি।'

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। তখনই দ্বিতীয়বারের মত লোক দু'জনকে দেখল রানা। তারা গোনডোমার স্ট্রিটে, অনেকটা পিছনে। মনে হলো পিছু নিয়েছে। চট্ করে এলেনা হিউবার্টের কথা মনে পড়ল রানার। ওরা সতর্ক করে এসেছে ওই মেয়েকে। ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, ওদের কাছ থেকে মায়ান কোডেক্স চুরি করলেও, হাল ছাড়বে না ওরা।

কিন্তু গুয়াতেমালা সিটি হাজার হাজার মাইল দূরে, আর ওরা আছে ভ্যালাডোলিডোতে।

তবুও পিছু নিয়েছে কেউ?

অসম্ভব নয়!

হিস্টরি লাইব্রেরির সামনে পৌঁছে গেল ওরা।

দালানে ঢুকে লাইব্রেরিয়ানের কাছে জানতে চাইল সোহানা, বার্তোলোমে দে লাস কাসাসের বইয়ের কালেকশন দেখতে পারে ওরা?

লাইব্রেরিয়ান জানালেন: সাধারণত কাউকে দেখতে দেয়া হয় না ওই কালেকশন, কিন্তু ভিজিটিং স্কলার হিসাবে ফর্ম পূরণ

করলে, দেখতে দেয়া হবে যে-কোনও বই।

একহাত লম্বা ফর্ম পূরণ করতে হবে না। নিজ পরিচয় নিশ্চিত করাই যথেষ্ট। আর বাইরের ডেস্কে রাখতে হবে সোহানার পার্স আর ওদের পাসপোর্ট।

পাঁচ মিনিট পর ফরমালিটি শেষে মস্ত এক রিডিং রুমে ঢুকল ওরা। দুপুর পেরিয়ে চলেছে, এখনও টেবিলে পুরনো কিছু বই নিয়ে তাতে বুঁদ হয়ে আছে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরা।

দ্বিতীয় হিস্টরি লাইব্রেরিয়ান ওদেরকে নিয়ে গেল রেয়ার বুক রুমে। দেয়া হলো রাবারের গ্লাভ্স্। ওগুলো পরে নিয়ে দেখতে পারবে ওরা লাস কাসাসের মোটা সব বইয়ের ভলিউম।

তিনঘণ্টা পর আজকের মত বন্ধ হবে লাইব্রেরি।

প্রথম ভলিউম থেকে শুরু করল রানা ও সোহানা। প্রতিটি ভলিউম চামড়া দিয়ে বাঁধানো, অথবা নতুন করে বাঁধাই করা হয়েছে। কোনও কোনও বই ল্যাটিন বা স্প্যানিশ ভাষায় হাতে লেখা। আর্কেইক স্টাইল। কোনওটা ইনকিউনাবিউলা, পনেরো শ' সালের আগে প্রিন্ট করা। কিছু মেডিইভেল গথিক স্ক্রিপ্ট পাওয়া গেল, হাতে রং করা। বেশিরভাগ লেখা ল্যাটিন ভাষায়, বিষয় ধর্ম। বেশিরভাগ বই-ই বাইবেলের বিষয়ে মন্তব্য, প্রার্থনা মূলক সারমন, অথবা ব্রেভিয়ারি। এক কপি মিলল দি করপাস অ্যারিসটোটেলিকাম। কপি করা হয়েছে স্প্যানিশ ভলিউম, মায়ান কোডেক্সে পাওয়া লাস কাসাসের হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

ওই হাতের লেখা পরিচিত হয়ে গেছে ওদের কাছে, কিন্তু মিলল না যে রত্নের জন্য এসেছে। ওটা স্প্যানিশ ভাষায় লেখা নয়, ওখানে থাকবে মায়ান ছবি ও গ্লিফ।

দিন শেষে লাইব্রেরি বন্ধ করে দেয়ার সময় এল, লাইব্রেরিয়ান জানিয়ে দিল, এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সব বই।

ওদের কাছ থেকে ভলিউম ফেরত নিয়ে র‍্যাকে রাখল লাইব্রেরিয়ান।

ওদের পাসপোর্ট আর সোহানার পার্স সংগ্রহ করে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

দালানের প্যাটিয়োতে সোহানা ফিসফিস করে বলল, 'আগে দেখেছ ওই দুই লোককে?'

ভাব দেখে মনে হলো মনোযোগ দিয়ে স্প্যানিশ আর্কিটেকচার দেখছে রানা, তবে দেখেছে লোক দু'জনকে। এইমাত্র আরেক দিকে রওনা হয়েছে তারা।

'আগেও দেখেছি গোনডোমার স্ট্রিটে। ভাবছ পিছু নিয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার দিকেই চেয়ে ছিল।'

'তোমার রূপে ঝলসে গেছে ওদের চোখ,' মৃদু হাসল রানা।

'ছাই!' গম্ভীর হয়ে গেল সোহানা।

আকাশটাকে রক্তিম করে বিদায় নিয়েছে সূর্য, তার মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই ঝপ্ করে নেমে এল আঁধার। অবশ্য হোটেলের কাছেই হাজারো বাতি বুকে নিয়ে ঝলমল করছে প্লাযা মেয়র। কণ্টিনেন্টালে ঢুকে ওদের বিখ্যাত কফি নিল, সেটা শেষ করে রাতের খাবারের জন্য গেল নামকরা রেস্টুরেন্ট লস য্যাগালেস-এ। হোটেলে ফিরল রাত দশটা পার করে।

এরপর থেকে প্রতিদিন যেনিট ইমপেরিয়াল হোটেল থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হতে লাগল হিস্টরি লাইব্রেরিতে। একে একে ঘাঁটছে পাঁচ শ' বছর আগের সব বই।

শেষ বিকেলে লাইব্রেরি বন্ধ হলে ফিরছে হোটেলে। রাত আটটায় গিয়ে ঢুকছে নামকরা কোনও রেস্টুরেণ্টে। এরই মাঝে ট্যাবের্না প্রাডেরা, ফর্চুনা ২৫, ট্যাবের্না দেল যুর্ডোর সুস্বাদু খাবার মুগ্ধ করেছে ওদেরকে। রানার কথায় একদিন স্প্যানিশ রেড

ওয়াইন রিউয়েডা ও রিবেরা দেল ডিউয়েরো চেখে দেখল সোহানা।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন কাটছে ওদের সত্যিকারের স্বর্গে।

দিনের বেশিরভাগ সময় পার করছে লাস কাসাসের কালেকশন পড়ে। ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে ওই মানুষটার হৃদয়। বেশিরভাগ বই সন্ন্যাস জীবনের উপর লেখা। যেমন একটি বই: রুল অভ সেইন্ট বেনেডিক্ট। অথবা, মোরালিয়াম লিব্রি অভ পোপ গ্রেগোরি ওয়ান। সবই ষোলো শতাব্দীর সন্ন্যাসীদের জন্য উপযোগী। কয়েক কপি টমাস অ্যাকিউনাসের বই পেল ওরা। সঙ্গে রয়েছে ওই বিষয়ে মন্তব্য লেখা নোট।

লাইব্রেরিতে অষ্টম দিনে এক সারিতে বেশ কিছু স্প্যানিশ ভলিউম পেল ওরা। প্রতিটি ভেলাম নিজ হাতে লিখেছেন লাস কাসাস। লম্বা লেজারের মত বাঁধাই করা খাতা। এখানেই পাওয়া গেল মেক্সিকোতে লেখা তাঁর প্রথম বই। ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'কিশে' ভাষার বর্ণ, পদ ও বাক্যের। মায়াদের আরও কয়েকটি ভাষার কথাও উল্লেখ করেছেন। বইটি পনেরো শ' ছত্রিশ সালের। পরের বইটি ডায়েরি, তাঁর স্থাপিত র‍্যাবিনাল, স্যাকাপুলাস ও কোব্যানের ডোমিনিকান মিশনগুলোর প্রতিদিনের কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। বাদ পড়েনি খরচের হিসাবও। লিখে রেখে গেছেন ধর্মান্তরিত প্রতিজন মায়ার আগের নাম এবং তাঁর দেয়া নতুন নাম। এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, একসঙ্গে হাজার মানুষকে ধর্মান্তরিত করার নিয়ম তাঁর কাছে যৌক্তিক মনে হয়নি। ক্যাথোলিক ধর্মে এলে সেই মানুষটাকে সমান অধিকার দেয়া উচিত, ইত্যাদি।

পরের ভলিউম পনেরো শ' ছত্রিশ সালের অক্টোবর মাসের। লেখা শেষ হয়েছে পনেরো শ' সাঁইত্রিশ সালে। আগের মতই কলাম করে লেখা লাইন। অসংখ্য পৃষ্ঠা একইরকম।

এক পর্যায়ে পাল্টে গেছে ভলিউম। এখান থেকে শুরু হয়েছে

ভেলাম, অর্থাৎ কোনও পশুর চামড়া ছিলে তার ওপর লেখা। চেঁছে রোম তুলে নেয়ায় সাদা হয়ে উঠেছে সার্ফেস। একসঙ্গে পঞ্চাশ বা ষাটটি পৃষ্ঠা। এখানে একেবারেই অন্যরকম ভেলাম। পিউমিস পাথর বা এ ধরনের কিছু দিয়ে মেজে পাতলা করে নেয়া হয়েছে চামড়া।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এসে আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখল ওরা। মনে হলো চোখের সামনে দেখছে চুরি হয়ে যাওয়া সেই মায়ান কোডেক্স। নিখুঁতভাবে তাঁর বাঁধাই করা খাতায় তুলে ধরেছেন বার্তোলোমে দে লাস কাসাস মায়ান ছবি।

আস্তে করে সোহানার বাহু ধরল রানা, পড়তে শুরু করেছে পরিচিত স্প্যানিশ বাক্যগুলো। ওখানে লিখেছেন লাস কাসাস: "মঙ্গল হোক সবার। এই বই এবং মায়াদের অন্যান্য কোনও বই-ই অভিশপ্ত নয়। এসব বইয়ে আছে ওদের ইতিহাস এবং গোটা পৃথিবীর বিষয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণালব্ধ তথ্য। যেভাবে হোক সংরক্ষণ করতে হবে এসব বই। নইলে অনেক জ্ঞান হারিয়ে যাবে, আমরা জানব না মায়া জাতির মানুষকে।..."

'সাহস নেই, বুক কাঁপছে,' বলল সোহানা। 'উল্টে দেখব আরেকটা পাতা?'

'হ্যাঁ।' নিচু হয়ে গেল রানার কণ্ঠ।

খুব সাবধানে পরের পাতা মেলল সোহানা।

ওদের মনে হলো আবারও দেখছে মেক্সিকান আগ্নেয়গিরির সেই মায়ান কোডেক্স।

ধীরে ধীরে পৃষ্ঠা ওল্টাতে শুরু করেছে ওরা।

ভেলামের প্রতিটি পাতায় ছবি ও সিম্বল। সবচেয়ে জটিল চার পাতার মানচিত্র। মায়ান ভাষায় বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কীভাবে সৃষ্টি হলো মহাবিশ্ব। আরও রয়েছে একের পর এক শহরের লড়াইয়ের কথা। খুব তীক্ষ্ণ নিব ব্যবহার করে লেখা হয়েছে প্রতিটি গ্লিফ।

নিখুঁত করা হয়েছে সব।

'অপেক্ষা করো,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা, পুরুষদের টয়লেটে ঢুকে নিশ্চিত হলো কেউ নেই, এবার স্যাটালাইট ফোনে কল দিল স্যান ডিয়েগোর রানা এজেন্সির শাখা প্রধানকে।

'সালমা? রানা বলছি।'

'বলুন?'

'ওটা পেয়েছি। সবই আছে। এক মিনিট পর লাইভ ভিডিয়ো শুরু করব। তৈরি থাকুন। ওই ঘরে কথা বলা চলবে না।'

'বুঝেছি। চারটে ক্যামেরা ব্যবহার করবেন, মাসুদ ভাই।'

'ঠিক আছে।'

টয়লেট থেকে সরাসরি আর্কাইভ রুমে ফিরল রানা, ফিসফিস করে সোহানাকে বলল, 'তোমার চোখ ব্যথা হয়ে যায়নি? চশমা পরে নাও।'

চশমা নাকে তুলল ওরা। চালু করে দিয়েছে ক্যামেরা। আবারও প্রথম পাতা থেকে শুরু করল। চশমার ক্যামেরা ব্যবহার করে ডিজিটাল ভিডিয়ো পাঠাচ্ছে সালমার কাছে। টের পেল, কত যত্নে কাজ করেছেন লাস কাসাস। অবশ্য রং দেননি চিত্রে, এ ছাড়া সবই ঠিক আছে। প্রতিটি কলাম নিখুঁত। কখনও ছয় কলাম নকল করেছেন, আবার কখনও আট কলাম। মূল থেকে এক চুল সরেননি। কোনও পৃষ্ঠায় অ্যারাবিক নম্বর দেননি। তবে রানা ও সোহানা বুঝল, প্রথম ত্রিশ পৃষ্ঠা একেবারেই আগের মতই আছে। ওদের চশমার ডাঁটিতে খুদে ইয়ারপিসে পিনপিন করে আসছে সালমার কণ্ঠ: 'পরিষ্কারভাবে আসছে সব ছবি। ঠিক আছে, এগোতে থাকুন।'

ধীরে ধীরে পুরো এক শ' ছত্রিশ পৃষ্ঠার বই ফিল্ম করল ওরা। কাজ শেষে বইয়ের পিছন থেকে শুরু করল স্থির চিত্র গ্রহণ। একটি পাতাও বাদ পড়ল না। ব্যবহার করল হাতঘড়ির ক্যামেরা।

অনেকক্ষণ পর চশমা খুলে জ্যাকেটে রেখে দিল ওরা।

ক্লান্ত সুরে বলল রানা, 'মাথা-ব্যথা করছে। চলো, হোটেলে ফিরি।'

ভলিউমগুলো লাইব্রেরিয়ানের কাছে জমা দিল ওরা, বদলে বুঝে নিল সোহানার পার্স, পাসপোর্ট ও ক'দিন আগে কেনা রানার ব্রিফকেসটা। লাইব্রেরিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দালান থেকে।

শেষ বিকেলের হলদে রোদে দালান ছেড়ে রাস্তায় নামল ওরা। ধীর পায়ে চলেছে হোটেল লক্ষ্য করে। সোহানাকে বলল রানা, 'খুব সাবধানে রাখতে হবে আমাদের চশমা আর হাতঘড়ি।'

'তা তো বটেই,' সায় দিল সোহানা।

ক্যালে দে স্যান গ্রেগোরিয়ো ধরে চলেছে প্লাযা মেয়রের দিকে, চারপাশে অসংখ্য মানুষ, তাদের মাঝ দিয়ে হাঁটছে ওরা। এ মুহূর্তে এদিকে কোনও টুরিস্ট নেই। প্লাযার আধাআধি পথ পাড়ি দিতেই নতুন আওয়াজ শুনল ওরা। গম্ভীর, ঘড়ঘড় শব্দ তুলছে ভারী মোটরসাইকেল। পিছন থেকে আসছে দ্রুত গতিতে।

সন্দেহ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে সোহানা।

রানা বোধহয় বড্ড ক্লান্ত, অথবা কিছু নিয়ে চিন্তিত— ঝট করে ঘুরবার আগেই সর্বনাশ হলো।

মোটরসাইকেলে চেপে চিলের মত এসেছে দুই আরোহী। মাথায় টিন্টেড ভাইযরওয়ালা হেলমেট। পিছনের লোকটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল অন্যমনস্ক রানার হাতের ব্রিফকেস। খপ করে হ্যাণ্ডেল ধরেছে ওই লোকও, জোর টান খেয়ে কয়েক পা সামনে বেড়ে গেল রানা। শুধু বলতে পারল, 'আরে! আরেহ্!' তখনই ওর হাত থেকে ফস্কে গেল হ্যাণ্ডেল।

পরক্ষণে ব্রিফকেস নিয়ে ঝড়ের গতি তুলে হাওয়া হয়ে গেল মোটরসাইকেল।

'যাহ্!' আফসোস ঝরল সোহানার কণ্ঠে, 'ওরা তো নিয়ে গেল তোমার ব্রিফকেস!'

'যাক নিয়ে, শালারা দুনিয়ার বদ,' সোহানাকে অবাক করে মৃদু হাসল রানা। 'আমি কি ওদের সাথে পারি?'

'রানা! ওরা ব্রিফকেস নিয়ে গেল, আর তুমি হাসছ? পাগল হলে? পুলিশে...'

'দরকার নেই,' হাসিটা চওড়া হলো রানার। 'গত কয়েক দিন ধরেই পিছু নিয়েছে। নিজেদেরকে খুব চালাক মনে করে। তাই দিয়েই দিলাম প্রজেক্টের মাল।'

'কী ধরনের প্রজেক্ট?' চোখ সরু করল সোহানা।

'ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট।'

'ঠাট্টা না, রানা!'

'লুটেরাদের বুবি-ট্র্যাপ্ড্ ব্যাগ দেয় কোনও কোনও ব্যাঙ্ক...

'ওই যে, যেগুলো ফুটুশ্ করে ফাটে চোরের মুখের সামনে, আর ছড়িয়ে পড়ে কালি? কিন্তু বিমানে করে এক্সপ্লোসিভ আনলে কী করে?'

'ওই জিনিস না, আমার জিনিস ঠিকভাবে কাজ করে স্প্রিঙের জোরে। ব্যাটা খুলুক ল্যাচ, দু'সেকেণ্ড পর ওর মুখে ছিটকে পড়বে সিলিণ্ডারের একগাদা তরল নীল কালি।'

'যদি সন্দেহ করে ব্রিফকেস খুলত লাইব্রেরিয়ান?' মুচকি হেসে ফেলল সোহানা।

'প্রথম দু'দিন যখন খোলেনি, পরে কেন খুলবে?'

'লোকটার কী ধরনের শাস্তি হবে ভাবছ?'

'বেশ ক'দিন আয়নায় দেখবে নিজের নীল মুখ, কোথাও যেতে পারবে না। এরা এখানে ওটার নাম দিয়েছে: "আয়ুল"।'

'চিরশত্রু হয়ে গেল ওরা।'

'তা ঠিক। ইংরেজি বলতে শুনেছি ওদের। একটা আবার

স্প্যানিশও বলে। আমার ধারণা, এরা এলেনা হিউবার্টের লোক।'

'কিন্তু এলেনার তো মায়ান কোডেক্সের কপি চাই না।'

'জানতে চাইছে আমরা কী করছি।'

'আর এবার কী জানবে সে?'

'ঠিকই বুঝবে কেন ভ্যালাডোলিডে এসেছি। পাল্টা হামলা করিনি, তবে ওদের একটাকে দেখলেই এখন বুঝব সে আসলে কে।'

দেরি না করে হোটেলে ফিরল ওরা।

ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে ডাউনলোড করল সোহানার ল্যাপটপ কমপিউটারে সব ছবি ও ভিডিয়ো।

ব্যাক আপ কপি পাঠিয়ে দিল সালমার কমপিউটারে।

কাজ শেষে ইন্টারনেটে গিয়ে স্যান ডিয়েগো ফিরবার বিমানের টিকেট কিনল রানা।

চার ঘণ্টা পর ওদের ফ্লাইট।

লাগেজ গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে ওরা, তারই মাঝে সোহানার স্যাটালাইট ফোনে কল এল সালমার।

'হাই, সালমা, ঠিকভাবে পেয়েছেন সব?' জানতে চাইল সোহানা। 'গুড! ...আজই বিমানে উঠছি। না এসে উপায়ও নেই। আপনার বসের ব্রিফকেস ছিনতাই হয়েছে। আর ওটা যখন খুলবে, আমাদেরকে স্রেফ খুন করতে চাইবে ছিনতাইকারী। যদি খুন হয়ে না যাই, আগামীকাল রাতে দেখা হবে আপনার সঙ্গে।'

আঠারো

ভ্যালাডোলিডের সস্তা এক হোটেল সুইটের বাথরুমে অ্যাসেটনে ভেজা তুলার বল দিয়ে প্রাণপণে গাঢ় নীল মুখ ঘষছে আর্ট ডগসন। ভয়ানক শয়তান মাসুদ রানা সর্বনাশ করে দিয়েছে ওর। মুখের এই আর্ট কাউকে দেখাবার নয়। এমন কী চমকে যাওয়ার কথা বেচারা আয়নারও! নেইল পলিশ রিমুভারের কটু গন্ধে জ্বলছে নাক। ওটা ব্যবহারের আগে আইসোপ্রোপাইল অ্যালকহল আর টার্নেনটাইন দিয়েও চেষ্টা করেছে। এখন সব কুবাস মিলে নরক গুলজার হয়ে উঠেছে বদ্ধ টয়লেটে। বেসিনের উপরের আয়নায় একবার চাইল ডগসন। বিকটভাবে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কই? এটা তো কোনও কাজেই আসছে না! দুর্গন্ধ আরও বাড়ছে!'

'আমার মনে হয় আরও জোরে ঘষতে হবে,' পরামর্শ দিল অ্যাডেলমো লোপেয। নীল বর্ণের মাঝেও দেখছে আলুর মত ফুলে উঠছে সঙ্গীর থুতনি ও মুখ। তা যাই হোক, আবারও ভ্যালাডোলিডের দোকানে দোকানে কেমিকেল বা সলভেন্ট খুঁজতে যেতে পারবে না সে, মহাবিরক্ত হয়ে গেছে।

লোপেযের হাতে বোতলটা ধরিয়ে দিল ডগসন। বেশি ক্ষার দেয়া সাবান ও ঠাণ্ডা পানির ঝটকা দিয়ে বিদায় করল অ্যাসেটন। 'যাও, এমন কিছু আনো যেটা কাজ করে!'

'এটা দিয়ে প্রায় সব রং তোলা যায়,' বলল লোপেয। 'আগে মানুষের ব্যাঙ্ক-চেকের লেখা তুলতাম। ক' মিনিট ভেজাতে হয়।'

'আরে, আমি কি চেকে লেখা কালি তুলছি?' আরও রেগে গেল

ডগসন, 'এটা আমার মুখ! একটাই! ...ও, হ্যাঁ, অন্যভাবেও কালি তোলা যায়! কালির ডাই পোলার হলে কাজ করে পোলার সলভেন্ট, অ্যালকহল বা অ্যাসেটনের মতই— কিন্তু ফেল মেরেছে সবই! এবার চাই ননপোলার সলভেন্ট। যেমন টলিউইন।'

'টলিউইন?' ভুরু কুঁচকাল লোপেয। 'ওটার আর কোনও নাম নেই?'

'মিথাইলবেনযেন।'

'ওই জিনিস আবার কোথায় পাব?'

'আর্টিস্টদের রঙ যে দোকানে পাওয়া যায়, ওখানে নিশ্চয়ই থাকবে। দোকানদারকে বলবে, সব ধরনের পেইন্ট থিনার চাই। নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে। যাওয়ার পথে ড্রাই ক্লিনারের দোকান পেলে ওদের জিনিসও কিনবে। কাজে আসতে পারে। তাদেরকে বলবে কালি ফেলেছ চামড়ার কাউচে। আর ওদের যদি কালি তোলার স্পেশাল কিছু থাকে, তাও চাই। দাম যাই হোক, টাকার কথা ভাববে না। পয়সা আসলে হাতের ময়লা। আসল কথা: যেভাবে হোক রং তুলতে হবে আমার মুখ থেকে। নইলে...'

'আমার খিদে লেগেছে,' নালিশের সুরে বলল লোপেয।

'আসার পথে খাবার এনো। এখন কোথাও দেখাতে পারব না এই মুখ। আর কী দুর্গন্ধ শালার সলভেন্টে! দুনিয়ার সেরা খাবার দিলেও রুচবে না মুখে! লোপেয, নিশ্চয়ই বুঝছ, যেভাবে হোক এই রঙের হাত থেকে বাঁচতে হবে! লোকটা মহা হারামি!'

'হ্যাঁ,' মেনে নিল লোপেয। 'ওর কাছ থেকে আর কিছু ছিনতাই করা ঠিক হবে না।'

চেয়ারের পিঠ থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জ্যাকেট নিল সে, পরে নিয়ে বেরিয়ে এল অপরিসর করিডোরে, গিয়ে উঠল স্পিৎয্ কুকুরের খাঁচার মত ছোট্ট এলিভেটরে।

লোপেয গিয়ে চাপতেই করুণভাবে কোঁ-কোঁ করে উঠল যন্ত্রটা,

ঘর থেকে সেই গোঙানি শুনল ডগসন। নতুন উদ্যমে পানি ছিটাতে লাগল চোখে-মুখে। এক মিনিট পর আয়নায় চাইল। চেহারা থেকে বেরোচ্ছে যেন গরম ভাপ। যদি উঠত ওই নীল রং, দেখা যেত টকটকে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ।

বদমাশটার ব্রিফকেসের ল্যাচ খুলতেই স্প্রিঙের জোরে ঝট্ করে খুলে গেল ডালা, পিস্টনের মত লাফিয়ে উঠল কালি ভরা সিলিণ্ডার। পালাবার সুযোগই ছিল না। সিলিণ্ডারের মুখে ছিল পাতলা মোমের পর্দা। ওটা ফাটিয়ে দিয়ে এক মুহূর্তে মুখ আর বুক ভাসিয়ে দিল ওই কালান্তক রং।

মাসুদ রানা লোকটা সত্যিকারের ইবলিশ! জেনে-বুঝে করেছে ওর এই সর্বনাশটা। ব্রিফকেস ছিনতাই হলে কী ঘটবে সবই জানত ওই শালা! আর বোকারাম ও ভেবেছিল: কাকপক্ষীও টের পায়নি যে পিছু নিয়েছে ওরা। নিশ্চয়ই মস্ত কোনও ভুল করেছিল লোপেয... নাকি দেশে দেশে এমনি সব বুবি-ট্র্যাপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ব্যাটা মাসুদ রানা!

বিমর্ষ হয়ে মুখ ও ঘাড়ে কোল্ড ক্রিম ডলতে লাগল ডগসন।

উহ্, পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে গেল চামড়া! শালার মাসুদ রানাকে একটাবার কায়দা মত পেলে...

অন্যদিকে মন দেয়ার জন্য স্যাটালাইট ফোনে কল দিল সে।

ওদিক থেকে ভেসে এল এলেনা হিউবার্টের গলা, 'হ্যালো?'

'আমি,' বিরস কণ্ঠে বলল আর্ট। 'আমরা স্যান ডিয়েগো এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ওদের পিছু নিয়েছিলাম। স্পেনে এসেছে। আমিও এখন স্পেনে। ভ্যালাডোলিডে।'

'ওখানে কী করছে?'

'ক'দিন হলো পিছু নিয়েছি। প্রথমে দর্শনীয় সব জায়গা দেখছিল। রাতে দামি সব রেস্টুরেন্টে গিয়ে পেট পুরে খেয়েছে।'

'বেশ ক'দিন তো হলো, নামকরা সব রেস্টুরেন্টে ঢুঁ দেয়ারই

কথা।'

'তাই করেছে।' বেদম খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে ডগসনের পেট। 'পুরো আট দিন ধরে নিয়মিত গেছে ইউনিভার্সিটি অভ ভ্যালাডোলিডে। শহরের ধচাপচা সব পুরনো বাড়ি ঘুরে দেখেছে। তবে আমার মনে হয়েছে, ওরা গোপন কোনও রিসার্চ করছে।'

'অস্বস্তি বোধ করছি। খোঁজ নিয়েছেন, কীসের রিসার্চ?'

'হিস্টরি লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো সব বই ঘাঁটছে। যেখানে গেছে, সঙ্গে করে বড় চামড়ার পার্স নিয়েছে ওই মেয়ে। আর ক'দিন পর থেকে বদমাশটার হাতে ছিল ব্রিফকেস। ওগুলো রেখে যেতে হয়েছে লাইব্রেরিয়ানের কাছে। ওই দালান থেকে বেরিয়ে আসার সময় ফেরত পেয়েছে।'

'ব্রিফকেসের ভেতরে কী ছিল?'

'ভেবেছিলাম সবার অলক্ষে কিছু সরাচ্ছে বুঝি। পুরনো লাইব্রেরিতে গেলে অনেকেই দামি আর দুর্লভ মানচিত্র বা বই চুরি করে। রেয়ার বুক রুমে সময় কাটিয়েছে। সঙ্গে বোধহয় ব্লেড ছিল, সবার অগোচরে বই বা ম্যাপের পাতা কেটেছে। সব লুকিয়ে ফেলেছে পোশাকের ভেতর। চোখ রাখার উপায় ছিল না। কাজেই জানি না আসলে কী করেছে।'

'নার্ভাস বোধ করছি। দেখেছেন কোন্ বই বের করেছে?'

'ওরা বিদায় হলে একবার গিয়েছিল অ্যাডেলমো লোপেয। বইয়ের শিরদাঁড়ায় লেখা ছিলঃ লাস কাসাস। এর মানে তো স্প্যানিশে বোধহয়ঃ "সেই বাড়ি"— তাই নয়?'

বড় করে দম নিল এলেনা হিউবার্ট। একবার ওর মনে হলো বলবেঃ তুমি একটা আস্ত গাধা! অবশ্য শান্ত স্বরেই বলল, 'ওটা ডোমিনিকান এক ফ্রায়ারের নাম। তিনিই গুয়াতেমালার আলটা ভেরাপায এলাকার মানুষকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। মায়ান কোডেক্স ভূমিধসে হারিয়ে যাওয়ার সময়ও বেঁচে ছিলেন। জানি না,

কী পাবে ভেবে ওই যাজকের বই ঘাঁটতে গেছে মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরী!'

খেই ধরল ডগসন, 'তখন ঠিক করলাম, জানতে হবে কী চুরি করছে। তাই লোপেযকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে তক্কে তক্কে ছিলাম। আর যেই প্লাযার মাঝে এসেছে, মাসুদ রানার হাত থেকে ব্রিফকেস ছিনিয়ে নিয়েছে লোপেয। কোনও বিপদও হয়নি। এমন ছিনতাই নিয়মিতই চলে স্পেন আর ইটালিতে। ওরা বুঝবার আগেই মোটরসাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যাই আমরা।'

'ব্রিফকেসের ভেতরে কোনও কাগজ ছিল?'

'না।' রাগ সামলে রাখল আর্ট ডগসন।

'কীসের নোট নিয়েছে? নিশ্চয়ই পড়ে দেখেছেন?'

'কিছুই ছিল না। ওই ব্রিফকেস ছিল বুবি-ট্র্যাপ্‌ড্‌। খুলতেই ঝপাৎ করে মুখে এসে পড়েছে পোয়াটেক তরল নীল রং!'

'হায় ঈশ্বর! তারপর? তার মানে তো ওরা আপনাদেরকে পিছু নিতে দেখেছে।'

'তার সম্ভাবনা খুবই কম,' চাপা শ্বাস ফেলল ডগসন। 'ওই ব্রিফকেস রেখেছিল ধোঁকা দেয়ার জন্যে। আসল জিনিস ছিল ওই মেয়ের পার্সে।'

'অর্থাৎ, তারা এখন আপনাদের কথা জেনে গেছে।'

'শুধু জানে, ছিনতাই হয়েছে ব্রিফকেস। কারণটা জানে না। এক সপ্তাহের বেশি হলো রাতে হেঁটে গেছে ওই পথে। পরনে ছিল দামি পোশাক, বড়লোকদের রেস্টুরেন্টে গেছে— চোরের চোখে পড়ে যাওয়ারই কথা।'

'একথা মানতে পারছি না,' বিড়বিড় করল এলেনা। ডগসনের মনে হলো কথাটা নিজেকে বলছে মেয়েটা। 'না, আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না এরা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে আমার। আপনাকে কি বলেছি, ওরা গুয়াতেমালায় এসে ফেডারাল পুলিশের

কাছে আমার নামে যা-তা বলেছে? হ্যাঁ, তাই করেছে ওরা! ওই দু'জন তেলাপোকার মতই বিরক্তিকর। একটা পথ বন্ধ করুন, আরেক পথে এসে হাজির হবে। আমাকে ভয়ানক বিব্রত করছে। কোণঠাসা করে ফেলেছে। অথচ, ওদেরকে বহু টাকা সেধেছি, কিছুতেই দিল না কোডেক্স।'

'খারাপ লাগছে যে স্যান ডিয়েগোতে ওদেরকে ঠেকাইনি আমরা। স্পেনেও তা সম্ভব হয়নি।'

নিজেকে খুব কষ্টে পড়া মানুষ বলে মনে হচ্ছে এলেনার। বলল, 'দূর করতে পেরেছেন মুখের কালি?'

'না, এখনও না,' বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডগসন। 'কয়েকটা সলভেন্ট ব্যবহার করেছি, কিন্তু এখনও কপাল খোলেনি। আরও নতুন সলভেন্ট কিনতে লোপেযকে পাঠিয়েছি।'

'আর্ট, ওই বিরক্তিকর দুই প্রাণীকে সরিয়ে দিতে হবে, নইলে শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাদের। ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠেছে, আমাদের জন্যে ঘনিয়ে তুলছে বিপদ। শুধু যে আমার ব্যক্তিগত সুনাম বা ব্যবসায়িক সুনাম নষ্ট করছে, তা-ই নয়, আপনার জন্যেও নিয়ে আসছে বালা-মুসিবত। বুবি-ট্র্যাপের ওই কালি তো অ্যাসিড বা বোমাও হতে পারত!'

'আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে ও কী করতে পারে। ভয়ঙ্কর কিছু না করেও জানানো যায়: "আমি তোমাকে শেষবারের মত সতর্ক করছি!"'

'এভাবে চলতে দেয়া যায় না,' বলল এলেনা। 'কেউ আপনার জীবনে ঝুঁকি তৈরি করলে, আপনারও অধিকার আছে নিজেকে রক্ষা করার।'

'এ দেশের কর্তৃপক্ষ কিন্তু সেভাবে চিন্তা করবে না,' বলল ডগসন। বুঝে গেছে, আসলে ওই সুন্দরী মেয়েটা চাইছে বিনা পয়সায় ওকে দিয়ে মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরীকে খুন

করাতে। ওর যে খুব আপত্তি আছে, তাও নয়। কিন্তু সেজন্য দিতে হবে যথেষ্ট টাকা।

'কর্তৃপক্ষ যা খুশি ভাবুক, বাঁচার পুরো অধিকার আছে আপনার,' জোর দিয়ে বলল এলেনা।

'আপনি যদি বিপজ্জনক পথে আমাকে পা রাখতে বলেন, সেজন্য বাড়তি ফি'র কথা ভাবতে হবে আপনাকে,' বলল ডগসন। 'লোপেযের পেছনে খরচ আছে, এ ছাড়া আনুষঙ্গিক খরচও কম নয়।' জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করল ও।

জবাব এল, মনে হলো এক পলকে হাজার কোটি মাইল দূরে সরে গেছে মেয়েটা: 'ও... হ্যাঁ... নিজের মতই ভাবছিলাম আপনাকে। তেমন ভাবা আমার উচিত হয়নি। আপনি এমন একজন, যিনি আমার হয়ে কাজ করেন, কাজেই টাকার কথা ভাবতেই হয়। আরও পাঁচ হাজার ডলার পেলে কেমন হয়?'

'আমি বিশ হাজার ডলারের কথা ভাবছিলাম,' বলল ডগসন।

'আর্ট, আমার ভাবতে খুব কষ্ট হবে, আপনি ফোন করে আমাকে বিব্রত করে, মনে করুণা তৈরির মাধ্যমে বাড়তি টাকা আদায় করতে চাইছেন।'

'ছিহ্, তা নয়, মিস হিউবার্ট,' বলল ডগসন। 'আপনি নিশ্চিত থাকুন, কখনও এমন কাজ করব না আমি। তবে ওই কাজের জন্যে এর কম হলে চলবে না আসলে। প্রথমে নিজ রং ফিরে পেতে হবে, নইলে সবাই চিনে ফেলবে আমাকে। তারপর কিনতে হবে অস্ত্র। আপনি তো জানেন, ইউরোপে এসব অস্ত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। লাশ সরিয়ে ফেলতেও বেরিয়ে যাবে বহু টাকা। আরও খরচ আছে স্পেন থেকে ইউএসএ ফিরতে। সময় দিচ্ছে বলে বাড়তি টাকা দিতে হবে লোপেযকেও।'

'ঠিক আছে, তা হলে বিশ হাজার ডলারই।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল ডগসন।

'কিন্তু আগে শেষ করতে হবে কাজ, অগ্রিম টাকা আমি দেব না।'

'তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আমারও আগে মুখ রক্ষা করতে হবে।'

'আপনি বোধহয় জানেন না, ওপেক মেকআপ বিক্রি করে কসমেটিক কোম্পানিগুলো। ওই জিনিস অনায়াসেই ঢেকে দেবে ক্ষত, জন্মদাগ বা ত্বকের অস্বাভাবিকতা। যদি মুখ থেকে রং তুলতে না পারেন, ঢেকে দিন নিজের ত্বকের রং মেকআপ দিয়ে।'

'অনেক ধন্যবাদ। কথাটা মাথায় রাখলাম।'

'আর তারপর ওই দুই বদমাশকে বিদায় করুন আমার জীবন থেকে। খুশি করে দেব আপনাকে।'

'ক্লিক' শব্দে যোগাযোগ কেটে দিল এলেনা হিউবার্ট।

গুয়াতেমালা সিটির মস্ত ভবনে নিজ অফিসে বসে আছে সে। তিক্ত মনে ভাবছে: অসীম দয়ালু ঈশ্বর কেন পরীক্ষা নিচ্ছেন ওর ধৈর্যের!

না, আসলে তিনি নন, ওর জীবনটা বেদম কষ্টকর আর ভীষণ বিষাদময় করে তুলেছে ওই দুই ছোটলোকের বাচ্চা!

দুই হারামি গুয়াতেমালা ত্যাগ করার পর এসেছিল অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো, কঠোর সুরে বলে গেছে, তার সিকিউরিটি দলের অনেক লোককে খুন করে গহীন জঙ্গলে পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরী।

রেগে কাঁই হওয়া অতিথি ড্রাগ লর্ডকে সামাল দেয়া মোটেও সহজ নয়। মজুর চরিয়ে খেতে হয় তাকেও, আর তার লোক মারা পড়লে তাদের গণ্ডা গণ্ডা বউগুলোকে দিতে হয় বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণের টাকা। মৃতের পরিবারের পিছনে টাকা না ঢেলে উপায়ও নেই, নইলে বিগড়ে যাবে অন্যসব কর্মী, তখন তাদেরকে দিয়ে কোনও কাজই করাতে পারবে না।

এলেনার বিশাল জমির ছোট্ট যে-কোণে ড্রাগসের খামার করেছে অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো, সেখান থেকে যথেষ্ট মুনাফা না এলে জমির মালকিনকে চার আনা পয়সাও কমিশন দেবে না সে। আপাতত যেরকম মন্দা চলছে গোটা বিশ্ব জুড়ে, এলেনার ব্যবসা এখনও মুনাফা দেখাচ্ছে শুধু ড্রাগসের বিপুল টাকা আসছে বলে।

কমপিউটার খুলে ইন্টারনেটে গিয়ে বার্তোলোমে দে লাস কাসাসের নাম টাইপ করল এলেনা। কিছুক্ষণ পর পেয়ে গেল যা খুঁজছিল।

লাস কাসাস তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দান করেছিলেন ভ্যালাডোলিডের কোলেসিয়ো দে স্যান গ্রেগোরিয়োতে।

কিন্তু পনেরো শ' ছিষট্টি সালে ওই সন্ন্যাসীর লাইব্রেরিতে কী ছিল?

উত্তর গুয়াতেমালায় প্রথম স্প্যানিয়ার্ড ওই লোক। মায়ান রাজারা তাঁকে গ্রহণ করে বন্ধু এবং শিক্ষক হিসাবে।

এমন কি হতে পারে, তিনি দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন কোনও মায়ান শহরের?

কোনও সমাধি, যেখানে আছে বিপুল সোনাদানা?

একটু আগেও এলেনা ভাবছিল, নতুন আবিষ্কার আসলে ওই মায়ান কোডেক্স। কিন্তু তা না-ও তো হতে পারে!

স্প্যানিশ ওই যাজকের ডায়েরি হতে পারে দুনিয়া-সেরা রত্ন।

হয়তো ওটার ভিতর রয়েছে সাত রাজার ধনের সঠিক হদিশ!

আগে এটা ভাবেনি এলেনা।

কিন্তু সত্যিই যদি মায়ারা কাউকে বলে থাকে গুপ্তধনের কথা, সেক্ষেত্রে কে সেই লোক?

কোনও সন্দেহ নেই, লাস কাসাস!

মায়াদের ধর্মীয় গুরু, তাদের পথ প্রদর্শক!

মনটা আরও তিক্ত হয়ে গেল এলেনার।

সেক্ষেত্রে হয়তো সত্যিই ওকে দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছে ওই মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরী!

হ্যাঁ, হতে পারে এরা খোঁজ পেয়েছে মায়াদের বিপুল ধনরত্নের!

কিন্তু তার মানে এ-ই নয় যে, তারা জিতে গেছে।

তা ছাড়া, সত্যি হয়তো কিছুই পায়নি।

হতে পারে না, গুপ্তধনের বিষয়ে মায়াদের কাছ থেকে কোনও তথ্যই পাননি লাস কাসাস?

অথবা, হয়তো পেয়েছেন!

আর সেই খোঁজ দিয়ে গেছেন তাঁর লাইব্রেরির কোনও বইয়ে।

কে জানে!

এবার সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, ভাবল এলেনা।

কোন্ পথ বেছে নেবে ও?

না, চুপচাপ বসে থাকবার সময় নয় এটা!

প্রথম এক্সপিডিশনের জন্য গুছিয়ে নিতে হবে সব।

মাসুদ রানাকে নিয়ে বিশাল কোনও মায়ান শহর আবিষ্কার করে ফেলবার আগেই লোভী, হিংসুটে সোহানা চৌধুরীকে ঠেকিয়ে দিতে হবে!

চিন্তাটা তপ্ত করে তুলল এলেনার মগজ। চট্ করে তুলে নিল ফোনের রিসিভার, কল করল ওর কোম্পানির ফিন্যানশিয়াল অংশের ভাইস প্রেসিডেন্টকে।

'ইয়েস, মিস হিউবার্ট?' বেশিরভাগ সময় স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে সে। কিন্তু আগেই তাকে বলে দেয়া হয়েছে, এই কোম্পানিতে চাকরি করতে চাইলে, কক্ষনো এলেনাকে সেনোরিটা বলা চলবে না। ওটা অসভ্য শোনায় ইংরেজ কানে।

'ডেলমার, একটা ফেভার চাই।'

'নিশ্চয়ই, মিস হিউবার্ট!' বলল ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'আপনি কিছু চাইলে তা ফেভার হবে কেন, এ তো আমার জরুরি দায়িত্ব।'

'আমি জানতে চাই, আমেরিকায় দু'জন বাংলাদেশির ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে। এদের একজনের নাম মাসুদ রানা, অন্যজন সোহানা চৌধুরী। আপাতত বাস করছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, স্যান ডিয়েগোর লা জোলার গোল্ডফিশ পয়েন্টে। ক্রেডিট কার্ডে কত টাকা আছে, আর কোথায় কী কিনছে, সবই জানতে চাই।'

'আইডেণ্টিফাই করার মত কোনও তথ্য? সোশাল সিকিউরিটি নম্বর বা জন্ম তারিখ? যে-কোনও কিছু, মিস?'

'না, নেই। আশা করি ক'টা পয়সা খরচ করলেই ব্যাঙ্ক থেকে সব জানিয়ে দেবে?'

'অবশ্যই, মিস হিউবার্ট! অথবা জেনে নেব অন্য কোনও পথে।'

'কাজটা খুবই জরুরি। কয়েক সপ্তাহ আগে গুয়াতেমালায় ছিল এরা। যে-হোটেলে ওঠে, ওখান থেকেই পেয়ে যাওয়ার কথা পাসপোর্ট বা ক্রেডিট কার্ড নম্বর।'

'জী, মিস হিউবার্ট! খুঁজে নেব সব, জেনে নেব এখন কোথায় আছে। কী করছে জানতেও সময় লাগবে না। আমি কল দেব আপনাকে।'

'গুড। এসব তথ্য পাওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন, তারপর প্রতিদিন একবার করে আমাকে জানাবেন ক্রেডিট কার্ডে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে।'

'নিশ্চয়ই, মিস হিউবার্ট!'

ফোন রেখে দিল এলেনা, ভাবতে লাগল ওর এক্সপিডিশনের কথা। যেসব জিনিস অবশ্যই চাই, তার বড় এক তালিকা তৈরি করল। আরেক তালিকায় লিখে রাখল কাদের দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নেবে। দুই ঘণ্টা পর বেজে উঠল ফোন।

'হ্যালো।'

'মিস হিউবার্ট, আমি ডেলমার অ্যামপারান। কয়েক ঘণ্টা আগে

বিমানের টিকেট কেটেছে ওই দু'জন। মাদ্রিদ থেকে চলেছে নিউ ইয়র্কে। বিকেলে আরেকটা ফ্লাইটে যাবে নিউ ইয়র্ক থেকে স্যান ডিয়েগো।'

'আপনি নিশ্চিত তারা নিউ ইয়র্কগামী বিমানে আছে?'

'প্রায় শিওর,' বলল ভাইস প্রেসিডেণ্ট। 'নইলে কিছু টাকা কেটে নিয়ে রিফাণ্ড করত রিযার্ভেশন ডেস্ক থেকে।'

'ঠিক আছে, আগামীকাল জানাবেন আরও কী করছে,' ফোন রেখে দিল এলেনা। এবার ডায়াল করল আরেক নম্বরে।

'হ্যালো?' বলল আর্ট ডগসন। জড়ানো কণ্ঠ থেকে মনে হলো ঘুমিয়ে ছিল, অথবা মনের দুঃখে পান করেছে অতিরিক্ত মদ।

'হ্যালো, আর্ট— আমি। আপনাকে নীল করে দেয়ার পর নিউ ইয়র্কগামী বিমানে গিয়ে উঠেছে ওরা। ওখানে নেমে বিকেলে চাপবে স্যান ডিয়েগোর বিমানে। কাজেই স্পেনে খুঁজে আর লাভ নেই। চাইলেও প্রতিশোধ নিতে পারবেন না। এখন সোজা চলে যান তাদের বাড়িতে, শেষ করুন ঝামেলা।'

উনিশ

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে মস্ত কম্পাউণ্ডের মাঝে একাকী দাঁড়িয়ে আছে রানা এজেন্সির চারতলা অফিস-দালান। এই একটু আগে কুয়াশামোড়া ডিমের কুসুমের মত সূর্য উঠতেই উপরতলার অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে নেমে এসেছে রানা ও সোহানা। দীর্ঘ জগিঙের জন্য পুরোপুরি তৈরি। সৈকতে দু' মাইল দৌড়ে নিয়ে চলে এল ওরা ভ্যালেনসিয়া হোটেলে। অফিস থেকে মাত্র কয়েক শ' গজ

দূরে বলে কখনও কখনও এখানে ব্রেকফাস্ট সারে ওরা।

সুইটযারল্যাণ্ডের পুরু মাখন দেয়া ছয় টুকরো টোস্ট, সঙ্গে সুস্বাদু দু' টুকরো স্মোক্‌ড্ স্যামন, চারটে স্ক্র্যাম্বল্‌ড্ এগ, দুটো মাটন চপ্ আর দু' গ্লাস কমলার জুস নিল রানা। ওর চারভাগের এক ভাগ খাবার নিয়েছে সোহানা।

খাওয়া পর ওরা নিল এসপ্রেসো।

দু'জনের দুই মগ কফি শেষ করে বিল মিটিয়ে সবুজ, তাজা ঘাস মাড়িয়ে অফিসের দিকে চলল ওরা।

রানা সতর্ক, কয়েকবার চেয়েছে সৈকতের দিকে।

তা খেয়াল করে বলল সোহানা, 'ওদিকে নীল মুখের কোনও পিশাচকে দেখতে পেলে?'

'না, তা নয়।'

'যদি এলেনা হিউবার্টকে ওভাবে রাঙানো যেত, সত্যিই খুশি হতাম,' হাসল সোহানা।

'এবার হয়তো সত্যিই সুযোগ পাবে,' বলল রানা। 'একটু পর আসছেন ডক্টর রশিদ, তারপর গুছিয়ে নেব পরের স্টেপ। সালমাও বোধহয় এতক্ষণে চলে এসেছে।'

'এমন পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে মুখরক্ষা না হয় ওই মেয়ের,' গম্ভীর হয়ে গেল সোহানা, 'অতিরিক্ত ঝুঁকি নিলে যে-কোনও সময়ে প্রতিযোগিতায় হারবে যে-কেউ।'

'আমরাও কিন্তু মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলাম পাতাল-নদীতে,' বলল রানা। থেমে দাঁড়িয়েছে।

'ভুলিনি,' মাথা দোলাল সোহানা। 'তুমি তোমার অক্সিজেন ট্যাঙ্ক দিয়ে দিতে চেয়েছিলে আমাকে। একবারও ভাবোনি, তুমি না থাকলে আমি বাঁচতে চাই কি না। ...কখনও ভুলব না, এসবই হয়েছে ওই লোভী মেয়েটার কারণে।' চট্ করে রানার গাল স্পর্শ করল সোহানার ঠোঁট। পরক্ষণে সরে গেল ও।

'চুমু কেন?' সোহানার হাত মুঠোর মধ্যে ভরে নিয়ে আবারও হাঁটতে শুরু করল রানা।

'তুমি ভাল করেই জানো, কেন।'

আধঘণ্টা পর রানা এজেন্সি অফিসের সামনে প্রফেসর রশিদের গাড়ি থামতেই একতলার দরজা দিয়ে তীরের মত বেরিয়ে গেল প্রকাণ্ড, কালো কুকুরটা। ঘেউ-ঘেউ করল না। বেশ কয়েকবার এ বাড়িতে রশিদ এসেছেন, তাই ভাল করেই চিনে নিয়েছে ওই গাড়ি। বোঝা গেল, রীতিমত পছন্দ করে সে নিরীহ মানুষটাকে।

গাড়ি থেকে নেমে বগলে বড় একটি এনভেলপ নিয়ে রিসেপশন এরিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেলেন প্রফেসর।

পাশে বীরের মত চলল কাল্লু।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রানা ও সোহানা। চা'র জন্য কিচেনে গিয়ে ঢুকেছে সালমা আলীর সহকারী।

'আপনারা সত্যিই অদ্ভুত জাদু দেখিয়ে দিলেন,' করমর্দন করার পর রানাকে বললেন রশিদ। ওরা সবাই কাউচে বসতেই জানালেন, 'সত্যি, ভাবতে পারিনি কোডেক্সের কপি থাকতে পারে। সবসময় বার্তোলোমে দে লাস কাসাসের ভক্ত ছিলাম। এখন আমার ভক্তি আরও বেড়ে গেল। সেই সাথে আপনাদের প্রতিও। লাস কাসাসের কপি প্রায় নিখুঁত। এক শ' ছত্রিশ পৃষ্ঠা, এ কাজ করতে গিয়ে হয়তো তাঁর লেগেছে কমপক্ষে কয়েক মাস। কিছুই বাদ দেননি তিনি।'

চা-বিস্কুটের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল সহকারী, সাইড টেবিলে রাখল সব। সোহানার পাশে বসে সবাইকে পরিবেশন করল সালমা।

টুকটাক কথার মাঝে চা ও দামি বিস্কুট শেষ হলো।

এনভেলপের ভিতরের জিনিসগুলো বের করে পাশের কফি

টেবিলে রাখলেন ডক্টর আক্তার রশিদ। এগুলো ভ্যালাডোলিডের লাইব্রেরি থেকে রানা ও সোহানার পাঠানো ডিজিটাল ইমেজ। ছবি বড় করা হয়েছে, ফলে ফুটে-উঠেছে কলমের নিবের প্রতিটি আঁচড়। এমন কী চামড়ার ভেলামের পাতার ওদিকের চিহ্নও।

চার পৃষ্ঠার মায়ান ম্যাপ সহজেই চিনল রানা ও সোহানা। মায়াদের গ্লিফও পরিষ্কার দেখা গেল।

ওদের প্রথম পাওয়া স্পটে আঙুল রাখল সোহানা। 'এখানেই ওই সেনোটে। আমরা ওখানে সাঁতার কেটেছি।'

ওই এলাকার বড় করে নেয়া স্যাটালাইট ফোটোগ্রাফ বেছে নিলেন প্রফেসর রশিদ। প্রতিটি সাইটের সঙ্গে রয়েছে মায়াদের দেয়া নাম। 'আকাশ থেকে দেখলে জায়গাটা এমনই দেখায়।'

বিছিয়ে দিলেন আরেক সেট ছবি। 'আর এখানে... এটার কারণেই চিন্তিত এবং উত্তেজিত হয়ে আছি।'

'ওটা কী?' মনোযোগ দিল সোহানা।

'আপনার মনে আছে, প্রথমেই এই ম্যাপ দেখে বলেছিলাম, ওখানে কয়েকটা বড় দালান বা বড় কোনও শহর আছে?'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন।'

'তখন পুরো জানতাম না। পরে আপনাদের কাছ থেকে এসব ইমেজ পেয়ে ব্যবহার করলাম এরিয়াল ফোটোগ্রাফ। সেগুলোর ভেতরে স্যাটালাইট ইমেজও ছিল। মায়াদের মূল আঁকা ছবি আর নিখুঁত দিক-নির্দেশনা অন্য কিছু দেখাল। নিজেরাই দেখুন।'

কয়েক সেকেণ্ড স্যাটালাইট ইমেজের দিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর বলল, 'নিঃসন্দেহে দালান।'

'এই যে ওখানে টিবি, বা এখানে, এগুলো টিবি হতে পারে না; সাধারণ টিলার তুলনায় অনেক খাড়া— এর একমাত্র কারণ, ওগুলো আসলে মস্ত সব পিরামিড।'

আরও ছয়টি ছবি বেছে নিলেন রশিদ। 'আমি ছাড়া বর্তমানের

কোনও স্কলার জানেন না, কিন্তু এখানে আছে চারটে বড় কমপ্লেক্স। এগুলোর কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মায়ান কোডেক্সে।'

'শহরগুলো কত বড় ছিল?' জানতে চাইল সোহানা।

'ছবি থেকে আঁচ করা কঠিন,' বললেন প্রফেসর। 'দু' দিকে পাথরের স্থাপনা দুই মাইল জুড়ে। ধরে নেয়া যায়, এসব শহর তিন থেকে পাঁচ মাইল বিস্তৃত ছিল। আর এ থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কী আবিষ্কার করেছেন? আমরা আসলে ঠিক, তা প্রমাণ করতে হলে এখন একটাই উপায় আছে।'

এরিয়াল ফোটোগ্রাফ ও স্যাটালাইট ইমেজ দেখছে সোহানা। 'বড় বড় গাছ, ঘন ঝোপ ও লতাগাছে এত ঢাকা, খুঁজে পাওয়াই কঠিন। হয়তো কোনও দালানের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, অথচ লোকেশন না জানলে বুঝবই না।'

'আর এ কারণেই আজও অনেক মায়ান সাইট অক্ষত,' বললেন প্রফেসর রশিদ। 'দালান ঢাকা পড়েছে গাছপালায়, দেখলে মনে হবে সত্যিকারের টিলা। কিন্তু আমাদের কোডেক্স জানিয়ে দিচ্ছে, ওগুলো আসলে টিলা নয়, অন্য কিছু। আসলে আপনারা দু'জন বর্তমান প্রত্নতত্ত্বকে এমন কিছু দান করেছেন, যেটা অকল্পনীয়।'

'সোহানা আর আমি খুশি, আমাদের সময় নষ্ট হয়নি,' বলল রানা।

'আপনাদের আবিষ্কার করা ওই মায়ান কোডেক্স এবং পরে ওটার কপি পাওয়ার ফলে আমরা এরই মধ্যে খুঁজে পেয়েছি কমপক্ষে পাঁচটি জরুরি সাইট। আপনাদের ওই সেনোটে বাদ দিলেও আছে চারটে প্রাচীন নগরী। গত পনেরো বছরে মায়াদের বিষয়ে অনেক কিছুই জেনেছি আমরা। আর এবার আপনাদের কল্যাণে নানাদিকে শুরু হবে এক্সকেভেশন। শুধু এসব সাইটের কথাই বলছি কেন, কোডেক্সের কপির কারণেও ওই লিখিত ভাষা

ভালভাবে বুঝব আমরা। তাতে অবশ্য সময় লাগবে বেশ কয়েক বছর। হয়তো একটা টিম বুঝল ওই ভাষার কোনও শব্দের মানে, আর তার ফলে ক'দিন পর অন্য কোনও টিম বুঝবে গোটা বাক্য বা প্যারাগ্রাফ। এভাবেই একসময় জানা হয়ে যাবে মায়ান ভাষা। আর ওদের শহর এক্সকেভেট করা? তাতে লাগবে যুগের পর যুগ। কাজটা হবে পেইন্টারদের ব্রাশ ব্যবহারের মত করে, তিল তিল করে উন্মোচিত হবে অতীত। এ কাজ কোনও বুলডোযারের নয়। আপনারা মানব-সভ্যতাকে যে অবিশ্বাস্য উপহার দিলেন, তার সব উদ্ভাসিত হবে। তবে আমরা এ জীবনে সব দেখে যেতে পারব না।'

'আপনাকে কেন যেন অসুখী মনে হচ্ছে,' বলল সোহানা।

'আমি চিন্তিত। কোডেক্সের কপি আছে আমাদের কাছে। কিন্তু মূল বই রয়ে গেছে এলেনা হিউবার্টের হাতে। মেয়েটা যদি সঠিক লোকের কাছে যায়, পেয়ে যাবে ওই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ—আর আমার ধারণা, ঠিক ওই কাজই করছে সে এখন। আজ আপনাদেরকে যা বলছি, তার সবই জেনে যাবে সে ওই লেখা পড়লে।'

'অর্থাৎ, আপনি চিন্তিত সে খুঁজে বের করবে ওসব শহর,' বলল রানা।

'প্রতিটা সাইট, একটাও বাদ দেবে না,' বললেন রশিদ। 'আপনারা যখন স্পেনে ছিলেন, এক কলিগের কাছে জানতে চাই...' সোহানার চোখে দুশ্চিন্তা দেখে আস্তে করে মাথা নাড়লেন প্রফেসর, 'না, ভুল করে যে-লোককে বিশ্বাস করেছিলাম, এ সে নয়। আমার এই কলিগ ছোটবেলার বন্ধু। বাঙালি। ওর নাম শরীফ খান। একসঙ্গে পাশ করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখন আছে ইউনিভার্সিটি অভ পেনসিলভ্যানিয়ায়। স্পেশালাইযড় হয় মায়ান টেকনোলজিতে। ওকে বলতে পারেন দুনিয়ার সেরা লিথিসিস্ট। এক টুকরো অবসিডিয়ান দেখলেও বলে দেবে ওটা কোথা থেকে

এসেছে, কোন্ কাজে ব্যবহার করা হতো। বা যে-কোনও দালান দেখেই জানিয়ে দেবে, ওটা কত আগের, বা কোথায় আছে জিনিসটা। এমন কী, বলে দেবে কতবার মেরামত করা হয়েছে।'

'ইন্টারেস্টিং স্পেশালিটি,' মন্তব্য করল সোহানা।

'সবচেয়ে বড় কথা, স্বয়ং আল্লাই বোধহয় ওর কোনও দোষ রাখেননি। হাতে কোনও কাজ থাকলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। আজ পর্যন্ত কারও কাছে শুনিনি কখনও কথার বরখেলাপ করেছে। ইংরেজদের এই রুঠা দেশেও ওকে অন্যসব আর্কিয়োলজিস্ট সত্যিকারের গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছে। এক্সকেভেশনে ওকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যায় সবাই। এলেনা হিউবার্ট গিয়ে ওকে লোভ দেখালে, সন্দেহ কী, হাসবে ওর বিখ্যাত বিকট হাঁসি। তারপর স্রেফ কান ধরে বের করে দেবে ওই মেয়েকে সবার সামনেই।'

'আপনার যখন এত বিশ্বাস, আমাদেরও আপত্তি নেই তাঁর ওপর আস্থা রাখতে,' বলল সোহানা।

'তিনি কী বলেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'বলেছিলাম, এবারের গ্রীষ্মে কয়েকটা সাইটে যেতে চাই। ও বলল, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এলেনা হিউবার্ট। আরও কয়েকজনের সঙ্গেও কথা হয়েছে ওই মেয়ের। শুরু করতে চলেছে মস্ত এক্সকেভেশন। শরীফকে বলেছে, ওর জানা আছে ঠিক কোথায় আছে মায়াদের বড় শহর। এরই ভেতরে লোকও জোগাড় করছে।'

'কী ধরনের লোক?' জানতে চাইল সোহানা।

'শরীফের মত শরীফ লোক নয় তারা। খোঁজ নিলে দেখবেন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তবে দক্ষ নিজেদের কাজে। ভাড়া করছে অভিজ্ঞ গাইড। আগেও গুয়াতেমালায় আর্কিয়োলজিকাল কাজে গেছে এমন কর্মী, রাঁধুনি, ড্রাইভার ইত্যাদি নিয়োগ দিচ্ছে। এরা এমন লোক, টাকা পেলেই মুখ বুজে থাকবে। যা খুশি করতে

পারবে এলেনা হিউবার্ট। কেউ বাধা দেবে না। সাইট নষ্ট করছে কি না, বা ভেঙে ফেলছে কি না প্রাচীন দালান, এসব নিয়ে একটা কথাও তুলবে না কেউ।'

'কোডেক্স পেয়ে যাওয়ার খারাপ দিক এটা,' বলল রানা। 'ওই মেয়ে চুরি না করলেও, কিছু দিনের ভেতর চোর-বাটপাররা ওটার খবর জেনে যেত।'

'এমনটা হওয়ার কথা ছিল না,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'আসলে কপাল মন্দ আমাদের, নইলে মায়ান ফিল্ডের সবচেয়ে বদ মানুষটার হাতেই বা পড়বে কেন ওটা? পঁচিশ বছরের ভেতরে সবচেয়ে বড় মায়ান আর্কিয়োলজিকাল আবিষ্কার মিলল বটে, কিন্তু সব কেড়ে নিল নোংরা মনের এক চোর! বাবার কাছ থেকে পাওয়া বিপুল টাকা নিয়ে আরও টাকা কামাই করতে কাজে নেমে পড়েছে সে। এদিকে আমাদের মত স্কলাররা গ্র্যাণ্ট পাওয়ার জন্যে এখনও কর্তৃপক্ষের কাছে লেখালেখিই শুরু করিনি! শুধু প্রকাণ্ড চারটে মায়া নগরী নয়, শত শত সাইট লুটপাটের জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে সে। আমরা জানবও না, কতগুলো আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করে দিয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায়। একসময় এই একইভাবে লুট করেছিল ইংরেজরা আমাদের সমৃদ্ধ দেশ। নইলে দিল্লির সম্রাটের কোহিনূর হীরা ব্রিটেনের রানির মুকুটে যায় কীভাবে?'

'যেভাবেই হোক আমরা বাধা দেব এলেনা হিউবার্টকে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সোহানা। রাগে লালচে হয়ে উঠেছে ফরসা মুখ।

আস্তে করে ওর বাহুতে হাত রাখল রানা। 'এক মিনিট, সোহানা।' প্রফেসরের দিকে চাইল। 'আমরা যখন গুয়াতেমালায় যাই, মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়েছিল। আবারও ওখানে গেলে মস্ত বিপদে পড়তে পারি। তবে সেজন্য বখে যাওয়া, মিথ্যুক এক চোর মেয়েকে যা খুশি করতে দেয়াও অন্যায় হবে।'

'গুয়াতেমালায় গিয়ে এসব সাইট চিহ্নিত করার কাজ আসলে

আমারই,' বললেন ডক্টর রশিদ। 'গ্রীষ্মের ছুটিতে এক্সকেভেশনে যেতে চেয়েছি। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে। জানি, একবার একদল নামকরা কলিগ নিয়ে ওখানে গেলে বাধা পড়বে তার পরিকল্পনায়। মস্ত কোনও ক্ষতি করতে পারবে না কোনও সাইটের। সে তো আসলে ফোকটে আর্কিয়োলজিস্ট হিসেবে নাম কিনতে চাইছে। সত্যিই যদি দশজন বিখ্যাত আর্কিয়োলজিস্ট নিয়ে ওই এলাকায় উপস্থিত হতাম; ওই মেয়ে সাহসই পেত না কোনও সমাধি বা পিরামিড লুটপাট করতে।'

'কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, যেটুকু সময় পাবে তাতেই অনেক ক্ষতি করবে সে,' বলল সোহানা। চট্ করে রানাকে দেখল। 'আমরাই বের করে এনেছি মায়ান কোডেক্স। আর তাই আমাদেরই উচিত এলেনা হিউবার্টকে বাধা দেয়া। আজ ইতিহাস ছাড়া কিছুই নেই মায়াদের, আর তাও চুরি করতে চাইছে ওই ব্রিটিশ মেয়ে। আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের কেমন লাগবে, যখন এক বছর পর "নিজের আবিষ্কার" নিয়ে লেখা ইয়া মোটা বই প্রকাশ করবে সে? মনে মনে হাসবে আর বলবে, "ওই বোকা মাসুদ রানা আর গাধী সোহানা চৌধুরী বেদম ঠকে গেছে।"'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলল রানা, 'আমাদের শুধু একটা কাজ করতে হবে। আমরা কোডেক্সের প্রধান চারটে সাইট ঘুরে আসব। এটাও জানি, কী ভাবছে এলেনা হিউবার্ট। লোভী মেয়ে, কাজ শুরু করবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইটে।' একবার সোহানাকে দেখে নিয়ে প্রফেসরের দিকে চাইল রানা। 'ডক্টর রশিদ, ওই চার সাইটের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা?'

'এবার ব্যাকপ্যাকে অনেক বেশি গুলি রাখব,' বলল গম্ভীর সোহানা।

বিশ

গোল্ডফিশ পয়েন্টে সাগর সৈকতের উপরের দিকে সিমেন্টের ফুটপাথে অ্যাডেলমো লোপেযকে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর্ট ডগসন। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা এজেন্সির বাড়িটা। ওখানেই আছে শয়তান মাসুদ রানা। শেষ করতে হবে তাকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত লোকটাকে খতম করবার মত উপযুক্ত বুদ্ধি আসেনি লোপেয বা তার মনে। আসলে ওই বাড়িটা এমনই, সিকি মাইল দূরের যে কাউকে দেখা যাবে ওখান থেকে।

তার উপর বড় বাধা ডগসনের নিজের মুখ। প্লাস্টার করা দেয়ালের মত ওই জিনিস নিয়ে কারও অফিসে গেলে যে-কেউ সন্দেহ করবে। নীল রং ঢেকেছে বটে ওপেক মেকআপ, কিন্তু ফেরাতে পারেনি স্বাভাবিক রং। আয়নায় মুখ দেখলেই বিমর্ষ হয়ে পড়ছে কুকুর-পুত্র, থুড়ি, ডগসন, আর তার পর পরই হয়ে উঠছে তিরিক্ষি মেজাজের। ওর মুখ যেন ঠিক প্লাস্টিকের পুতুলের। আর যখন তখন ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছে স্যান ডিয়েগোতে এসে। মেকআপ ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে নীল রং। ওকে দেখলে ভিনগ্রহের মানুষ বলে ধরে নেবে যে-কেউ।

অ্যাডেলমো লোপেযের দোষও মোটেই কম নয়। যতবার নতুন শেডের জন্য মেকআপের দোকানে যাচ্ছে, ব্যাটা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে ডগসনের গোলাপি রঙের ত্বকের কথা। নিজে যে-দোকানে গিয়ে রং মিলিয়ে দেখবে, তারও উপায় নেই। মেকআপ মেখে অনেক ভয় নিয়ে বিমানে চেপে এখানে আসবার পর, গতকাল

সৈকতের কিনারায় ভুতুড়ে এক ভাঙা বাড়ির হদ্দ নোংরা আস্তাবলে ঠাঁই নিয়েছে। লুকিয়ে আছে সবার চোখ এড়িয়ে।

গতবার যে-মেকআপ আনল লোপেয, ওটা ছিল ওই ব্যাটার নিজেরই রঙের। মেখে নিয়ে আয়নায় ডগসন দেখল, বাদামি মুখোশের মত হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। ভাবা যায়, লাল ঘাড়ের উপর বিচ্ছিরি বাদামি মুখ! তার চেয়েও খারাপ, জ্বলজ্বল করছিল কান দুটো। ছ্যাহ্, ওকে মানুষই মনে হচ্ছিল না! ওকে দেখলে ভয়ে চ্যাঁ করে কেঁদে উঠত যে-কোনও বাচ্চা। এমন কী লোপেযও ভয় পেতে শুরু করেছে ওকে। তা অবশ্য ওই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পর থেকেই। এখন সর্বক্ষণ খুন চেপে আছে ডগসনের মাথায়।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস, মাসুদ রানা বা সোহানা চৌধুরী একবারও ওদেরকে দেখেনি। বড়জোর এক পলক দেখেছে মোটরসাইকেলে চেপে ব্রিফকেস নিয়ে গেল দুই লোক। কিন্তু তাতে কী, এখন শুধু নীল বদনটা দেখলেই চিনে ফেলবে। যে দেখবে, সেই পুলিশকে বলবে— ভয়ানক এক নীল পিশাচ হাজির হয়েছে এ এলাকায়!

সন্ধ্যার পর ঘোড়ার শুকনো লাদার গন্ধ ভরা আস্তাবল থেকে বেরিয়ে সৈকতের এদিকে এসে দাঁড়িয়েছে। মনটা আগের চেয়ে একটু শান্ত। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কাছাকাছি যাবে ওই বাড়ির। পিঠে ভিখারির ঝুলির মত ব্যাগ। কিন্তু ভিতরে আছে ৫.৫ এমএম শ্টায়ার এইউজি রাইফেল। বেয়াল্লিশ রাউণ্ডের ম্যাগাযিন একদম ভরা। অস্ত্রটা এখন তিন ভাগে ভাগ করে খুলে রাখা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র। চতুর্থ অংশটা ফ্যাকটোরির তৈরি সাইলেন্সার। গুলি আরম্ভ হলে সামান্য কাশির মত খুক-খুক করে কাশতে শুরু করবে ওটা।

কয়েক শ' গজ দূরে একাকী দাঁড়িয়ে রানা এজেন্সি, আশপাশে কোনও বাড়িও নেই। দূরে দূরে একের পর এক প্রমোদ প্রাসাদ ও হোটেল। সৈকত পেরিয়ে সরু রাস্তায় উঠে ওদিকে চলল আর্ট

ডগসন ও লোপেয। চারতলা দালানের পঞ্চাশ গজের ভিতর পৌঁছে দেখল, প্রতিটি জানালার উপরে পোক্ত স্টিলের শাটার। অনায়াসেই খোলা বা বন্ধ করা যায়। রেডিয়োতে দশ নম্বর সিগনাল দেয়া সাইক্লোন এলেও কিছুই হবে না ওই বাড়ির।

কিন্তু পুরো কমপাউণ্ড ঘিরে রেখেছে পাঁচ ফুট দেয়াল। ওটা টপকে যাওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। আপাতত আঁধার রাস্তায় কেউ নেই, মাত্র বিশ সেকেণ্ডে দেয়ালের ওপাশে নামল ডগসন ও লোপেয। বাগানের বাইরের দিকে জটলা তৈরি করেছে সারি সারি পাইন গাছ। একটা গোলাপ গাছের ঘন ছায়া পেয়ে সেখানেই আশ্রয় নিল ওরা।

প্রথমতলার জানালায় দেখা গেল এক মহিলাকে। বয়স হবে চল্লিশ। ক্রু কাট চুল। পরনে টি-শার্ট ও জাপানিস ভিন্টেজ প্যান্ট। কাজ করছে ডেস্কটপ কমপিউটারে। মনিটারটা অস্বাভাবিক বড়। একটু দূরে আরও দুটো কমপিউটারে বসা আর দু'জন। ওদের চুল কালো। বয়স বড়জোর পঁচিশ। দৃঢ়বদ্ধ মুখের একপাশ দেখলে মনে হয়, এরা পুলিশ বাহিনীর লোক।

আরও আছে এক বিশাল কুকুর। মায়ার কোডেক্স চুরি করবার আগে এলেনা হিউবার্ট ওদেরকে বলেছিল, ওই বাড়িতে আছে মস্ত এক জার্মান শেফার্ড কুকুর। আর ওটার কারণেই সাধারণ চোরদেরকে কাজে লাগাতে পারছে না সে। সেই রাতে ডগসন যখন এখানে ডাকাতি করতে এল, এক ঘণ্টা চোখ রেখে নিশ্চিত হয়েছিল, কুকুরটা এ বাড়িতে নেই। তারপরেও লাভ হয়নি। দরজা খুলবে ভাবতেই গুলি শুরু করল বদমাশ মাসুদ রানা। ওই সোহানা চৌধুরীও কম ছিল না। শেষে লেজ গুটিয়ে দেয়াল টপকে পালাতে হয়েছে ডগসনকে।

এখন ভাল করেই জানে, নানান সিকিউরিটি সিস্টেম, সেন্সর, ক্যামেরা, অ্যালার্ম ইত্যাদির কারণে এ বাড়ি আসলে দুর্গম দুর্গ।

আর সেই কারণেই আরও কাছে যেতে দ্বিধা আসছে। এখন শুধু দরকার জানালার ওপাশে মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরীকে, তা হলেই দুই গুলিতে দুই পাখি মেরে উধাও হবে সে।

পরিষ্কার দেখল ঘরের আরেক পাশ থেকে উঠে এসে মধ্যবয়সী মহিলার পায়ের কাছে বসল মস্ত কুকুরটা। মিথ্যা বলেনি এলেনা হিউবার্ট। কুকুরটা সত্যিই ভয়ালদর্শন, জার্মান শেফার্ডের সব গুণই আছে ওর মাঝে। সামান্য গন্ধ পেলেই বুঝবে অপরিচিত কেউ রয়েছে আশপাশে, আর অবিশ্বাস্য ওদের আনুগত্য। দরকারে জান দিতেও দেরি করবে না প্রভুর জন্য। এলেনা হিউবার্ট আগেই বলে দিয়েছিল, ওটার আচরণ দেখে তার ধারণা হয়েছে: সব রকম ট্রেনিং পেয়েছে ওই কুকুর, নির্দেশ পেলেই হামলে পড়বে শত্রুর উপর। মাংস বা হাড্ডি দিলেই গলে পড়বে না। এখন ওটাকে বাইরে ছেড়ে দেয়া হলে, দূর থেকেই খুন করতে হবে, নইলে মস্ত বিপদে পড়বে ও নিজেই।

ডগসন দেখল, মাঝ বয়সী মহিলা উঠে গিয়ে কামরার দূর দেয়ালের কেবিনেট খুলল। পিছন পিছন গেল কুকুরটা। মনে হলো ট্রেনিং দেয়া হয়েছে বলেই পাহারা দিয়ে রাখছে মনিবকে।

লোপেযের কানে কানে বলল ডগসন, 'ওই দুই কপোত-কপোতিকে কোথাও দেখছি না।'

'আমিও তো দেখছি না,' বলল লোপেয।

'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি। কুকুর বাইরে ছেড়ে দিতে চাইলে দেয়াল টপকে সরে যাব।' বিরক্তি ও রাগ লাগছে ডগসনের। কাদা হয়ে গেছে মেকআপ। বড্ড অস্বস্তি বোধ করছে। একবার মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরীকে খুন করতে পারলেই কাজ শেষ, এক সেকেণ্ডও থাকবে না এখানে।

নিশ্চয়ই বাড়িতেই আছে?

কিন্তু কোথায়?

একবারও জানালার কাছে আসেনি।

হঠাৎ করেই ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুকুরটার দুই কান, আড়ষ্ট পায়ে হেঁটে এল জানালার সামনে। কী যেন দেখতে চাইছে কাঁচের ওপাশ থেকে। কোনও আওয়াজ পেয়েছে, অথবা গন্ধ। হতে পারে দেখেছে ডগসন ও লোপেযকে। গর্জে উঠল জানালার ওপাশ থেকে, এদিকে এল না কোনও আওয়াজ। বেরিয়ে এসেছে ওটার মাড়ি ও ভয়ঙ্কর শ্বদন্ত।

জানালায় কুকুরটার পাশে এসে দাঁড়াল মহিলা, মনে হলো ডগসন ও লোপেযের দিকেই চেয়ে আছে। জানালা থেকে সরে গেল মহিলা।

পাইন গাছের পাশ থেকে ঝটপট পিছিয়ে গেল ডগসন ও লোপেয, পাঁচ সেকেণ্ডে দেয়াল টপকে নেমে এল আঁধার রাস্তায়। হন হন করে হাঁটতে শুরু করেছে। স্টক থেকে সরিয়ে ফেলল ডগসন শ্‌টায়ার রাইফেলের উনিশ ইঞ্চি ব্যারেল, সব রেখে দিল ঝুলির ভিতরে।

হেঁটে চলেছে নিজেদের আস্তানা লক্ষ্য করে। একবার পিছনে চাইল ডগসন।

সার্চ লাইটের ধবধবে সাদা আলোয় দিন হয়ে উঠেছে রানা এজেন্সির কম্পাউণ্ড। বাগানে কেউ থাকলে সহজেই ধরা পড়ত।

'কপাল ভাল, আলো জ্বেলে দেয়ার আগেই সরতে পেরেছি,' মন্তব্য করল লোপেয। 'তোমাকে লাগছে ঠিক নীল ভ্যাম্পায়ারের মত!'

বিরক্ত হয়ে বুকের দিকে চাইল ঘর্মাক্ত ডগসন। শার্টের বুকে লেগে আছে গলে পড়া গোলাপি মেকআপ। সৈকতে যাওয়ার রেলিং টপকে গেল ওরা, বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল ভুতুড়ে, পোড়ো বাড়ির নোংরা আস্তাবল লক্ষ্য করে।

'ওরা উধাও হয় কীভাবে?' বলল ডগসন, 'যাবেই বা কোথায়?'

মুখে বলল বটে, কিন্তু তার অন্তর বলল: এখানে এসেই আবারও কোথাও গেছে। আবারও বোকা বানিয়েছে ওদেরকে। যেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারবে, নিশ্চয়ই গেছে সেই গুয়াতেমালায়।

স্যাটালাইট ফোনে স্পিড-ডায়াল ব্যবহার করল ডগসন, ভাল করেই জানে, রাত হোক বা দিন, যখন খুশি কল করলেই ফোন রিসিভ না করে পারবে না এলেনা হিউবার্ট। মিথ্যা হলো না ডগসনের ধারণা। তাতে অবাক বা খুশিও হলো না সে।

'ইয়েস?'

'হ্যালো, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছি রানা এজেন্সি থেকে। ওখানে কুকুরসহ আছে বয়স্কা সেই মহিলা, আরও দুই কর্মচারীও ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখিনি মাসুদ রানা বা সোহানা চৌধুরীকে।'

'ওরা ওখানে নেই?'

'না, নেই। ফোন করেছি সাবধান করতে। আমার ধারণা, তারা গেছে গুয়াতেমালাতেই।'

'আপনার কী মনে হয়? কী করছে এখানে?'

'জানি না, হয়তো সতিই কিছু পেয়েছে স্পেনের লাইব্রেরিতে। হয়তো ওটা ছিল সোহানা চৌধুরীর পার্সে। আর সবাইকে বোকা বানাতে নিজের সঙ্গে ব্রিফকেস রেখেছে মাসুদ রানা।'

'হতে পারে,' বলল এলেনা হিউবার্ট।

'ফোন করেছি অন্য কারণে। সাবধান থাকুন, আমার মনে হচ্ছে যে-কোনও সময়ে দেখা দেবে আপনার বাড়িতে। কে জানে, হয়তো সঙ্গে পুলিশ নেবে।'

'আপনারা ফিরে আসুন। আজ রাতেই ফ্লাই করতে পারবেন? বা ভোরের বিমানে?'

'মুশকিলে আছি, এখনও আমার মুখ নীল।'

'এখনও রং সরাতে পারেননি?'

'না। দুনিয়ার সব সলভেন্ট ব্যবহার করেছি। কোনও কাজেই আসেনি কিছু। এখনও ভারতের রাজা নীলবর্ণ রামের মতই অবস্থা। মেকআপ সামান্য কাজে আসছে, তবে...'

'ঠিক আছে, বুঝলাম। কথা বলব আমার ব্যক্তিগত ডাক্তারের সঙ্গে। খুব দক্ষ ডাক্তার তিনি, আশা করি দূর করতে পারবেন আপনার সমস্যা। আমি বললে তাঁর এক কলিগকে ফোন করবেন, তিনি আছেন লস অ্যাঞ্জেলেসে। তিনি আপনার সমস্যা দেখবেন।'

'ডাক্তার কী করবে?' বিরক্ত হয়ে বলল ডগসন।

'আমার ভুল না হয়ে থাকলে, সে কেমিকেল দিয়ে আপনার ত্বকের বাইরের অংশ চেঁছে দূর করে দেবে নীল রং। নতুন করে গজিয়ে উঠবে সুস্থ ত্বক। যাই হোক, আমি তো আর ডাক্তার নই, কাজেই এসব বিস্তারিত বলতে পারব না। তাঁর নাম ডক্টর টিমোথি কিন। তাঁর চিকিৎসা নেয়ার পর আমি চাই বৃহস্পতিবার গুয়াতেমালা সিটিতে পৌঁছবেন। সঙ্গে আপনার বন্ধুকেও আনবেন, আমি চাই আপনি যেন বুঝতে পারেন এ দেশের মানুষের কথা।'

'ঠিক আছে,' বলল ডগসন, 'পৌঁছে যাব। সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের কিছুই নেই, আর্ট। বিশ্বস্ত কাউকে চাই পাশে। নইলে ক্ষতি করবে মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরী। যে সুযোগ পেয়েছি, তা হাত ফস্কে বেরিয়ে যাক, চাই না। যে কাজে নামছি, ওটা হবে আমার জীবনের সেরা প্রজেক্ট। ওই দু'জন আমার ক্ষতি করার আগেই উল্টো তাদেরকেই পৌঁছে দিতে হবে ঈশ্বরের কাছে। বুঝিয়ে দিতে হবে, তারা কিছুই নয়। গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে। এবার বুঝবে, পিছনে লাগাটা ছিল কী রকম মারাত্মক ভুল।'

একুশ

গুয়াতেমালান কর্তৃপক্ষ কতটা সাহায্য করবে এলেনা হিউবার্টকে, তা জানা নেই রানা বা সোহানার; কিন্তু আঁচ করে নিয়েছে, ওদের জন্য কেউ চোখ রাখবে না সুদূর বেলিযে। প্রাইভেট এক জেট বিমানে করে পুন্টা গর্ডায় হাজির হয়েছে ওরা। ওখান থেকে বাস ধরে পৌঁছে গেছে লিভিংস্টোনের উপকূলে। ভাড়া করেছে এক জেলের নৌকা, যাবে রিয়ো ডালস থেকে ল্যাগো দে ইযাব্যাল। ওখানেই পেরোবে গুয়াতেমালার সীমান্ত। ওই এলাকা থেকে চারটে দেশের সীমানা অতিক্রম করতে পারবে যে-কোনও টুরিস্ট। মাত্র একবার সামনে পড়বে কাস্টমস অফিশিয়াল, তারপর অনায়াসেই ঢুকতে পারবে চারটি দেশের যে-কোনওটায়।

ল্যাগো দে ইযাব্যালে পৌঁছে দ্বিতীয় বোট ভাড়া নিল ওরা। ঠিক হয়েছে, ওটাতে করেই পেরোবে লেক। রওনা হওয়ার পর আকাশে ওরা দেখল নীল-ধূসর বিশাল মেঘের বিস্তৃতি, এবং বহু দূরে উপকূলের ওপাশে মস্ত উঁচু দেয়াল— ঢেউ খেলানো নীল পর্বত। ওদের যাত্রা হলো চমৎকার। ডেক চেয়ারে বসে রানার মনে হলো, মাইলের পর মাইল মায়াময় দৃশ্য দেখে জুড়িয়ে যাচ্ছে ওর দুই ক্লান্ত চোখ।

এবার আটঘাট বেঁধে প্রস্তুত হয়েই চলেছে রানা ও সোহানা। যারা সাহায্য করবে, তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছে ওরা। লিস্টে রয়েছে গুয়াতেমালা সিটির বাংলাদেশ এমব্যাসির সেকেণ্ড অফিসার মুক্তা, গুয়াতেমালান ন্যাশনাল পুলিশের কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়াষ।

কথা দিয়েছেন কমাণ্ডার, ওরা যদি প্রমাণ করতে পারে এ দেশ থেকে অ্যান্টিকুইটি সরাতে শুরু করেছে এলেনা হিউবার্ট, বা তার কাছে আছে মেক্সিকান আগ্নেয়গিরির মায়ান কোডেক্স, সেক্ষেত্রে অবশ্যই মেয়েটিকে গ্রেফতার করবেন তিনি। দরকার পড়লে দুর্গম এলাকায় রেঞ্জারদের স্কোয়াড নিয়ে হাজির হতেও আপত্তি নেই।

মুস্তাফিজা হোসেন মুক্তার সঙ্গেও কথা হয়েছে ওদের।

রানা জানতে চেয়েছে, 'সত্যিই রাজি হয়েছে রিকো আন্দ্রিয়ায? তার মনোভাব পাল্টে যাওয়ার কারণ কী?'

'কারণ জানি না, মাসুদ ভাই,' বলেছে মুক্তা। 'তবে সব সময় সাহায্য করতেই চেষ্টা করেন। যে কারণেই হোক, তিনি আমাদের পাশে থাকতে চাইছেন।'

রানা ফোন রাখবার পর মিটি মিটি হেসেছে সোহানা, 'বুঝলে না?'

'না। তুমি বুঝতে পেরেছ?'

'ওই দালানে কমপক্ষে তিরিশজন বিবাহিত অফিসারের তিরিশটা অফিস পেরিয়ে ওপর তলায় উঠেছে মুক্তা। সরাসরি গিয়ে ঢুকেছে হ্যাণ্ডসাম কমাণ্ডারের অফিসে। দু'জনের বয়সও কিন্তু সমান। আর ওই বেচারা চোখ সরাতে পারছিল না মুক্তার ওপর থেকে। ...কী বুঝলে?'

'হুম্,' গম্ভীর হয়ে গেছে রানা।

'অত চিন্তার কিছুই নেই, মুক্তাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মনে হয়েছে। লেজে ঘোরাতে পারবে অমন দশটা কমাণ্ডারকে।'

গুয়াতেমালায় ফিরে এসে এখন ওরা চলেছে জরুরি কাজে। স্যাটালাইট ফোনে রয়েছে ন্যাশনাল পুলিশের কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায ও বাংলাদেশ এমব্যাসির সেকেণ্ড অফিসার মুক্তার নম্বর। আশা করা যায়, বিপদে পড়লে তাদের কাছ থেকে সহায়তা পাবে।

এখন যে-লেকের বুক চিরে চলেছে, ওটা দৈর্ঘ্যে একত্রিশ

মাইল, চওড়ায় ষোলো মাইল। অবশ্য তীরের এল গ্রস্টরে পৌঁছে স্বস্তি বোধ করল সোহানা। আসলে শক্ত জমিতে কয়েক দিন এক নাগাড়ে হাঁটলেও এতটা ক্লান্তি লাগবে না ওর।

এল এস্টরে ছোট এক বোট ভাড়া নিল ওরা। ওটা ওদেরকে নেবে পোলোচিক নদীর উজানে। ওই নদী পশ্চিম থেকে নেমে এসেছে লেকে। দৈর্ঘ্যে দেড় শ' মাইল, সাপের মত আঁকাবাঁকা, সরু। দুইপাশে গহীন অরণ্য। সেই পাহাড়ি হরিৎ গাছের সারি নেমেছে পানির কিনারায়। ওই নদী বেয়ে উঠতে হবে ছোট শহর প্যানযোসে। ওখান থেকে পাথুরে, এবড়োখেবড়ো পথ গেছে দেশের মস্ত বড় জঙ্গলের গভীরে।

নদীপথে যাওয়ার সময় ওরা টের পেল, শুরু হয়েছে দুর্গম এলাকা। কখনও দেখল সামান্য কয়েকটা বসত বাড়ি। বড় কোনও গ্রাম চোখেই পড়ল না।

গতবারের মতই এবারও নিজেদের সঙ্গে অস্ত্র রেখেছে রানা ও সোহানা। মেয়াদ এখনও বলবৎ আছে অস্ত্র বহন করার গুয়াতেমালান পারমিট। আর সেই কারণেই পুন্টা গর্ডায় ওদের জন্য চারটে সেমি অটোমেটিক পিস্তল রেখেছিল সালমা। প্রথমবার যখন ওরা এসেছিল এ দেশে, বেলি ব্যাণ্ডে শার্টের নীচে রেখেছিল পিস্তল। তবে এবার জোগাড় করা হয়েছে তিন গুণ বেশি নাইন মিলিমিটার অ্যামিউনিশন। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দশটা করে গুলি ভরা ম্যাগাযিন।

ওরা পৌঁছে গেছে গুয়াতেমালার গভীর জঙ্গুলে অঞ্চলে। এখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে যার যার ব্যাকপ্যাক নিয়ে। বাইরের কোনও সাহায্য পাবে না। চাইলেও জোগাড় করতে পারবে না নতুন কিছু। সবচেয়ে কাছের নগর-সভ্যতাও এখান থেকে বহু দূরে।

প্যানযোরে পৌঁছবার পর অগভীর হয়ে গেল নদী। বোট থেকে নেমে ওরা দেখল ধুলোবালির রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কফির দানা

ভরা একটা ট্রাক। গন্তব্য পশ্চিমে। বোটের মালিকের কাছে বলতে সে অনুবাদকের কাজ করল। জানা গেল, হ্যাঁ, ড্রাইভারের আপত্তি নেই ওদেরকে এগিয়ে দিতে। আরও জানা গেল, বোটের মালিক আসলে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেজন্যই রানা ও সোহানাকে ট্রাক যতদূর যায় সেই রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে দেবে সে, সেজন্য দিতে হবে সামান্য কয়েকটা কুয়েটযাল।

দু'দিন ধরে চলল ট্রাক ভ্রমণ।

ড্রাইভারের কাছে আইপড় আছে, ওটা থেকে আধুনিক সব গান বাজিয়ে নিজে শুনল সে, ওদেরকে শোনাল ট্রাকের রেডিয়ো স্পিকারে। বেশিরভাগ গানই স্প্যানিশ। দু'চারটে আছে ইংরেজি। অবশ্য হতবাক হয়ে গেল রানা ও সোহানা বাঙালিদের প্রিয় একটা গান শুনে।

খড়-খড় আওয়াজ তোলা স্পিকারে জঙ্গুলে পথে মনে হলো, সুদূর বাংলাদেশ থেকে ভেসে আসছে ওই গানঃ আমি গাইবো... গাইবো... বিজয়ের গান... সব ক'টা জানালা, খুলে দাও না...

গুয়াতেমালার ড্রাইভারের রুচি দেখে অবাক হলো ওরা। অন্য কয়েকটি দেশের গানও খারাপ লাগল না মোটেও।

চলল ওরা জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পশ্চিমের পাথুরে পথে।

দ্বিতীয় দিন দুপুরে পৌঁছল ধুলোময় এক ডিপোতে। এখানে এই রিজিয়নের চারপাশ থেকে ট্রাকে করে এসেছে কফি। ব্যস্ত হয়ে নামানো হচ্ছে কফির দানা, বস্তায় ভরে তোলা হচ্ছে দাঁড়িপাল্লায়। তারপর বস্তা গুনে নিয়ে রাখা হচ্ছে ট্র্যাক্টর ট্রেইলার ট্রাকে, ওগুলো রওনা হয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা ধরে।

ড্রাইভারের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। মানুষটা এবার কফি দানার বিনিময়ে সামান্য ক'টা টাকস হাতে নিয়ে আবারও ধরবে ফিরতি পথ।

রানা-সোহানা পশ্চিমের পথে নতুন করে রওনা হওয়ার আগে

একবার দেখে নিল মোবাইল ফোনের জিপিএস লোকেশন।

ওদের প্রথম গর্ন্তব্য মাত্র বিশ মাইল দূরে।

বাকি দিন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হাঁটল ওরা। সোজা চলেছে গাছে ঢাকা মায়ান শহরের উদ্দেশে। বিকেলে বুনো প্রাণীর একটা ট্রেইল পেল। ওটার কারণে সহজ হলো পথ চলা। অবশ্য ওই পথে যেতে গিয়ে গন্তব্য থেকে খানিকটা উত্তরে সরতে হচ্ছে। বড় গাছ, ঝোপ ও লতা গাছ ভরে রেখেছে চারপাশ। যেদিকে চোখ গেল সবুজ আর সবুজ। মাথার উপর ছাতের মত পাতার ঘন আবরণ। বাতাস নেই বললেই চলে। পাতার ছাউনির কারণে সূর্যের হামলা নেই, কিন্তু দম আটকে আসছে ভাপসা গরমে।

মাঝে মাঝে থেমে দেখে নিচ্ছে জিপিএস পজিশন। হেঁটে চলেছে বুনো জন্তুর হাঁটা-পথে। রাস্তা থেকে অনেক সরে যেতে হয়েছে। বুঝতে পারছে, বেশি দূরে নেই মায়াদের সেই হারিয়ে যাওয়া শহর। কখনও ভূমিসাৎ গাছের কাণ্ড পেরিয়ে যাওয়ার সময় ছাড়া ওদের মাঝে কথা হচ্ছে না। কথা বললেও তা ফিসফিস করে। কিচির-মিচির আওয়াজ তুলছে হাজারো পাখি। এ ছাড়া আছে হাউলার মাঙ্কির চিৎকার। গাছের উপর ওরা দলে দলে, মানুষ দেখলেই ব্যস্ত হয়ে একে অপরকে সতর্ক করছে।

আগেও বহুবার জঙ্গলে থেকেছে রানা ও সোহানা, কাজেই গুয়াতেমালার উঁচু জমির এই অরণ্যে অস্বস্তি বোধ করছে না। বুনো এক ছন্দে মানিয়ে নিয়েছে নিজেদেরকে।

দ্বিতীয় দিন সূর্য উঠবার পর সবুজ অরণ্যে দেখা দিল অসংখ্য রঙের খেলা। অবশ্য, রোদ দেখা দেবে কমপক্ষে একঘণ্টা পর।

নীরবে নাস্তা সেরে নিল ওরা, তারপর ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে গেল রওনা হবে বলে। আর তিন বা চার ঘণ্টা পর তপ্ত হয়ে উঠবে চারপাশ, তখন কঠিন হবে হাঁটা।

সন্ধ্যার দিকে সূর্য ডুবলে নতুন করে ক্যাম্প করল ওরা।

প্রতিদিন প্রথম কাজ হয়ে উঠেছে খুঁজে বের করা ঝর্না বা ডোবা। পানি পেলেই তা ফুটিয়ে নিচ্ছে। অগভীর গর্ত খুঁড়ে জ্বালছে ছোট আগুন, তবে ডাল ভেজা হলে আগুনই জ্বালছে না। শুকনো খাবার খেয়ে নিচ্ছে।

তৃতীয় দিন স্যাটালাইট ফোনের জিপিএস দেখে বুঝল, খুব কাছে পৌঁছে গেছে মায়ান সাইটের।

সোহানার স্যাটালাইট ফোনে স্যান ডিয়েগোতে যোগাযোগ করা হলো সালমা আলীর কাছে।

'গুড মর্নিং,' বলল সালমা। 'কী অবস্থা আপনাদের?'

'খুব কাছে পৌঁছে গেছি,' বলল সোহানা।

'কিছু দেখেছেন?'

'এখনও না,' বলল সোহানা, 'তিন দিন আগে পথ ছেড়ে এসেছি। ফোনের জিপিএস সিগনাল অনুসরণ করছেন তো?'

'হ্যাঁ,' বলল সালমা। 'পরিষ্কার সিগনাল। ভাল করেই জানি আপনারা কোথায়।'

'নতুন কিছু দেখলে ই-মেইল করব।'

'ঠিক আছে,' বলল সালমা। 'যদিও শেষে ভুতুড়ে মস্ত এক বিল পাব ইন্টারনেট কোম্পানির কাছ থেকে।'

'আফসোস করে চাপড়ে দেবেন কাল্লুর কপাল,' হাসল সোহানা। 'ও রাগ করবে না।'

'তা ঠিক।'

'বাই,' বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিল সোহানা। দেখল ভুরু কুঁচকে ফেলেছে রানা। এক সেকেণ্ড পর সোহানাও পেল ওই আওয়াজ। হারিয়ে গেছে একটু আগের থমথমে পরিবেশ। ধুপ-ধুপ আওয়াজ তুলছে হেলিকপ্টার। এখনও দূরে। ওটা দেখবার চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু উপরের ঘন পাতার কারণে কিছুই দেখা গেল না। অনেক কাছে চলে আসছে ইঞ্জিনের গর্জন। প্রকৃতির স্বাভাবিক সব

আওয়াজ ছাপিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল ওটা উত্তর দিকে। দুলতে লাগল ওপরের ডাল-পাতা।

এখন গাছের মগডালে উঠেও দেখা যাবে না ওটাকে। দু' মিনিট পর মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

'মনে হচ্ছে ল্যাণ্ড করেছে,' বলল সোহানা।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'চলো, গিয়ে দেখি কী করে।'

'আমাদেরকে খুঁজে বের করার আগে বরং তাদেরকেই খুঁজে বের করা ঢের ভাল।'

গুছিয়ে নিল ওরা ব্যাকপ্যাক। লোড করল বাড়তি পিস্তল। রেখে দিল বাইরের দিকের কমপার্টমেন্টে। আরেক কমপার্টমেন্টে থাকল রানার স্যাটালাইট ফোন। ব্যাকপ্যাক লুকিয়ে রাখা হলো ঘন ঝোপের মাঝে। কাছের বড় গাছে চিহ্ন রাখল। নিজেদের সঙ্গে একটা করে পিস্তল ওদের, রওনা হয়ে গেল গেইম ট্রেইল ধরে।

কথা বলছে না ওরা, দরকার পড়লে হাতের ইশারা করছে। প্রতি বিশ গজ যাওয়ার পর থামছে, দেখে নিচ্ছে চারপাশ। কান খাড়া। জঙ্গলে অস্বাভাবিক কোনও আওয়াজ নেই। চতুর্থবার থামবার পর মানুষের গলার আওয়াজ পেল ওরা। জোরে জোরে কথা বলছে কারা যেন। ভাষাটা স্প্যানিশ। এত দ্রুত বলছে যে বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

সাবধানে এগোল রানা-সোহানা। একটু এগোতেই দেখা গেল সামনে ফুরিয়ে গেছে জঙ্গল, ওখানে জন্মেনি গাছ, বা পরিষ্কার করা হয়েছে। বৃত্তাকার বড় এলাকার এক পাশে নেমেছে হেলিকপ্টার। ওটা থেকে ভারী সব ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে একদল লোক। সব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বড় এক ছাউনির নীচে। মালপত্রের মাঝে আছে কয়েকটি অ্যালিউমিনিয়ামের কেস, ভিডিয়ো ক্যামেরা, ট্রাইপড এবং অচেনা কিছু ইকুইপমেন্ট।

হেলিকপ্টারের পাশে পাইলটকে দেখল ওরা। ইয়ারফোনে এখনও যুক্ত ইন্সট্রুমেণ্ট প্যানেলের ওয়্যার। রেডিয়োতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

খুব সাবধানে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলেছে রানা ও সোহানা। শেষ সারি গাছের কাছে থামল।

ডানদিকে ইশারা করল সোহানা।

ওদিকে খোলা এক জায়গায় জন্মেছে দীর্ঘ ঘাস। তারপর গাছের সারি উঠেছে সামনের টিলার বুকে। জায়গাটা অস্বাভাবিক। নীচ থেকে শুরু করে পাথুরে সিঁড়ির ধাপ উঠেছে চূড়ায়, গায়ে গাছ-গাছড়া, ঝোপ। কোথাও পাথরের ধাপের অংশ উপড়ে ফেলেছে মোটা শেকড়। পাথরখণ্ড পড়ে আছে নীচে।

ওরা বুঝল, সত্যিই পৌঁছে গেছে মায়া পিরামিডের কাছে।

ওই পিরামিড আছে কোডেক্সের মানচিত্রে। এখন কমপক্ষে এক শ' লোক অকাজ করছে ওখানে। হাতে কুঠার, শাবল, কোদাল ও স্টিলের বালতি। পরিষ্কার করছে হাজার বছরের জমা পাতা, হিউমাস, ধুলোবালি ও গাছ। কোপের পর কোপ নামছে পাথরের বুকে। মনে হলো না এরা আর্কিয়োলজিস্ট, চারপাশের সব ধ্বংস করছে ডেমোলিশন ক্রুর মত। একদল লোক পিরামিডের নানা জায়গার ঝোপঝাড় কেটে ধরিয়ে দিচ্ছে আগুন। মজুররা বের করে আনছে পাথুরে স্থাপনা।

সোহানার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে লাগল রানা। ফিসফিস করে বলল সোহানা, 'ডক্টর আক্তার রশিদ এদের কাজ দেখলে হার্ট অ্যাটাক করতেন।'

কয়েক মিনিট পর রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোহানা।

পিরামিডের একপাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে একদল সশস্ত্র লোক। সংখ্যায় বিশজন। প্রত্যেকের কাঁধের স্লিঙে রাইফেল। পিরামিডের উপরে আরও বেশ কয়েকজন, সঙ্গে পিস্তল

ও রাইফেল। এইমাত্র উপস্থিত হওয়া লোকগুলোর উদ্দেশে হাত নাড়ল কেউ কেউ।

সোহানার স্যাটালাইট ফোনের ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত রানা। দেখে নিচ্ছে ছবিগুলো। কাজটা শেষে সব পাঠিয়ে দিল সালমার উদ্দেশে। ফোন রেখে আস্তে করে সোহানার কাঁধে টোকা দিল।

খুব সাবধানে পিছিয়ে যেতে শুরু করল ওরা। নীরবে আবারও ফিরল গেইম ট্রেইলে। অনেক দূরে সরে এসে বুঝল, এখন ওদের গলার আওয়াজ পাবে না লোকগুলো।

সোহানার ফোনের নম্বর অনুযায়ী কল দিল রানা।

'পোলিসিয়া ফেডারালেস।'

'হ্যালো, মাসুদ রানা বলছি।'

ওদিকের কণ্ঠ বলল, 'কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায বলছি, আপনার কলের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'ধন্যবাদ, কমাণ্ডার। আগেই জানিয়েছি কোঅর্ডিনেট্স্। আমরা এখন ওখানেই। বড় এক মায়ান শহরের মন্দিরের কাছে। এক শ'র বেশি লোক পরিষ্কার করছে পিরামিড। পাহারায় আছে সশস্ত্র একদল লোক। একটু আগে নেমেছে একটা হেলিকপ্টার। মনে হচ্ছে এরা ফিল্ম ক্রু।'

'কোনও অপরাধ করছে?'

'মজুররা শাবল, কোদাল, কুঠার ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে চাইছে পিরামিড। আর্কিয়োলজিস্টরা দেখলে আতঙ্কে জ্ঞান হারাবেন। আগেই বলেছি, এসব কাজ কে করাচ্ছে। স্যান ডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে কোডেক্স চুরি না করলে বের করতে পারত না মায়া শহর।'

'বুঝলাম। ওই লোকেশনে এক স্কোয়াড রেঞ্জার পাঠাচ্ছি। এমন কিছু পেলেন, যে কারণে ওই মেয়েকে গ্রেফতার করতে পারি?'

'এদেরকে নিশ্চয়ই কাগজে লিখে দিয়েছে কোথায় পাবে পিরামিড। কোডেক্সের পাতার ফোটোকপিও দিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রমাণ করতে পারবেন জিনিসটা ওর কাছেই আছে। এ ছাড়া, পুলিশ এলে ঠিকভাবে এক্সকেভেট করবে এরা, নইলে নষ্ট করবে বহু কিছুই।'

'ঠিক আছে, এদের এক্সকেভেশন দেখতে হেলিকপ্টারে করে সোলজার পাঠাচ্ছি। আপাতত আর কিছুই করতে পারব না।'

'তাও কম নয়, ধন্যবাদ,' কল কেটে সোহানার হাতে ফোন ধরিয়ে দিল রানা।

সালমা আলীর কাছে ফোন দিল সোহানা। 'হাই, সালমা। ছবিগুলো দেখেছেন? ডক্টর রশিদকে জানাতে পারেন, তাঁর ধারণাই ঠিক— মস্ত পিরামিড। এইমাত্র পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তারা লোক পাঠাবে। ভাল হয় কোডেক্সের মানচিত্র ব্যবহার করেছে প্রমাণ করতে পারলে।'

'পুলিশকে জানাতে ভুল করবেন না, হয়তো ওই মানচিত্র আছে ওই মেয়ের কম্পিউটার, ফোন বা অন্য কোথাও।'

'চিন্তা করবেন না, ধরা তাকে পড়তেই হবে।'

'গুড লাক।'

'ঠিক আছে, তা হলে ফোন রাখি। আবারও ফিরব সাইটের কাছে।'

জঙ্গলের মাঝের ওই জায়গার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা ও সোহানা। কিছুক্ষণ পর ওখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল ঘন এক ঝোপে।

একসময় ব্যস্ত ছিল প্রাচীন শহরের প্লাযা, ভাবলে কেমন যেন লাগে। দূরে ধুপ-ধুপ আওয়াজ পেল ওরা। এদিকে আসছে আরেকটা হেলিকপ্টার। অন্যটার মতই ওটাও এল দক্ষিণ থেকে। সরাসরি জঙ্গলের উপর দিয়ে এসে থামল ফাঁকা জায়গার আকাশে,

তারপর নেমে পড়ল প্রথম হেলিকপ্টারের পাশে।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে যান্ত্রিক ফড়িঙের দিকে চলল চার ক্যামেরা ক্রু, সবার হাতে যার যার ইকুইপমেন্ট। মাত্র কমতে শুরু করেছে হেলিকপ্টারের রোটর, ফিল্ম করতে লাগল তারা। তাদের মাঝে রয়েছে সাউণ্ডম্যান, একটা খুঁটির মুখে বাগিয়ে ধরেছে মাইক্রোফোন। আরেকজনের কাঁধে ভিডিয়ো ক্যামেরা, সে সিনেমাটোগ্রাফার। অন্য একজন ব্যস্ত ব্যাটারি অপারেটেড বাতি নিয়ন্ত্রণ করতে। ট্রাইপডের ছাতার কেবল গেছে ছাউনির তলের এক বাক্সে, ওসব নিয়ে অস্থির চতুর্থজন।

বন্ধ করে দেয়া হলো হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন। খুলে গেল এক পাশের দরজা। প্রথমে নেমে এল এলেনা হিউবার্টের সিকিউরিটি গার্ড, মনে হলো খাঁচায় আটকানো লড়াকু মোষ। চওড়া কাঁধ, পেশিবহুল দেহ, পরনে সবুজ প্যান্ট ও খাকি শার্ট। কাঁধের স্লিঙে ঝুলছে ছোট অস্ত্র— মেশিন-পিস্তল। হেলিকপ্টারের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে।

এবার রানির মত নেমে এল সুন্দরী এলেনা হিউবার্ট। পনি টেইলে বেঁধেছে সোনালী চুল, চকচক করছে পিঠের কাছে। পরনে হালকা নীল সুতির শার্ট ও ট্রপিকাল খাকি প্যান্ট। নামকরা কোনও দরজিকে দিয়ে তৈরি। বুটজোড়া কমব্যাট বুটের মতই, কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে বাদামি নরম চামড়া। নিখুঁত পোশাকে মনে হলো অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েছে অপরূপা এক মেয়ে, জানে না জঙ্গলে বেশিক্ষণ থাকলে নষ্ট হবে ওই পোশাক।

হেলিকপ্টার থেকে সরে গেল এলেনা। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান ও অ্যাসিস্ট্যান্ট, রেকর্ড করছে ভিডিয়ো।

এলেনার ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে, ল্যাণ্ডিং ক্রাফট থেকে লেইটির শত্রু সৈকতে নেমেছেন জেনারেল ম্যাকআর্থার।

এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল ক'জন লোক। এলেনা হাঁটতে শুরু

করতেই সামনে থেকে এল তারা। পরনে জঙ্গলের উপযুক্ত পোশাক। বারবার বাউ করছে, মুখে বোধহয় ভক্তিমূলক কথা। কিন্তু তাদেরকে পিছনে ফেলে নিরাবরণ পিরামিডের দিকে চলল সে।

গোটা দল থামল মস্ত সিঁড়ির নীচে। কয়েক ধাপ উপরে উঠল এলেনা। এবার কী যেন জানাল ক্যামেরাম্যান।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বাদ দিয়ে থমকে গেল মেয়েটা। কীসের যেন আলাপ হলো দু'জনের মাঝে। আবারও সবাই চলে গেল হেলিকপ্টারের কাছে। আকাশযানে উঠল এলেনা।

নতুন করে আবারও শুরু হলো নাটক।

ফিল্ম করছে ক্যামেরা ক্রুরা।

হেলিকপ্টারের মেঝে থেকে পা দুলিয়ে নেমে এল এলেনা, সামনে দাঁড়ানো এক্সকেভেশন ক্রুদের জানাল জরুরি কয়েকটা বিষয়, তারপর দৃঢ় ভঙ্গিতে গিয়ে পা রাখল পিরামিডের প্রথম সিঁড়ির ধাপে।

সব দৃশ্য ঠিকভাবে ধারণ করেছে ক্যামেরাম্যান। কিছু ভিডিয়ো দেখাল এলেনাকে। জানাল, আরও কী কী করা উচিত।

আবারও সবাই ফিরল হেলিকপ্টারের কাছে।

নতুন করে শুধু হলো অভিনয়।

প্রথম সিনে দেখা যাবে পিরামিড আবিষ্কার করেছে এলেনা। আরও কিছু সিন গুরুত্বের সঙ্গে ফিল্ম করা হলো। ছাউনির নীচে টেবিলে বসে আছে এলেনা হিউবার্ট। কয়েকজন কলিগকে নিয়ে দেখছে বড়সড় এক মানচিত্র। পিরামিড থেকে খসে পড়া পাথর দিয়ে মানচিত্রের চার কোনা চাপা দেয়া হয়েছে। মানচিত্রের বেশ কয়েকটা জায়গায় আঙুল ঠুকল সে। ডায়াগ্রাম বের করে দেখাল। মনে হলো, কীভাবে কাজ চলবে বুঝিয়ে দিচ্ছে সঙ্গীদেরকে।

রানা বা সোহানা শুনতে পেল না কী বলছে। অবাক হয়ে

দেখতে লাগল মেয়েটির অভিনয়। নিচু স্বরে বলল সোহানা, 'এই মেয়ে সিনেমায় নামল না কেন? ভাল করত!'

আরও কয়েকবার ভিডিয়ো করা হলো নানা বিষয়ে।

রানা-সোহানার মনে হলো মোটেও খারাপ হবে না এলেনার মায়ান ডকুমেন্টারি।

কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল ফিল্ম করা।

সর্বক্ষণ এলেনার সঙ্গে থাকল এক মহিলা।

রানা-সোহানা প্রথমে ভেবেছিল সত্যিই ওই মহিলা আর্কিয়োলজিস্ট। কিন্তু তা নয়, বারবার এলেনাকে নিয়ে হেলিকপ্টারের কাছে ফিরল সে, মস্ত এক কালো বাক্স বের করে মেকআপ চড়াল কোটিপতি মেয়েটির মুখ-ঘাড়-গলা-হাতে। কয়েক রকমভাবে বেঁধে দিল চুল। এক পর্যায়ে চকচকে এক তাঁবুর ভিতর ঢুকল দু'জন। বেরোল আধঘণ্টা পর। দেখা গেল, এলেনার পরনে ডিজাইনার জিন্স ও সিল্ক ব্লাউস। এক জায়গায় আগেই খুঁড়ে রাখা হয়েছে গর্ত, ওখানে এক্সকেভেট করবার ভঙ্গি নিল এলেনা। ক্যামেরাম্যান ফিল্ম করল ওটা। ওখানে দড়ি ও খুঁটি নিয়ে কাজ করছে, সে ভিডিয়োও করা হলো। কাছ থেকে তুলল ছবি: ব্রাশ দিয়ে ধুলো ঝাড়ছে এক অবসিডিয়ান ছোরা থেকে। জিনিসটা আগেই রেখে দেয়া হয়েছে ওই গর্তে।

পুরো সময় নিজেরাও সংক্ষিপ্ত কিছু ভিডিয়ো নিল রানা ও সোহানা। আবারও ফোনের ভিউফাইণ্ডার এলেনার দিকে তাক করেছে রানা, এমন সময় দেখল স্ক্রিনে এক গার্ড। সে ঘুরে চেয়েছে ওদের দিকে। পরক্ষণে গলা ছাড়ল। আঙুল তুলেছে ওদের ঝোপের দিকে।

চট্ করে মুঠোর ভিতর ফোন লুকিয়ে ফেলল রানা। নিচু স্বরে বলল, 'ওই লোক বোধহয় ফোনের রিফ্লেকশন দেখে ফেলেছে।'

সোহানাকে নিয়ে জঙ্গলের মাঝে সরে যেতে চাইল ও।

অনায়াসেই লোকগুলোকে পিছনে ফেলতে পারবে ওরা।

তারা আছে কমপক্ষে এক শ' গজ দূরে।

কিন্তু চিৎকার করে পিরামিডের লোকগুলোকে সতর্ক করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দল আছে মাত্র কয়েক গজ দূরে। তেড়ে এল রানা ও সোহানাকে ধরতে।

'অস্ত্র থাকলে চলবে না,' জরুরি সুরে বলল রানা। নিজেরটা ঝোপে ফেলে পাতা দিয়ে ঢেকে দিল।

একই কাজ করল সোহানাও। 'এবার কী?' জানতে চাইল।

'শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকো এলেনার দিকে,' বলল রানা। 'এ ছাড়া উপায়ও নেই। ত্রিশজন গার্ডের সঙ্গে পারব না।'

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মস্ত প্লাযায় পা রাখল ওরা। হাঁটতে শুরু করল পিরামিডের দিকে। হাসি-হাসি মুখ। হাত তুলে এদিক ওদিক দেখিয়ে মন্তব্য করছে। 'আমরা ওকে কী বলব?' জানতে চাইল সোহানা।

'যা খুশি। সৈনিকরা আসুক, তার আগে খেপিয়ে দিয়ো না।' দীর্ঘ সিঁড়ির দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'সত্যিই অদ্ভুত দৃশ্য, তাই না?'

'গুলি খেয়ে মরার আগেই ওকে বলি, আমাদেরকে যেন পরের বছর ভাল ফসলের আশায় বলি দেয়া হয়।'

এলেনার জন্য খুঁড়ে দেয়া গর্তটার দিকে চলেছে ওরা।

হৈ-চৈ শুনে মুখ তুলে চাইল এলেনা, তখনই দেখল রানা-সোহানাকে। রেগে গিয়ে হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ব্রাশ, উঠে দাঁড়াল। দুই হাত রেখেছে কোমরে, কুৎসিত হয়ে উঠেছে সুন্দর মুখটা। কয়েক পা সামনে বাড়ল, আর তখনই রানা ও সোহানাকে ঘিরে ধরল তার সশস্ত্র লোকগুলো।

থমকে দাঁড়িয়ে গেছে রানা ও সোহানা, অপেক্ষা করল। লোকগুলোকে ঠেলে এদিকে বেরিয়ে এল এলেনা। কর্কশ স্বরে

বলল, 'আবারও তোমরা! আর কত জ্বালাবে!'

'এক কাজ করো, চুরি করা কোডেক্স ফিরিয়ে দাও, আমরা ওটা পৌঁছে দেব মেক্সিকান সরকারের কাছে,' বলল রানা। সোহানার দিকে চাইল। 'তুমি কী বলো, সোহানা? এলেনা ওর চোরাই মাল ফেরত দিলেই মাফ করে দেবে ওকে?'

'তা বোধহয় দেব,' মৃদু স্বরে বলল সোহানা। 'তবে ও ভাল করেই জানে, আমরা ওকে বিরক্ত করিনি। তাই না, এলেনা? আগে থেকে আমরা কী করে জানব যে তুমি আজ এখানে হাজির হবে?'

অস্ত্র হাতে ভয়ঙ্কর চেহারা করে দুই শত্রুকে দেখছে লোকগুলো। হয়তো ইংরেজি জানে না, কিন্তু বুঝে গেছে, রানা ও সোহানা যা বলেছে, তাতে খেপে গেছে তাদের মালকিন।

'চারপাশ ঘুরিয়ে দেখাবে না?' বলল রানা। 'অবশ্য, তুমি তো ফিল্মিং নিয়ে ব্যস্ত। আমরাই বরং ওদিকে গিয়ে চারপাশ দেখে নিই।'

এলেনা এতই রেগেছে, বারবার ফুলে উঠছে চোয়ালের পেশি। কয়েক সেকেণ্ড মাটির দিকে চেয়ে রইল, তারপর মাথা তুলে চাইল। চোখে ঘৃণা। চিৎকার করে ডাক দিল, 'আর্ট!'

ফিল্ম ক্রুদের কাছ থেকে এল কর্কশ কণ্ঠ: 'ইয়েস, মিস হিউবার্ট?'

রক্তিম মুখ নিয়ে মেয়েটার পাশে হাজির হলো এক লোক। কপাল থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত ছিলে তুলে নেয়া হয়েছে ত্বক। দেখলেই ঘিনঘিন করে ওঠে গা। লাল মাংসের উপর মেখে রেখেছে এক পরত ভ্যাসেলিন। রোদ পড়লে খবর আছে, কাজেই চওড়া ব্রিমের হ্যাট মাথায় দিয়ে আড়াল করেছে মুখ।

'এরা চারপাশ ঘুরে দেখতে চায়,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল এলেনা। 'এদেরকে ভালভাবে চারপাশ ঘুরিয়ে বিদায় করুন!'

'খুশি মনে, মিস হিউবার্ট!' ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসি হাসল আর্ট

ডগসন। ঘুরেই রানার পিঠে জোর এক ধাক্কা দিল। নিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে।

দ্বিতীয় এক লোক হাত বাড়াল সোহানার দিকে। কিন্তু তার আগেই রানার পাশে হাঁটতে শুরু করেছে সোহানা। পিছনের লোকটা স্প্যানিশে নির্দেশ দিল। 'অ্যাই! এসো!'

কমপক্ষে দশজন সশস্ত্র লোক এল পাহারা দিয়ে রানা ও সোহানাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

লাল বেলুনের মত মুখের লোকটার কোমরের হোলস্টারে .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল। হাত ঝুলছে অস্ত্রের বাঁটের কাছে। কয়েক সেকেণ্ড পর পর আলতো করে স্পর্শ করছে ওটা।

রাইফেল হাতে এক লোক লালুর সঙ্গীকে বলল, 'আমরা গরমে অতিষ্ঠ। আপনারা যদি দেরি করতে চান, তো আমরাই বরং শেষ করে দিই খেলা।'

লোকটার বক্তব্য ইংরেজিতে ডগসনকে জানাল লোপেয।

'ওরা ফিরে যাক, লোপেয,' বলল ডগসন। 'আমি নিজ হাতে এদের ব্যবস্থা নেব।'

'দরকার কী?'

'এত সহজ হবে না এদের মরণ। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তুমিও ওদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারো।'

'না, আমি আছি,' স্প্যানিশ ভাষায় অন্যদেরকে ফিরতে বলল লোপেয।

কিন্তু তারা ফিরবার আগেই একজনের কাছ থেকে খাটো হাতলওয়ালা এক কোদাল লোপেযকে নিতে বলল ডগসন। নিজেই বলল, 'গ্র্যাসিয়াস।'

পিরামিডের দিকে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল লোকগুলো।

রানা-সোহানাকে সামনে রেখে হাঁটছে দুই হিংস্র আততায়ী।

'ওদেরকে খুন করতে বললেই ভাল করতে,' বলল রানা। 'দশ

জনের সঙ্গে পারব না; কিন্তু তোমাদের দু'জনের সঙ্গে লড়ে জিতেও যেতে পারি।'

'তুমি শালা পাগল নাকি?' খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল ডগসন।

'একটু আগে খুনের অনুমতি পেয়েছ এলেনার কাছ থেকে,' বলল সোহানা, 'কাজটা যদি করো, অন্যরাও জানবে। ওদের জানা হয়ে যাবে তোমরা কী করেছ। পরে কথা না শুনলে যে-কেউ তোমাদেরকে ফাঁসিয়ে দেবে।'

'ভুল বললে, সুন্দরী,' বলল ডগসন। 'খুন করতে দেখলে সে সম্ভাবনা ছিল। এখন সে সুযোগ নেই।'

'গুলির আওয়াজ পাবে,' বলল রানা। 'তোমরা ফিরলেই বুঝবে খুন করেছ আমাদেরকে।'

'বক বক না করে হাঁটতে থাকো,' হুকুম দিল ডগসন।

'আমরা কিন্তু তৈরি ছিলাম,' বলল সোহানা। 'বাংলাদেশ এমব্যাসিতে জিপিএস পজিশন জানিয়ে এসেছি। ওরা জানে ঠিক কোথায় আছি। কিছু হলেই...'

'আমাদের নিয়ে এত ভাবতে হবে না তোমার,' বলল ডগসন। 'সব ম্যানেজ করে নেব।'

'তোমার মুখের এই অবস্থা কেন?' জানতে চাইল নিরীহ রানা।

'শালা! তুই-ই তো এমন করেছিস!'

'তাই? এ কী বলছ, আমি আবার কী করলাম?'

'তোর ওই স্পেনের বুবি-ট্র্যাপ। যখন তুলতে পারলাম না রং, বাধ্য হয়ে কেমিকেল দিয়ে চামড়া তুলে নিল ডাক্তার।'

'আহা, ব্যথা লেগেছে বুঝি?' জানতে চাইল সোহানা

'শালী বলে কী! কিন্তু এখন ভাল লাগছে। আমার ব্যথা এবার তোরাও টের পাবি। বুঝবি কেমন লাগে।'

ওদেরকে নিয়ে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে আর্কিয়োলজিকাল সাইট থেকে সরে এল কমপক্ষে এক মাইল। এক জায়গায় শুরু হয়েছে

প্রশস্ত বালির নালা। বর্ষার সময় এদিক দিয়ে ঝর্নার মত বয়ে যায় পানি। এখন শুকনো খটখটে। নালার মাঝে পৌঁছে লোপেযকে বলল ডগসন, 'শালাকে কোদাল দাও।'

দূর থেকে কোদালটা ছুঁড়ে দিল লোপেয। ওটা পড়ল রানার পায়ের পাশে।

'গর্ত কর্!' নির্দেশ দিল ডগসন।

একবার তাকে দেখে নিয়ে লোপেযের দিকে চাইল রানা, যেন ভুলে গেছে সোহানার কথা। বোকা-বোকা চেহারা। মনে হলো বুঝি জানতে চাইবে, গর্ত খুঁড়ে কী হবে?

এ ধরনের বিপদে কী করবে আগে থেকেই ঠিক করা আছে রানা ও সোহানার। রানা কাজে নামলে নিজেও জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সোহানা।

বেশিরভাগ শত্রু ওকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। সুন্দরী এক মেয়ে, এ আর কী করবে! এখন সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে ও। অ্যাথলেটদের মতই বিদ্যুদ্বেগ রিফ্লেক্স ওর। শত্রু ভাবতেও পারবে না দরকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্ষিপ্র চিতার মত। মাত্র একটি সুযোগ পেলেই পাল্টে দেবে পাশার ছক।

বালিতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করেছে রানা। ডানহাতি, কাজেই কোদালের ফলা গেঁথে দেয়ার জন্য ব্যবহার করছে ডান পায়ের বুট। ধুলোবালি তুলে ফেলছে বামপাশে। আর বামদিকেই আছে লোপেয ও ডগসন। তাদের দিকে বা সোহানার দিকে ঘুরেও চাইছে না রানা, তবে আড়চোখে আগেই দেখে নিয়েছে, মুঠোর সমান একটা পাথরের মালিক হয়ে গেছে সোহানা। ওটা আলগা করে নিয়ে ফেলে রেখেছে পায়ের কাছে। করুণ চেহারা বানিয়ে বসে আছে পাথরের সামনে। মনে হলো বড্ড দুর্বল, যে-কোনও সময়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠবে।

কোদালের কোপ দেয়ার মাঝে রানার মনে হলো, ভেসে এল

হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

হ্যাঁ, তাই তো!

তবে একটা হেলিকপ্টার নয়, একাধিক। গম্ভীর হয়ে উঠছে গর্জন। এলেনা হিউবার্টের হালকা হেলিকপ্টার নয় ওগুলো।

আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল লোপেয, কিন্তু চারপাশের দীর্ঘ গাছের কারণে কিছুই দেখা গেল না। মুখ ফিরিয়ে ডগসনকে বলল, 'ওই আওয়াজে চাপা পড়বে গুলির শব্দ। কী বলো, আর্ট?'

ঠিকই বলেছে লোকটা, ভাবল রানা ও সোহানা।

গরম চোখে ওদেরকে দেখল ডগসন, লোপেযের কথাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে।

আগের পঞ্চাশবারের মতই এবারও বালির বুক থেকে কোদাল তুলল রানা, কিন্তু ফলা ভরা বালি ঝপাৎ করে গিয়ে পড়ল ডগসনের আহত মুখে। পরক্ষণে অগভীর গর্ত থেকে এক লাফে উঠে এল ও, লোপেযের পায়ে খটাং করে বসিয়ে দিল কোদালের ফলা।

'আঁউ বাপ!' বলেই ধুপ্ করে বসে পড়ল লোপেয। ব্যথার চোটে দুই হাতে চেপে ধরেছে আহত ডান হাঁটু।

বালিঝড়ের ভয়ে মুখ লুকিয়েছে ডগসন। হাত থেকে অনেক নীচে হোলস্টারের পিস্তল। বেদম জ্বলুনিতে খুলতে পারছে না চোখ।

একই সময়ে পাথর হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে সোহানা, গায়ের জোরে ছুঁড়েছে ডগসনের মাথা লক্ষ্য করে।

'ঠকাস্!' শব্দে পৌঁছুল পাথর লক্ষ্যে।

ভীষণ ব্যথা পেয়ে ভারসাম্য হারাল ডগসন, বসে পড়েছে বালিতে।

সামনে বেড়ে লোকটার হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল সোহানা। ওদিকে লোপেযের ডান পায়ের কাফ মাসলে কোদালের আরেক বেদম গুঁতো লাগিয়ে দিয়েছে রানা।

'ওরিব্বাপরে!' বলেই বালির মেঝেতে চিৎপাত হলো লোপেয। বেল্টে গোঁজা পিস্তল বের করতে চাইছে, কিন্তু হাতে এসে লাগল কোদালের তৃতীয় বাড়ি।

পরক্ষণে কোদাল ছেড়ে ছোঁ দিল রানা, পেয়ে গেল লোপেযের পিস্তল। কয়েক পা পিছিয়ে গেল, অস্ত্রটা তাক করেছে মেক্সিকান আততায়ীর বুকে।

পিস্তল হাতে সরে এসেছে সোহানাও, মাযল চেয়ে আছে ডগসনের মাথায়।

অনেক কাছে হেলিকপ্টারের ধুপ-ধুপ আওয়াজ।

'এবার? এদের নিয়ে কী করবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'পিস্তলটা নাও,' ওর হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিল রানা। সামনে বেড়ে হ্যাঁচকা কয়েক টানে খুলে নিল ডগসন ও লোপেযের বুট। চামড়ার ফিতা কাজে লাগাল দুই আততায়ীর হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে। কাজ শেষে বলল রানা, 'আপাতত কিছুই করার নেই। এবার সাইটে ফিরব। হয়তো এলেনার কাছে পেয়ে যাব কোডেক্স।' জঙ্গলে পথে রওনা হয়ে গেল ও, দু'হাতে দুই বদমাশের বুট।

একবার ধরাশায়ী লোপেয ও ডগসনকে দেখে নিয়ে রানার পিছু নিল সোহানা।

বাইশ

জঙ্গলের মাঝে ফাঁকা প্লাযার কাছে এসে থেমে গেল রানা ও সোহানা। চট্ করে পরস্পরের দিকে চাইল। সোহানা বলল, 'কক্ষনো কেমিকেল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করাব না।'

'আর করালেও ওই লোকের মত ভয়ানক চেহারা বাগাতে পারবে না,' হাসল রানা।

'সুন্দর লাগবে বলে এত কষ্ট সহ্য করে কেউ?' হেসে ফেলল সোহানাও।

গাছের সারি থেকে দূরে অন্য দুই হেলিকপ্টারের কাছে নেমেছে মস্ত আকারের দুই সিএইচ-৪৭ চিনুক ট্রুপ ক্যারিয়ার। প্রাচীন সাইটের নানা দিকে পজিশন নিয়েছে ব্যাটল ড্রেস পরনে একদল সৈনিক। ছোট আরেক দল ঘিরে ফেলেছে এলেনার ছাউনি। চেহারায় অস্বস্তি, সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

ঘর্মাক্ত এবং বালিভরা রানা ও সোহানা কাছাকাছি হতেই চোখ বিস্ফারিত হলো তার।

'কী, এলেনা,' মৃদু হাসল সোহানা, চোখে দুষ্টুমি।

'এত বড় সাহস, আবারও এসেছ!' ফুঁসে উঠল মেয়েটা। ঝট্ করে ঘুরে চাইল কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়াযের দিকে। 'একটু আগে গুরুত্বপূর্ণ এই সাইট থেকে বের করে দেয়ার জন্যে আমার লোক পাঠিয়েছি এদের সঙ্গে। আবারও এসে হাজির হয়েছে!'

'ও বলতে চাইছে, জঙ্গলে খুনি পাঠিয়েছিল আমাদেরকে খুন করাতে,' বলল রানা।

'আশ্চর্য তো! আমি? হাসব না কাঁদব?' হাসবার ভঙ্গি করল এলেনা। তবে বিশ্বাসযোগ্য হলো না ওই হাসি।

'আপনাদের সবার কথাই শুনব হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার পর,' বলল কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায। স্কোয়াডের লেফটেন্যান্টের দিকে চাইল। 'লোক নিয়ে ভালভাবে চারপাশ সার্চ করো। টেন্ট, হেলিকপ্টার, ব্যাগ, বাক্স, কেস যা আছে, কিছুই যেন বাদ না পড়ে।'

'সার্চ করার কোনও অধিকার নেই আপনার,' আপত্তির সুরে বলল এলেনা।

'আমাদের কাজের বিষয়ে আদালতে তর্ক করতে পারবেন, এখানে নয়,' বলল গম্ভীর কমাণ্ডার।

'মনে রাখবেন এ কথাটা বলেছেন,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল এলেনা।

'জঙ্গলে দু'জন লোক রেখে এসেছি,' বলল রানা। 'এলেনার নির্দেশে খুন করতে নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে। তাদেরকে ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'ভুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না,' বলল কমাণ্ডার আন্দ্রিয়াষ। আবারও লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল। 'মিস্টার রানার সঙ্গে তিনজন লোক পাঠিয়ে দাও, নিয়ে আসুক তাদের।'

সোহানা সঙ্গে রওনা হতেই ওকে বলল রানা, 'বিশ্রাম নাও।' ওর চোখ দেখিয়ে দিল এলেনার ক্যাম্প সাইট। হয়তো ওখানে পাওয়া যাবে মায়ান কোডেক্স।

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহানা। 'ঠিক আছে। অপেক্ষায় থাকলাম।'

তিন সৈনিকসহ প্লাযা পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলেছে রানা, দেখল আন্দ্রিয়াযের সৈনিকরা পিরামিডের ছায়ায় লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়েছে এলেনার সশস্ত্র গার্ডদেরকে। এক শ' ফুট দূরে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে লোকগুলোর রাইফেল ও পিস্তল।

জঙ্গুলে পথে সৈনিকদেরকে পথ দেখাল রানা। ওই পথেই ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিল ডগসন ও লোপেয। প্রথম আসবার সময় মনে হয়েছিল পাড়ি দিচ্ছে দীর্ঘ পথ, তখন ফেডারাল পুলিশ আসুক সেজন্য যতটা সম্ভব ধীরে হেঁটেছে; আর ফিরবার সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছে। আর এবার স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে মনে হলো গন্তব্য এক শ' মাইল দূরে। পনেরো মিনিট পর বালির নালার কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

গর্ত পাওয়া গেল, কিন্তু আশপাশে নেই ডগসন ও লোপেয।

রানার দিকে চেয়ে আছে তিন সৈনিক।

'এখানেই বেঁধে রেখে যাই। কাজটা দক্ষ হাতে করতে পারিনি।'

'আপনি নিশ্চিত এই জায়গাই?' জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'হ্যাঁ।' গর্ত দেখাল রানা। 'আমাকে দিয়ে খুঁড়িয়ে নিয়েছিল কবর।'

কয়েক গজ দূরে সরে গর্তের কাছে চলে গেছে এক সৈনিক, বালির দাগ দেখাল। 'ওদের একজন গড়িয়ে এসেছে এখানে। অন্যজন এখানেই ছিল।' বালি থেকে চামড়ার ফিতার এক অংশ তুলে নিল সে। 'ওদের একজন চিবিয়ে চামড়ার ফিতা কেটেছে।'

'ভুলটা আমারই, উচিত ছিল গাছে বেঁধে রেখে যাওয়া,' বলল রানা।

সৈনিকদের একজন নিজেকে ভাল ট্র্যাকার মনে করে, খুঁজতে শুরু করে জঙ্গলে ঢুকল সে। অবশ্য কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে অন্য আরেক দিকে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, 'পায়ের কোনও ছাপ নেই। বোঝারও উপায় নেই কোথায় গেছে।'

'ওরা খালি পায়ে হাঁটছে,' বলল রানা। 'ওদের বুট খুলে নিয়েছি, কাজেই জুতোর দাগ থাকবে না।'

'খালি পায়ে কোথাও যেতে পারবে না,' শ্রাগ করল সার্জেন্ট। 'আবারও ফিরতে হবে ক্যাম্পে, নইলে মারা পড়বে জঙ্গলে।' ঘুরে দাঁড়াল সে, 'চলুন ফেরা যাক।'

সার্জেন্টের সঙ্গে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল অন্য দুই সৈনিক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছু নিল রানা।

আবারও প্লাযায় ফিরে দেখল, লোকজন উঠছে হেলিকপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে। ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট, ভাঁজ করা তাঁবু এবং সাপ্লাইয়ে ভরে ফেলা হয়েছে সিভিলিয়ান দুই হেলিকপ্টার।

এলেনা, তার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ডিগ সুপারভাইযাররা ঠাঁই পেল দুই মিলিটারি হেলিকপ্টারের একটিতে।

রানা খেয়াল করল এলেনার দুই কবজিতে হ্যাণ্ডকাফ। কাছেই

থাকছে কমাণ্ডার আন্দ্রিয়ায।

রানার জন্য পিরামিডের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সোহানা, ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল। 'ওদের পাওনি?'

'না। একজন গড়িয়ে গিয়ে আরেকজনের ফিতা কেটেছে।'

'ইঁদুর ছিল লোপেয,' বলল সোহানা। 'ওর দাঁত ঝিকমিকে।'

'বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে,' বলল রানা। 'সার্জেন্ট বলছে, জঙ্গলে কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু এদিকের হাজারো মানুষ জুতো ব্যবহার করে না। ...এদিকে কী ঘটল?'

'কমাণ্ডার আন্দ্রিয়ায বলেছে, এলেনার সুটকেসে মায়ান কোডেক্সের চার পাতার ফোটোকপি মানচিত্র পাওয়া গেছে। ওখানে দাগ দেয়া ছিল এই সাইট। চারটে জায়গার এরিয়াল ফোটোও আছে। এ ছাড়াও, আরও কয়েকটা ফোটোগ্রাফ ছিল। ওসব কোডেক্স নয়, কিন্তু ওগুলোর কারণে প্রমাণ করে দেয়া যাবে আসল মায়ান কোডেক্স ওর কাছেই আছে। নইলে কোথায় পেল ওই ফোটোগুলো?'

'গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহানা। 'প্রাচীন সাইট নষ্ট করা, এবং চোরাই মাল নিজের কাছে রাখার জন্যে গুয়াতেমালা সিটিতে নিয়ে গিয়ে জেলে রাখা হবে ওকে। মনে হলো কমাণ্ডার আন্দ্রিয়ায সাংবাদিক ডেকে কনফারেন্স করবে। এলেনার মত অন্য আর সবাইকে সতর্ক করতে চায়।'

'ওদের সঙ্গে হেলিকপ্টারে করে গুয়াতেমালা সিটিতে যেতে চাইলে জলদি করতে হবে,' বলল রানা। 'চলো, গিয়ে ব্যাকপ্যাক নিয়ে আসি।'

'তোমরা যাওয়ার পর সৈনিক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়েছি ওসব,' বলল সোহানা। 'জঙ্গল থেকেও খুঁজে এনেছি পিস্তলগুলো। খুলে কয়েক টুকরো করে ব্যাকপ্যাকে রেখে দিয়েছি। সব আছে এখন

হেলিকপ্টারে।'

'কাজ কমল,' চারপাশ দেখে নিল রানা। মজুরদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল এক দল সৈনিক। হেলিকপ্টারে উঠছে অন্য সৈনিকরা। অবশ্য তাদের আটজন রয়ে গেল পিরামিড পাহারা দেয়ার জন্য। 'চলো উঠে পড়ি, নইলে শেষে সিট পাব না।'

সোহানা হেলিকপ্টারে উঠবার পর উঠল রানা। মুখোমুখি বসল নাইলন নেটিঙের সিটে। আটকে নিল সিট বেল্ট। কয়েক মিনিট পর গর্জে উঠল ইঞ্জিন, আকাশে উঠে শহর লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল হেলিকপ্টার।

আকাশের দিকে চেয়ে আছে অ্যাডেলমো লোপেয। মাথার উপর দিয়ে গেল একটা হেলিকপ্টার। তারপর আরেকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর গাছের মাথা ছুঁয়ে গেল অন্য দুই হেলিকপ্টার। ওর মনে হলো, ওগুলো চলেছে দক্ষিণে, গুয়াতেমালা সিটির উদ্দেশে।

'এবার নিরাপদে যেতে পারব পিরামিডের কাছে,' বলল আর্ট ডগসন। 'শেষেরগুলো ট্রুপ ক্যারিয়ার ছিল।'

'চলো যাওয়া যাক,' বলল লোপেয। 'চোখ খোলা রাখো। রানা আর ওই মেয়ে আমাদের বুট কোথাও ফেলে গেছে।'

হাঁটতে শুরু করে দশ কদম ফেলতে না ফেলতেই ককিয়ে উঠল ডগসন। পায়ের নীচে পড়েছে তীক্ষ্ণ পাথর। এক পায়ে নাচতে শুরু করে 'আঁউ!' করে উঠল। অন্য পায়ের নীচে পড়েছে ভাঙা ডাল। পথের মাঝেই বসে পড়ল সে। দেখে নিল দুই পায়ের লাল পাতা। আবারও উঠে দাঁড়িয়ে তিক্ত মনে হাঁটতে শুরু করল। লাল মুখটা এখন কুঁচকে আছে যন্ত্রণায়। রানা ওর মুখে পাথুরে বালিকণা ছুঁড়ে দেয়ায় সব আটকে আছে কাঁচা মাংসে। দোষ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে এখন ভ্যাসেলিনের। গর্তের কাছে পড়ে থাকবার সময় এক গাদা বালি, মাটি, ঘাস আর ছোট ডাল লেগেছে দুই গালে,

জ্বলছে ভীষণ।

বুদ্ধিমানের মত চুপ করে আছে লোপেয। পাথুরে পথে এই পর্যন্ত আসতে আসতে কমপক্ষে দশবার ডগসন বলেছে, কী-কী উপায়ে ভয়ঙ্করভাবে মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরীকে খুন করবে। তাকে আর উস্কে দেয়া ঠিক হবে না। শেষে হয়তো ওকেও খুন করতে চাইবে।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে লোপেযেরও। কোদালের বাড়ি খেয়ে ফুলে গেছে ডান হাঁটু। ডানহাত অবশ। পড়ে গিয়ে পাঁজরেও ব্যথা। হাড়ে চিড় ধরে গেল কি না কে জানে! তবুও গড়াতে শুরু করে ডগসনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, দাঁত দিয়ে কেটে দিয়েছে সঙ্গীর চামড়ার ফিতা। কাজটা খুব কঠিন ছিল। কিন্তু বুঝতে দেরি হয়নি, যেভাবে হোক মুক্ত হতে হবে, নইলে খুন না করেও খুনের চেষ্টার দায়ে পচতে হবে গুয়াতেমালা সিটির জেলখানায়। আর ওদেরকে যদি খুঁজে না পায় সৈনিকরা, জঙ্গলে না খেয়ে, তৃষ্ণার্ত হয়ে মারা পড়তে হবে।

মেক্সিকোর প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হয়েছে লোপেয। ওর জানা আছে, অসহায়, রক্তাক্ত দু'জন লোক জঙ্গলে হারিয়ে গেলে সহজেই তাদেরকে খুঁজে বের করে রাতের রাজা— জাগুয়ার। আর তাদের হাত থেকে রক্ষা পেলেও বিপদ হতে পারে নানাদিক থেকে। হয়তো বেধে গেল ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া, চাগাস ডিযিয, বা ধরে রসল ডেঙ্গু ব্যারাম। সেক্ষেত্রে চিকিৎসাহীন অবস্থায় জঙ্গলে রক্ষা নেই কারও। কাজেই যেভাবে হোক মুক্ত করতে হবে নিজেদের। ওরা ছাড়া পাওয়ার পর জঙ্গলে ঝোপের মাঝে শুয়ে ছিল, এমন সময় পাশ দিয়ে গেল সৈনিকরা। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরেও গেল। বিশ মিনিট পর চলে গেছে হেলিকপ্টার। আর কোনও বিপদ হবে না হয়তো। কিন্তু আর্টের কথা ভাবতে গিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠছে লোপেয। ওই রং মুখে লাগবার পর থেকে পাগলের মত আচরণ

করছে লোকটা। সর্বক্ষণ খেপে আছে ব্যথায় আর রাগে।

সত্যিই খুব চিন্তিত লোপেয। জঙ্গলের সব না বুঝে চললে মস্ত বিপদে পড়তে হবে। শহরে কোনও ভুল হলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেনে নেয়া সহজ, কিন্তু জঙ্গল সামান্য ভুল হলেই কেড়ে নেবে প্রাণ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে লোপেয, কিছুক্ষণ পর ছোট একটা গাছের কাছে থামল। ওই গাছ জন্মেছে বড় এক গাছের জায়গায়। শুকনো মড়া গাছ থেকে পাঁচ ফুটি দুটো ডাল ভেঙে নিল সে। ওগুলো দিয়ে লাঠির কাজ চালিয়ে নেবে। 'নাও, হাঁটতে সুবিধা হবে।'

লাঠির সাহায্য নিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটল ওরা। লাঠি দিয়ে পরখ করছে সামনের পথ। চোখা পাথর দেখলে সরিয়ে দিচ্ছে দূরে। পথের পাথুরে খারাপ অংশ এড়িয়ে চলছে। প্রাচীন শহরে পৌঁছুতে পুরো একঘণ্টা লাগল ওদের। জঙ্গলের শেষে এসে দেখল প্লাযা এখন প্রায় ফাঁকা। এলেনার লোকজন নেই। কিন্তু পিরামিডের মস্ত ধাপে বসে আছে আট সৈনিক। ছোট একটা আগুন জ্বেলেছে তারা। তিনটে তাঁবুও ফেলেছে কাছেই।

প্লাযার প্রাঙ্গণের দিকে ডগসন পা বাড়াতেই বাধা দিল লোপেয, সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এক মিনিট, আর্ট। ওরা সৈনিক।'

'দেখেছি।'

'হয়তো আমাদের ধরতেই অপেক্ষা করছে!'

থমকে গেল ডগসন। ভাবতে শুরু করেছে।

ওকে সাহায্য করল লোপেয। 'রানা আর ওই মেয়ে নিশ্চয়ই সৈনিকদের বলেছে, আমরা ওদেরকে খুন করতে চেয়েছি।'

'এখন ভেবে কী হবে!' বলল ডগসন। 'আমরা আছি সভ্যতা থেকে কমপক্ষে এক শ' মাইল দূরে। আমাদের জুতোও নেই। পানি নেই। খাবারও নেই। কিন্তু ওদের কাছে সবই আছে।'

'আরেকটা জিনিস আছে ওদের কাছে। অস্ত্র। অ্যাসল্ট

রাইফেল। ফুল অটো।'

'অপেক্ষা করতে পারি। ঘুমিয়ে পড়লে ক্রল করে যাব, গলা কেটে দেব ওদের।'

'ওরা আটজন। তিন তাঁবুতে ঘুমাবে। আমাদের কাছে ছোরা নেই, তারপরেও যদি ধরি প্রথম তাঁবুর দুই সৈনিককে কাবু করে ফেললাম, তারপরও খুনের আগেই ওদের যে-কেউ চেঁচিয়ে উঠতে পারে। অন্য দুই তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসবে পাঁচজন, তা হলেই আমরা শেষ।'

'খালি পায়ে হাঁটতে পারব না,' বলল ডগসন। 'গ্রাম বা শহর অনেক দূর।'

'অপেক্ষা করো,' বলল লোপেয। 'ওদিকে দেখো। ওরা খুলে ফেলেনি ছাউনি। ওই ক্যানভাস দিয়ে বানিয়ে নেব জুতো। হেঁটে বেরিয়ে যাব এই ফাঁদ থেকে।'

ভয়ঙ্কর আহত হিংস্র জানোয়ারের মত গুঙিয়ে চলেছে ডগসন, কিন্তু লোপেযের কথা শুনে শান্ত হলো। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখো। পারতপক্ষে আট সৈনিকের সঙ্গে লড়তে যেয়ো না!'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল লোপেয। 'ক্যানভাস নিয়ে আসছি।' ডগসন মত পাল্টে নেয়ার আগেই রওনা হয়ে গেল। জঙ্গলের শেষ সারির গাছের পিছনে থেকে চলেছে ছাউনির দিকে। পাথুরে জমির আঘাতে নীল হয়ে গেছে দুই পায়ের পাতা। নীরবে সহ্য করছে কষ্ট। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল ছাউনির পাশে। পিরামিডের দিকে চাইল। সৈনিক যেখানে আছে, সে জায়গাটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। তার মানে সৈনিকরাও ওকে দেখবে না। একটা অ্যালিউমিনিয়ামের খুঁটির শেষ অংশ কাজে লাগাল সে, গর্ত তৈরি করল ক্যানভাসে। ছিঁড়ে নিল বড় একটা অংশ, তারপর ওটা নিয়ে ক্রল করে ফিরতে লাগল ডগসনের দিকের জঙ্গলে।

পনেরো মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছে গেল সে।

চার টুকরো করল ওরা ক্যানভাসটা। টুকরোগুলোর মাঝে রাখল পা, তারপর সঙ্গে আনা চামড়ার ফিতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল গোড়ালির সঙ্গে।

শেষ বিকেলের ছায়া পড়েছে মস্ত প্লাযা ও পিরামিডে। ওসব দেখে নিয়ে দক্ষিণ মুখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঠি হাতে জঙ্গুলে পথে রওনা হয়ে গেল ওরা, যেন দুই অশীতিপর বৃদ্ধ।

'পরেরবার, নিখুঁত কাজ নিয়ে ভাবব না,' ঘড়ঘড় করে বলল ডগসন। 'কবর খুঁড়তে হবে না, কোথাও নিয়ে যাওয়ারও খ্যাতা পুড়ি, যার খুশি দেখুক ওদেরকে খুন করতে। দেখলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে গুলি। যদি সাক্ষী থাকে, তাদেরকেও খুন করব।'

জঙ্গুলে পথে হাঁটতে হাঁটতে লোপেয শুনতে লাগল ডগসনের এক হাজার একটা অভিযোগ। প্রতিবার বিশ্রামের পর আবারও রওনা হতে গিয়ে রানা ও সোহানাকে নতুন সব উপায়ে খুন করার কঠিন সঙ্কল্প নিচ্ছে ডগসন। চুপচাপ হাঁটছে লোপেয। কেউ কেউ বলে হাঁটবার ফাঁকে কথা বললে ব্যথা কমে, কিন্তু পা, পাঁজর আর হাতের ব্যথা ভুলে গেল লোপেয ডগসনের শত শত অভিযোগ শুনে। আপাতত ব্যথা কমছে, এ-ও কম কথা নয়। পরে যদি বেরিয়ে যেতে পারে এই সবুজ জেলখানা থেকে, যদি সুস্থ থাকে, খুশি মনে ওই দুই বদমাশকে খুন করবার বিষয়ে আলাপ করবে।

তেইশ

মামলা উঠেছে সেন্ট্রাল কোর্টে, কমাণ্ডার আন্দ্রিয়াযের সঙ্গে রানা ও

সোহানা গুয়াতেমালা সিটি ফিরবার ক'দিন পর স্থির হলো শুনানির দিন ও সময়।

বাংলাদেশ এমব্যাসির সেকেণ্ড অফিসার মুক্তা, রানা ও সোহানা সঠিক সময়ে হাজির হলো আদালতে।

কোর্টরুমে ওরা বসতে না বসতেই মুক্তা ফিসফিস করে বলল, 'এহ্‌হে! অবস্থা ভাল না!'

'সমস্যা কী?' জানতে চাইল সোহানা।

'এখনও পুরো বুঝিনি, আপা,' বলল মুক্তা, 'কিন্তু মনে হয় অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া হবে মামলা। বিবাদীদের টেবিলের দিকে দেখুন। ওসব লোক আমাদের হয়ে কথা বলবে না।'

ওদিকের টেবিলের লোকগুলোকে দেখে নিল সোহানা। সব মিলে ছয়জন। পরনে দামি সুট। তিনজন মায়া জাতির বংশোদ্ভূত। অন্যরা মেসটিযোস। কাসাসের বই খুঁজতে ভ্যালাডোলিডে যাওয়ার পর এদের মত অনেককেই দেখেছে ওরা।

'এরা কারা?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সোহানা।

'ইণ্টেরিয়র মিনিস্টার, কোর্টের চিফ জাজ, দুই গুরুত্বপূর্ণ কমার্স অফিশিয়াল, অন্য দুইজন প্রেসিডেণ্টের সিনিয়র পলিটিকাল অ্যাডভাইযর।'

'তাতে কী?'

'ওতেই তো সব।'

'তোমাকে অবাক মনে হচ্ছে,' বলল সোহানা।

'দুই হাজার আট সালে ইণ্টারন্যাশনাল কমিশন এগেইন্‌স্ট ইমপিউনিটি বিল এনেছিল এই দেশ। কোর্ট সিস্টেমের দুর্নীতি আর অবৈধ সিকিউরিটি ফোর্স দূর করার চেষ্টা করা হয়। আর আলটা ভেরাপাযে ওই অবৈধ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল আপনাদের। যারা এসব খুনিদের সরিয়ে দিতে চেয়েছে, তাদের কমপক্ষে তিনজন এখন এলেনার পক্ষে। ঘনিষ্ঠদের পক্ষ নিতে

দেরি করছে না এরা।'

এক মুহূর্ত পর খুলে গেল কোর্টরুমের একপাশের দরজা, দুই পুলিশ অফিসারের মাঝে হেঁটে এল এলেনা হিউবার্ট।

পিছনে মেয়েটার উকিল।

রানার পাঁজরে আলতো গুঁতো দিল সোহানা। 'চিনতে পারছ ওদের?'

ফিসফিস করে মুক্তাকে বলল রানা, 'প্রথম তিনজন স্যান ডিয়েগোতে এসেছিল কোডেক্সের বিক্রির চুক্তি করতে।'

ওদিকের টেবিলের পাশে গিয়ে থামল গুয়াতেমালান, ব্রিটিশ ও মেক্সিকান উকিল।

'ওরা নামকরা স্থানীয় ল ফার্মের মালিক,' বলল মুক্তা।

এলেনা হিউবার্ট ও তার তিন উকিল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এক পলক পর সবাইকে চুপ করাতে হাঁক ছাড়ল কোর্টের বেইলিফ। পরক্ষণে আদালতে এসে ঢুকলেন বিচারক। সিঁড়ি ভেঙে গটমট করে গিয়ে উঠলেন উঁচু মঞ্চে। কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বারকয়েক ধুপ-ধুপ আওয়াজ করলেন, বুঝিয়ে দিলেন এখন কোনও কথা নয়। সবাই বসে পড়ল যার যার সিটে।

বিচারকের জোব্বা চেয়ার স্পর্শ করতেই ছুটল বাদী ও বিবাদী পক্ষের উকিল, প্রায় দৌড়ে গেল মঞ্চের সামনে।

কয়েক মিনিট কী সব আলাপ চলল দু'পক্ষের উকিলের সঙ্গে বিচারকের।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'আমি তো কোনও তর্ক শুনছি না।'

'আমিও না,' ফিসফিস করল মুক্তা। 'সব ঝামেলা মিটিয়ে নিয়েছে আগেই।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'এ জন্যেই তো এসেছে অত গুরুত্বপূর্ণ লোকগুলো! বুঝলেন না? নিজেদের দাপট আর ওজন চাপিয়ে দিয়েছে বিচারকের ঘাড়ে।

বিচার করবে কে? ঝামেলা থেকে বাঁচতে হবে না জাজের?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাতের ইশারা করলেন বিচারক, যেন বলতে চান: যান তো এখান থেকে!

তাড়া খাওয়া তেলাপোকার মত ধড়মড় করে যার যার টেবিলের পিছনে চলে গেল দুই পক্ষের উকিল।

'এই মহান আদালতকে জানানো হয়েছে, মিস হিউবার্টের উকিল এবং গণতান্ত্রিক গুয়াতেমালার পক্ষের উকিলের মাঝে মধ্যস্থতা হয়েছে।'

'কী কারণে বাদীপক্ষ তা মেনে নেবেন?' গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল রানা।

আশপাশের বেশ কয়েকজন আপত্তির চোখে ওকে দেখল।

নিজের কাগজ দেখলেন বিচারক, তারপর আবারও শুরু করলেন, 'যথেষ্ট প্রমাণ নেই, কাজেই মায়ান কোডেক্সের বিষয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেই রকম কোনও বই পাওয়া যায়নি। মানুষকে হুমকি দেয়ার যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাও প্রমাণ হয়নি। যারা হুমকি দিয়েছে বলা হয়েছে, তাদেরও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাজেই এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

'পুলিশ কিন্তু প্রমাণ হিসেবে বহু কিছুই দিয়েছে আদালতকে,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল সোহানা।

নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করেছে কেউ কেউ। অনেকে ঘুরে দেখছে সোহানাকে।

হাতুড়ি মেরে ঠক-ঠক আওয়াজ তুললেন বিচারক, চোখ গরম করে দেখলেন ওকে।

ওর পাশ থেকে নিচু স্বরে বলল মুক্তা, 'এবার আদালতের কাজ শেষ করবেন বিচারক। চুপ করে বসে পড়ুন, আপা। নইলে বের করে দেবে আদালত থেকে। আর সেক্ষেত্রে হয়তো কয়েক সপ্তাহ

লাগবে প্রতিলিখন পেতে।'

নাকের কাছে ধরা কাগজ নামিয়ে টেবিলে রাখলেন বিচারক, তুলে নিলেন আরেকটা কাগজ। পড়তে লাগলেন স্প্যানিশ ভাষায়: 'সেনোরিটা হিউবার্ট দাবি করেছেন, তিনিই আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন শহর। তিনি চান ওই এলাকা নিরানব্বুই বছরের জন্য লিয নিতে। কাজেই আলটা ভেরাপাযের বুনো পশু বিষয়ক অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় তাঁকে উপযুক্ত টাকার বিনিময়ে ওই এলাকা লিয দিচ্ছে।'

'এখানে বিচার হচ্ছে?' স্প্যানিশে বলল সোহানা।

নিচু স্বরে বলল মুক্তা, 'চুক্তির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন উনি। এর মানে এ-ই নয় যে তিনি মেনে নেবেন সব। আপনি কিছু বললে পাল্টে যেতে পারে তাঁর মনোভাব।'

চুপ করে সব দেখছে রানা।

'এবার আসা যাক কমাণ্ডার আন্দ্রিয়ায বিষয়ে। এলেনা হিউবার্ট দাবি করেছেন, যাতে করে অন্য কাজ দেয়া হয় কমাণ্ডারকে। নইলে সে সেনোরিটার ক্ষতি করতে পারে।'

তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। চট্ করে দেখল সোহানাকে।

ধপ্ করে বসে পড়েছে সোহানা। বুঝে গেছে, এখানে নাটক চলছে বিচারের নামে।

চুক্তির খসড়া শোনাবার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বিচারক, তারপর জোর কণ্ঠে বললেন, 'এই চুক্তির বিষয়ে জানিয়ে দিলাম আমার সম্মতি। এখানেই সমাপ্ত এই কেস।' খটা-খট্ বার কয়েক আওয়াজ তুললেন কাঠের হাতুড়ি দিয়ে।

বেশ কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে বেঞ্চ ছাড়ল সেকেণ্ড অফিসার মুক্তা। পরের কেসের কাজ শুরু হবে একটু পর।

'মাসুদ ভাই, সোহানা আপা, চলুন যাওয়া যাক।'

'প্রমাণ দিতে বা সাক্ষ্য দিতে ডাকা হবে না আমাদেরকে,' বাঁকা মন্তব্যের সুরে বলেছে রানা, কণ্ঠের আওয়াজ জোরালো।

সোহানা দেখল রানার দিকে ঘুরে চেয়েছে ঘরের অর্ধেক লোক। তাদের চোখ আবার চলে গেল এলেনা হিউবার্টের দিকে।

অদ্ভুত তৃপ্তির সামান্য হাসি মেয়েটার ঠোঁটে। কয়েক মুহূর্ত পর হারিয়ে গেল ওটা মুখ থেকে। আবারও মনোযোগ দিল সামনে।

'অনেক আগেই সব ঠিকঠাক ছিল,' চাপা কণ্ঠে বলল মুক্তা। 'দুনিয়ার সবখানে এমনই হয়।'

'ক্ষমতার জোরে জালিয়াতি করছে একজন, কিন্তু তার টাকা আছে বলে যা খুশি করবে,' বলল রানা। 'এমন কী তার বিরুদ্ধে অভিযোগও আমলে আনবে না আদালত। আশ্চর্য দেশ!'

কাঠের হাতুড়ি হেঁকে জোর গলায় আদেশ দিল জাজ, 'আদালত থেকে বের করে দেয়া হোক ওই লোককে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্ত সুরে বলল রানা, 'আপনাদেরকে কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।'

কিন্তু রওনা হওয়ার আগেই বিশালদেহী দুই পুলিশ এসে খপ করে ধরল ওর দুই কনুই, মস্ত দরজা দিয়ে বের করে আনল আদালত কক্ষ থেকে বারান্দায়। ছেড়ে দেয়া হলো ওকে। 'দয়া করে ঝামেলা করবেন না,' বলল এক পুলিশ। 'আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যান।'

রানার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে সোহানা ও মুক্তা। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দালানের সামনে নামল ওরা। মুখ শুকিয়ে গেছে সোহানা ও মুক্তার।

একবার আদালতের দিকে চাইল রানা, ভেবেছিল রাত কাটাতে হবে গুয়াতেমালা সিটি জেলখানায়।

'জানি, কমাণ্ডার আন্দ্রিয়ায তোমার বন্ধু, খারাপ লাগছে তাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি,' মুক্তাকে বলল রানা।

'প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এলেনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ পাত্তা দিল না বিচারক,' বলল সোহানা। 'কোনও বই না থাকলে তার ছবি

তোলা যায় না, তাও মানবে না এরা।'

'মাসুদ ভাই, ভাববেন না, কমাণ্ডার আন্দ্রিয়াষ ভাল করেই জানে কী করতে হবে,' বলল মুক্তা। 'তার কোনও বিপদও হবে না। ওর পক্ষেও অনেকেই আছে। এক বা দুই সপ্তাহ পর কমাণ্ডারের হয়ে কাজে নামবে তারা। এভাবেই তো নোংরা পুকুরের মত দেশ ধীরে ধীরে আধুনিক দেশ হয়। আপনাদের বা কমাণ্ডারের জন্যে প্রতি পদে বাধা থাকবে, এ স্বাভাবিক।' চট্ করে রানা ও সোহানাকে দেখে নিল মুক্তা। 'জানি, হাল ছাড়বেন না আপনারা। শেষে হয়তো একসময় সত্যিই বিচারের মুখোমুখি হবে এলেনা হিউবার্ট।'

রানা ও সোহানার কাছ থেকে বিদায় নিল মুক্তা, ওকে ফিরতে হবে বাংলাদেশ এমব্যাসিতে। মেয়েটি চলে যাওয়ার পর আরেকবার আদালত ভবনের দিকে চাইল রানা।

'চলো যাওয়া যাক,' বলল সোহানা। 'এলেনা বেরোবার আগেই চলে যেতে চাই। নইলে দেখতে হবে বিজয়ের বাকবাকুম করতে করতে নেমে আসছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সোহানার পাশে হাঁটতে লাগল রানা হোটেলের উদ্দেশে।

'এবার কী করবে ভাবছ,' বলল সোহানা।

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ওকে যা খুশি করতে দেব না।'

'কিন্তু ঠেকাবে কী করে?'

'লাস কাসাসের কপি কাজে আসবে। জেনে নেব এরপর কোথায় যাবে। ওর আগেই সেখানে যাব।' মৃদু হাসল রানা। 'কাজ শেষে পরের সাইটে। আপাতত এভাবেই চলবে।'

চব্বিশ

বেল ২০৬বি৩ জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে মাসুদ রানা ও সোহানা, বিকট আওয়াজ ঠেকাতে কানে ইয়ারফোন। লিযার্ড ওয়ান এয়ার চার্টার কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং চিফ পাইলট জন এইচ. জুয়েল উড়িয়ে নিয়ে চলেছে হেলিকপ্টার, মাইলের পর মাইল সবুজ অরণ্যের মাথা ছুঁয়ে ছুটছে। ক্যানাডিয়ান মানুষ জন, রেডিয়োতে বলল, 'কয়েক মিনিট পর নতুন সেট কোঅর্ডিনেটসের কাছে পৌঁছে যাব।'

'গুড,' বলল রানা। 'প্রতিটি সাইটে একদিন খরচ হচ্ছে। আজকের কাজ শেষে জঙ্গলেই থাকব, পরদিন সকালে আরেক সাইটে।'

'আমার জন্যে আনন্দের কাজ এটা,' বলল জন। 'উড়ে গিয়ে নামব, আরাম করে ঘুম দেব। ঘুম থেকে উঠে আবারও উড়ব।'

'দেশের দুর্গম জায়গায় এসব সাইট,' বলল সোহানা। 'বেশির ভাগই উঁচু জমিতে জন্মানো জঙ্গলে।'

'ভাববেন না,' হাসল জন। 'আমাদের কোম্পানি উনিশ শ' ষাট সাল থেকে কাজ করছে, আর এই সপ্তাহে কেউ হারিয়ে যায়নি। কম কথা নয়।'

বড় করে তোলা ফোটোগ্রাফ তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। বর্ডারে লেখা কোঅর্ডিনেট্স্।

জিপিএস কোঅর্ডিনেট্স্ দেখে নিল পাইলট। ফিরিয়ে দিল ছবি। 'পাঁচ মিনিটে ওখানে পৌঁছে যাব।'

নীচে অসংখ্য গাছের পাতার চাদর, দূরে নীলচে নিচু পর্বতমালা, তার উপর গাঢ় নীল আকাশ— ওই বিশাল বুকে ভাসছে পেঁজা তুলার মত সব মেঘ। শুরুর দিকে ছিল কিছু সরু রাস্তা, ছিল ছোট কিছু শহরও, তারপর একসময় কোথাও থাকল না মানুষের বসতির কোনও চিহ্ন।

জিপিএস দেখল জন।

'ওই যে!' নীচে দেখাল সোহানা। ঘন জঙ্গল ভেদ করে দাঁত বের করেছে ধূসর পাথরের চাতাল। 'ওখানে নামব আমরা।'

বেল রেঞ্জার ঘুরিয়ে নিল পাইলট, কাত করেছে হেলিকপ্টার। পরিষ্কার দেখা গেল মায়ান সাইট। এক চক্কর কাটল পিরামিডের উপর। 'লাইমস্টোন দেখা যাচ্ছে,' জানাল। 'গাছের মাঝ দিয়ে উঠে এসেছে ছাত।'

'ওখানে নামার জায়গা খুঁজুন,' বলল রানা।

বৃত্ত তৈরি করে ল্যাণ্ডিঙের উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে লাগল পাইলট। কয়েক মিনিট পর বলল, 'এদিকে ফাঁকা জায়গা নেই, চারপাশে শুধু ঘন জঙ্গল।'

আরও দূরে সরে যেতে লাগল সে। বেশ কিছুক্ষণ পর পেয়ে গেল ফাঁকা জায়গা। ওখানে বোধহয় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সব গাছ ও ঝোপ। 'যাক্, পাওয়া গেল,' বলল পাইলট।

'চারপাশে আগুন ধরেছিল,' বলল সোহানা। 'পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব।'

'বোধহয় গত বছরের বজ্রপাতে,' বলল জন। 'বৃষ্টির সময় এখানে এমন হয়। ওই সাইটে যেতে হলে বহু দূর হাঁটতে হবে আপনাদেরকে।'

'অন্য উপায় খুঁজছি,' বলল সোহানা। 'নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে রেসকিউ গিয়ার আছে?' বামপাশের দরজা দেখাল। ওখানে ইলেকট্রিকাল উইঞ্চ, কেবল ও হার্নেস।

'সবই আছে,' বলল পাইলট জন।

'কপ্টার চালানোর মাঝে উইঞ্চ অপারেট করতে পারবেন?'

'আরেক সেট কণ্ট্রোল ককপিটেই রেখেছি। এখান থেকেই আপনাদেরকে নামিয়ে দেয়া বা তুলে নেয়া সম্ভব। আপনাদের আপত্তি না থাকলে, অসুবিধা কই। বলে রাখি, নেমে যাওয়া বা উঠে আসার সময় ভীষণ ভয় লাগবে।'

'তাই?' হাসল সোহানা। 'চেষ্টা করতে দোষ কী?'

রানার প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য চাইল জন।

'নিজেরাই রিগে চাপব,' বলল রানা, 'আপনি শুধু নামিয়ে দেবেন পাথরের ওই চাতালে। ওটাই বোধহয় পিরামিডের মাথা।'

'আজ বাতাস নেই,' বলল পাইলট। 'আপনারা চাইলে নামিয়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'আগে নামতে চাও?' সোহানাকে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'এসো রিগ গুছিয়ে নিই।'

সিটবেল্ট খুলে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা।

হার্নেসে সোহানাকে আটকে দিল রানা। 'ঠিক আছে, জন, নামিয়ে দিতে শুরু করুন ওকে।'

অনেকটা নেমেছে হেলিকপ্টার, ভাসছে পিরামিড থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে। নীচে দেখা গেল গাছপালার মাঝ দিয়ে মাথা তুলেছে ধূসর লাইমস্টোনের দালান।

'রেডি?' জানতে চাইল পাইলট জন।

সাইড ডোর খুলল রানা। কিনারায় সরে বসল সোহানা, পা ঝুলছে নীচে। একবার হাত নেড়ে নেমে পড়ল নীচে। রোটরের বাতাসের ঝটকায় পাগলের মত নানাদিকে সরতে চাইল ওর চুল।

উপর থেকে দেখছে রানা। 'নামান। নামাতে থাকুন। এই গতি ধরে রাখুন। ঠিক আছে, স্থির রাখুন। হেলিকপ্টার সরাবেন না।'

ধূসর চাতালে পা ঠেকল সোহানার, চট্ করে নেমে পড়ল

হার্নেসের রেসকিউ গিয়ার-থেকে।

'হার্নেস খুলে দিয়ে সরে গেছে। কেবল তুলুন।'

খালি হার্নেস উঠে আসতেই সিটে বসে স্ট্র্যাপ আটকে নিল রানা, খোলা দরজার সামনে বসে পড়ল মেঝেতে। 'ঠিক আছে, জন, বিকেল পাঁচটার সময় এসে তুলে নেবেন।'

'ঠিক সময়ে দেখবেন বান্দা হাজির।'

পিছলে হেলিকপ্টার থেকে নামল রানা, নীচে দেখল উঠে আসছে পিরামিডের চূড়া। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের মাথা স্পর্শ করল ওর পা। জায়গাটা প্ল্যাটফর্মের মত। ঢিল হয়ে গেল কেবল। সিট থেকে নেমে উপরের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা।

সোজা উঠল হেলিকপ্টার, গুটিয়ে তুলছে উইঞ্চ। রওনা হয়ে গেল পশ্চিমের ওই পোড়া জায়গা লক্ষ্য করে।

পিরামিডের মাথায় রানা ও সোহানা ঘাঁটতে শুরু করেছে নিজেদের ব্যাকপ্যাক। সোহানা বলল, 'চারপাশ কেমন থমথমে, তাই না?'

'প্রেমিকাকে চুমু দেয়ার উপযুক্ত জায়গা,' বলেই সোহানার ঠোঁটে চুমু দিল রানা।

'যাও তো!' পিছিয়ে গেল সোহানা। 'পুরো সাইট ফোটোগ্রাফ করতে হবে, সেদিকে খেয়াল আছে! কয়েক ঘণ্টা পর সূর্য ডুববে, এর মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে আবারও আসতে হবে।'

'না হয় আসতাম,' মৃদু হাসল রানা।

'বাড়তি খরচ করতে হবে না,' শাসনের সুরে বলল সোহানা।

আপত্তি না তুলে ডেলি প্যাক থেকে পিস্তল নিয়ে শার্টের নীচে বেলি ব্যাণ্ডে গুঁজল রানা। সোহানাও। দু'জনের হাতে উঠে এল ডিজিটাল ক্যামেরা, দেরি হলো না ব্যস্ত হয়ে উঠতে।

কাজে ফাঁকি দিল না ওরা। পিরামিডের ছবি থেকে শুরু করে চারপাশের সবকিছুর ছবি নিল। কখনও ভিডিয়ো। বিশেষ করে

শহরের প্লাযার। জায়গাটা খাড়া টিলার মত কয়েক ধাপে উপরে উঠেছে। শেষে থেমেছে পিরামিডের মাথায়। নানা দেয়াল, মেঝে ও পিরামিডের ছাতের চমৎকার সব ছবি তুলল ওরা। স্টাক্কো দিয়ে প্লাস্টার করা সাদা দুটো ঘর আছে পিরামিডের উপর। মনেই হলো না তৈরির পর পেরিয়ে গেছে শত শত বছর। ভেঙে পড়েনি কোনও দেয়াল। ভয়ঙ্কর চেহারার সব দেবতার জন্য বাসন ও বাটি এনেছিল মায়ারা। সবই ঠিক আছে।

ডিজিটাল ছবি তুলতে তুলতে পিরামিড থেকে নামল ওরা, বাদ পড়ল না সিঁড়ির ছবিও। পাহাড়ের মত চারপাশের দালান ধরা পড়ল ক্যামেরার ছবিতে। বারবার রানা ও সোহানা নিজেদের ছবি তুলল। ফলে প্রমাণ হবে এই সাইটে এসেছিল ওরা।

মাটিতে নেমে আসবার পর চারপাশের সিকি মাইল এলাকা রেকি করল দু'জন। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কিছু দেখলেই ছবি তুলল। বিকেলে আবারও ফিরল পিরামিডের পায়ের কাছে। ওরা আছে দক্ষিণ দিকে। ব্যাগ থেকে পিভিসি পাইপ বের করল সোহানা, ওটার সঙ্গে রয়েছে তিন ভাষায় লেখা বাংলাদেশের সবুজ ও লালের পতাকা। নীচে লেখা বাংলা, ইংরেজি ও স্প্যানিশে তারিখ ও জিপিএস পজিশন। মানচিত্র অনুযায়ী প্রতিটি মায়ান ধ্বংসাবশেষের ম্যাপ তৈরি করেছে ওরা। পতাকায় রইল ওদের টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ও সোসাইটি অভ বাংলাদেশ আর্কিয়োলজির ঢাকার ঠিকানা। নীচে ছোট করে লেখা ওঅর্ল্ড আর্কিয়োলজিকাল কংগ্রেস ও সোসাইটি ফর হিস্টরিকাল আর্কিয়োলজির ঠিকানা। আরও উল্লেখ করা হয়েছে, গুয়াতেমালার সরকারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এই মায়াদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী।

দক্ষিণের সিঁড়ির সামনে খাটো পাইপ পুঁতে দিল রানা। সবুজের বুকে লাল সূর্যের পতাকার নীচে আরেকটা লাল ছোট

পতাকা রাখল ওরা।

'পুরনো অভিযাত্রীদের মত খুশি হয়ে উঠছি,' হাসল সোহানা। 'অন্যের জমিতে পতাকা পুঁতে বলছি: এটা আমার জমি। আমি কি ব্রিটিশ-আমেরিকান বা দস্যু ইয়োরোপিয়ান হয়ে উঠছি? ওদের ভঙ্গি ছিল, জোর যার মুল্লুক তার!'

'বড় কথা, আমরা রেজিস্ট্রি করছি সব আর্কিয়োলজিকাল সোসাইটিতে। ওদের কাছে সব প্রমাণ পৌঁছে দেবে সালমা আলী। শুধু সে-ই নয়, একই কাজ করবেন প্রফেসর আক্তার রশিদ। আর্কিয়োলজির বিষয়ে আগ্রহী সবাই জানবে আমরা বেশ কিছু মায়া শহর আবিষ্কার করেছি। সঙ্গে থাকছে ম্যাপ, ছবি ও কোঅর্ডিনেট্স্।'

নিজের তোলা ছবি সালমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে রানার ছবিগুলো পাঠাল সোহানা। কাজ শেষে চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি। 'পাঁচটার বেশি বাজে। আগেই আসার কথা না জনের?'

'হ্যাঁ, কল করছি,' বলল রানা। স্যাটালাইট ফোনে যোগাযোগ করতে চাইল। রিং হচ্ছে, কিন্তু মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কেউ রিসিভ করল না কল। 'জবাব দিচ্ছে না।'

'হয়তো উড়ে আসছে, তাই শুনতে পায়নি,' বলল সোহানা।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা।

শোনা গেল না হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

'কই, এল না তো সে,' বলল সোহানা।

আবারও ফোন করল রানা, সাড়া নেই পাইলটের। এবার ফোন করল লিযার্ড কোম্পানিতে।

কেউ কল ধরে বলল, 'বলুন?'

'মিস্টার সিম্পসন, আমি মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'গুয়াতেমালার পাহাড়ি এলাকায় আমাদের নিয়ে এসেছিল আপনাদের কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ও চিফ পাইলট জন এইচ. জুয়েল। তার আসার কথা বিকেল পাঁচটায়, কিন্তু সঠিক সময়ে

আসেনি। স্যাটালাইট ফোনে জবাব দিচ্ছে না। আপনি কি রেডিয়োতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন? হয়তো কোনও বিপদে পড়েছে।'

'যোগাযোগ করছি,' বলল সিম্পসন। 'দয়া করে একটু হোল্ড করুন।'

এক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর আরও কয়েক মিনিট। ওদিকে নিচু স্বরের কথা শুনছে রানা ও সোহানা। সিম্পসন বোধহয় রেডিয়োতে কথা বলছে, অথবা অফিসে কারও সঙ্গে। আরও কয়েক মিনিট পর বলল, 'রেডিয়োতেও সাড়া দিচ্ছে না। আমরা আরেকটা হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি। আপনাদের সঠিক পজিশন জানাতে পারবেন?'

'একটু অপেক্ষা করুন,' সোহানার হাতে ফোন দিয়ে ডে প্যাক ঘাঁটতে শুরু করল রানা। ওর কথা অনুযায়ী কোঅর্ডিনেট্‌স্ জানিয়ে দিল সোহানা। ওটা আবারও উচ্চারণ করল সিম্পসন।

'ঠিক আছে পজিশন,' জানাল সোহানা। রানার স্যাটালাইট ফোনের নম্বর দিল। 'এখান থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে অপেক্ষা করার কথা তার। ওখানে পুড়ে গেছে সব গাছ। ফাঁকা জায়গা।'

'আপনাদেরকে আকাশ থেকে দেখা যাবে?'

'যাবে। আমরা নেমেছি মায়ান পিরামিডের ওপর। রেসকিউ কেবলে করে নামিয়ে দিয়ে গেছে জন। ওভাবেই তুলে নেয়ার কথা।'

'আমি নিজেই আসছি তুলে নেয়ার জন্যে,' বলল সিম্পসন। 'কিন্তু আপাতত ওই ধরনের ইকুইপমেন্ট নেই আমাদের কোনও হেলিকপ্টারে। এমন কোনও জায়গা আছে, যেখানে নামতে পারি?'

'জন যেখানে হেলিকপ্টার রাখবে ঠিক করেছিল, ওখানে যেতে হবে সেক্ষেত্রে। এ ছাড়া উপায়ও নেই। এদিকে ঘন জঙ্গল, আশপাশে নামতে পারবে না হেলিকপ্টার।'

'তো রওনা হয়ে যান আপনারা ওদিকে, সতর্ক থাকবেন। ওই এলাকায় ক্রিমিনালের অভাব নেই। বুনো জায়গা। তাদেরকে ধরতে পারে না আর্মি বা পুলিশ। সঙ্গে করে আরও দু'জন আনছি, আমাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকবে।'

'সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ। কাউকে দেখলে আড়ালে থাকব। ল্যাণ্ডিং সাইটের দিকে যাচ্ছি।'

'আশা করি ওই একই সময়ে ওখানে পৌঁছব আমরাও। দেখা হবে।'

ফোন রেখে ডে প্যাক গুছিয়ে নিল ওরা, দেরি না করে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে রওনা হয়ে গেল পশ্চিমে। সোহানা বলল, 'আশা করি গাছের ডাল লেগে বিধ্বস্ত হয়নি জনের হেলিকপ্টার।'

'হওয়ার কথা নয়,' বলল রানা। 'পিরামিডের ওপর থেকে কোথাও ধোঁয়া দেখিনি। অবশ্য, সবসময় ক্র্যাশ করলে আগুন ধরবে, এমনও নয়।'

'কী হয়েছে কে জানে,' বিড়বিড় করল সোহানা।

হাঁটবার গতি বাড়ল ওদের। ছোট ছোট গাছ ও ঝোপ এড়িয়ে চলেছে। একটু পর পেয়ে গেল সরু এক পথ। চারপাশে ঘন গাছ, শেষ বিকেলের আলো হাজারো পাতার বুকে। ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে হাঁটছে ওরা। প্রতি দশ মিনিট পর পরীক্ষা করছে জিপিএস পজিশন।

একটু পর বিশ্রামের জন্য থামল ওরা। পাথুরে জায়গা, পাশেই নোংরা ডোবা। পিনপিন করে গান গাইছে অসংখ্য মশা। গন্তব্যের মাঝামাঝি পাড়ি দিয়েছে ওরা। আবারও রওনা হয়ে ঠিক করল, প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর থামবে, দেখে নেবে পজিশন।

সামনে রানা, পিছনে সোহানা— এখনও সূর্যের হলদে আলো দেখে সঠিক পথে হেঁটে চলেছে। অবশ্য পনেরো মিনিট পর আরও সতর্ক হয়ে উঠল। কোনও আওয়াজ করছে না বললেই চলে।

ওদের মনে হয়নি দেরিতে হাজির হওয়ার লোক পাইলট জন এইচ. জুয়েল। হেলিকপ্টারের ফিউয়েল বা প্যাসেঞ্জারদের ওজন বিষয়ে ভাল জ্ঞান ছিল তার। সঙ্গে ছিল স্যাটালাইট ফোন, হেলিকপ্টারের রেডিয়োও ব্যবহার করতে পারত। অথচ, কোথাও যোগাযোগ করেনি। মনে করবার কোনও কারণও নেই, ল্যাণ্ডিং স্পটে নামতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে। খুশি মনে বলেছিল, আরাম করে ঘুমাবে, তারপর পাঁচটার সময় হাজির হবে ওদেরকে তুলে নিতে।

কু ডাকছে রানা আর সোহানার মন।

খুন হয়ে যায়নি তো পাইলট?

নীরব যাত্রার এক পর্যায়ে ওরা বুঝল, পৌঁছে গেছে ওই জায়গার খুব কাছে। এখানেই ল্যাণ্ড করবার কথা হেলিকপ্টার। আকাশে উড়োজাহাজের ইঞ্জিনের আওয়াজ নেই। অর্থাৎ, মিস্টার সিম্পসন এখনও দ্বিতীয় হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছায়নি। পাখির কিচির-মিচির বাদ দিলে থমথম করছে চারপাশ।

কখনও কখনও কানে কানে কথা বলছে রানা ও সোহানা। সামনে বিপদ থাকলে কী করবে ঠিক করে নিয়েছে। একবার থেমে মিটিয়ে নিল তৃষ্ণা, তারপর আবারও হাঁটতে লাগল চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর জঙ্গলের মাঝে পড়ল ওই জায়গা। সমতল জমিতে নেমেছে জনের জেট রেঞ্জার। আশপাশে কোনও গাছের ডাল নেই যে রোটরে লাগবে। হেলিকপ্টারের গায়ে কোনও বুলেটেরও দাগ নেই। কোথাও নেই জন এইচ. জুয়েল।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে না গিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নীরবে হাঁটছে রানা ও সোহানা। চোখ রেখেছে চারপাশে। এক শ' গজ যাওয়ার পর হঠাৎ থেমে গেল। কানে এসেছে আওয়াজ। প্রথমে মনে হলো হেলিকপ্টারের রেডিয়োতে কথা বলছে কেউ। কিন্তু তা নয়, স্প্যানিশ ভাষা, পুরুষ কণ্ঠ। আওয়াজটা আসছে ওদের পিছনের জঙ্গল থেকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কান প্রাতল ওরা।

বোধহয় হেলিকপ্টার থেকে দূরে এদিকের জঙ্গলের কিনারায় বসেছে একদল লোক। ঝোপঝাড় তছনছ করছে।

হাতের ইশারা করল সোহানা, ডান থেকে ওপাশে যাবে ও, আর বাম থেকে হাজির হবে রানা। ওই দলের দু'দিকে গিয়ে থামবে ওরা। দূরে সরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রওনা হলো দু'জন। খুব সতর্ক, তবে ওদের পায়ের নীচে ডাল ভাঙলেও সেই আওয়াজ চাপা পড়বে লোকগুলোর জোর তর্কের নীচে।

আওয়াজ লক্ষ্য করে নব্বুই ডিগ্রি বাঁকা পথে চলেছে রানা। এরই ভিতর বুঝেছে, এতক্ষণে চিতা বাঘিনীর মত সঠিক পজিশনে পৌঁছে গেছে সোহানা। অপেক্ষা করছে পিস্তল হাতে। শার্টের নীচের ব্যাণ্ড থেকে পিস্তল নিল রানা। ক্রল করছে জঙ্গলে। অনেক কাছে চলে এসেছে লোকগুলোর কথার আওয়াজ।

ছয়জন হবে। বোধহয় আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসেছে।

না, আগুন নেই, নইলে পাতা পুড়বার গন্ধ পেত রানা।

লোকগুলো এখানে বসে কী করছে?

কয়েক সেকেণ্ড পর তাদেরকে দেখল রানা।

পাঁচজন। বয়স বিশ থেকে পঁচিশ। গালে দাড়ি। পরনে জিন্স প্যান্ট, খাকি শার্ট, ছেঁড়া পুরনো মিলিটারি ইউনিফর্ম ও টি-শার্ট। ওদের বৃত্তের মাঝে জলপাই রঙের প্লাস্টিকের তারপুলিন। ওখানে জন এইচ. জুয়েলের জিনিসপত্র— স্যাটালাইট ফোন, তিন সেট ইয়ারফোন, হেলিকপ্টারের ম্যাপ, ক্যানাডিয়ানের ওয়ালেট, চাবি, পকেট নাইফ ও সানগ্লাস।

সবার পাশে বেলজিয়ান এফএন ফ্যাল ৭.৬২ এমএম মিলিটারি রাইফেল। কয়েক মুহূর্ত পর পাইলটকে দেখল রানা। সে আছে কয়েক ফুট দূরে। ঘন ঝোপের পাশে। দুই হাত বেঁধে রাখা হয়েছে পিঠে। দুই গোড়ালি বাঁধা। গলায় ফাঁস। পুরু এক গাছের উপরের

ডাল থেকে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে দড়ি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, বসতে পারবে না, নইলে শ্বাস আটকে মরবে ফাঁসের কারণে। কালো হয়ে ফুলে উঠেছে বাম চোখ। বাম গালও ফোলা। পোশাকে লেগে আছে ঘাসের টুকরো। মাথার চুল চট্-চট্ করছে রক্তে, অবশ্য সরু রেখা শুকিয়ে গেছে কপালে।

আরও কাছে সরে গেল রানা, ঘন ঝোপ ও পাইলট জনের আড়াল নিয়ে পৌঁছল পিছনে। ছোরা দিয়ে কেটে দিল কবজির বাঁধন, তারপর গোড়ালির দড়ি। দ্বিতীয় পিস্তলটা নিয়ে সেফটি ক্যাচ অফ করে ওটা ধরিয়ে দিল জনের ডানহাতে। ক্রল করে সরে যাওয়ার আগে কেটে দিল ফাঁসের উপরের দড়ি। খুব কাছে কেউ না এলে বুঝবে না পাইলটের ফাঁসের উপরের অংশের দড়ি কাটা।

ক্রল করে পিছিয়ে গেল রানা, ঢুকে পড়ল ঘন ঝোপের ভিতর। খুঁজে বের করে পৌঁছে গেল পছন্দ মত স্পটে। এবার ক্রস ফায়ারে পড়লে রক্ষা নেই লোকগুলোর। তারপুলিনের পাশে বসে কখনও কখনও পাইলটকে দেখছে তারা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বন্দি, হাত পিছনে বাঁধা। গলায় ফাঁস।

ওই বদমাশদের বৃত্ত থেকে রানা সরে গেছে বেশ দূরে। সোহানা, পাইলট এবং ও নিজে এখন তিনদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাদেরকে। ওরা একেকজন এক শ' বিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে আছে। এবার একটা গাছের আড়াল থেকে স্প্যানিশে হাঁক ছাড়ল রানা, 'অ্যাই! অস্ত্র ফেলো! সরে এসো! অস্ত্রের দিকে হাত গেলে লাশ ফেলে দেব!'

হঠাৎ ওই কঠিন কণ্ঠ শুনে চমকে গেল তারা, ঝট্ করে ঘুরে চাইল আওয়াজ লক্ষ্য করে। একজন হাতে তুলে নিতে চাইল রাইফেল, কিন্তু বুকে গুলি করে তাকে ফেলে দিল রানা।

'অস্ত্র ফ্যালো!' গর্জে উঠল পাইলট জন এইচ. জুয়েল।

ঘুরে তারা দেখল ছাড়া পেয়ে গেছে পাইলট, হাতে উদ্যত

পিস্তল। অন্যরা রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল না, কিন্তু একজন রাইফেল তুলেই নিশানা করতে চাইল পাইলটের বুকে। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, লোকটা উধাও হয়েছে গাছের ওপাশে। গুলি করবার আগে নিজেই গুলি খেল লোকটা কবজির উপর। ধুপ করে মাটিতে পড়ল তার রাইফেল। আরেক দিক থেকে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করেছে সোহানা।

রাইফেলের কাছ থেকে দূরে সরে বসল অন্যরা। হাত তুলেছে মাথার উপর। নিজের গাছের আড়াল থেকে বেরোল রানা, ভাল করেই জানে, ওকে কাভার দিচ্ছে সোহানা ও জন। ডানহাতে অস্ত্র তাক করে রাখল রানা, একে একে সংগ্রহ করল রাইফেলগুলো, একটু দূরে তৈরি করল স্তূপ।

চারপাশ নিরাপদ বুঝে নিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরোল পাইলট, হাতে রানার দ্বিতীয় পিস্তল।

'ব্যথা খুব বেশি?' জানতে চাইল রানা।

'খুব কমও নয়।'

'কারা এরা?'

'কাদের হয়ে যেন কাজ করে, কিন্তু নাম বলেনি কোনও। হেলিকপ্টার দেখে হাজির হয়েছিল। ওদের মনে হয়েছে জিনিসটা দামি, কাজেই ওদের একটা ওই জিনিস চাই।'

'হেলিকপ্টার ঠিক আছে?'

'আছে। ভেবেছিলাম ছায়ায় শুয়ে ঘুম দেব। ঘুম যখন ভাঙল, মারামারির সুযোগ ছিল না।'

দূর থেকে এল হেলিকপ্টারের আওয়াজ। ক্রমেই বাড়ছে। মাত্র এক মিনিটে চারপাশের গাছের পাতা ওলটপালট করে হাজির হলো ওটা, ভাসছে বৃত্তাকার জায়গার আকাশে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, হাতে এম১৬ রাইফেল।

'জন, নিজেকে দেখান,' বলল রানা।

হেলিকপ্টারের পাশে চলে গেল পাইলট, মাথার উপর নাড়ছে দুই হাত। বন্দিদের উপর অস্ত্র তাক করে রাখল রানা ও সোহানা। জনের রেডিয়ো চালু হলো। সিম্পসনের কণ্ঠ শোনা গেল, 'দেখতে পেয়েছি, জন। তুমি ঠিক আছ তো?'

মাইক্রোফোনে জবাব দিল পাইলট। 'ঠিক আছি। আমার সঙ্গেই আছেন মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরী। আমাদের সঙ্গে পাঁচজন বন্দি। তাদের দু'জন আহত।'

'অপেক্ষা করো। আমরা নেমে আসছি।'

পরের মিনিটে ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার। এম১৬ রাইফেল হাতে কেবিন থেকে নেমে এল তিনজন লোক। মাঝের বয়স্ক লোকটা বেশ মোটা, ধীরেসুস্থে হেঁটে এল সে।

জন এইচ. জুয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা ও সোহানা, মাত্র কয়েক মিনিটে হেলিকপ্টারে পাঁচ বন্দিকে তুলে ফেলল সিম্পসন ও তার লোক।

'জন, এবার বোধহয় কয়েকদিন ছুটি নিতে চান?' পাইলটকে বলল সোহানা।

মাথা নাড়ল ক্যানাডিয়ান। চোখে সানগ্লাস পরে নিয়ে পাইলটের সিটে উঠে পড়বার আগে বলল, 'বিশ্রাম নিয়ে কী হবে? যে যার কাজ না করলে চলে? উঠে পড়ুন! কালকে নতুন সাইটে নামিয়ে দেব।'

পঁচিশ

আলটা ভেরাপায।

তিনি সপ্তাহ পর।

গহীন অরণ্যের মাঝে আগুনে গাছ পুড়িয়ে ফাঁকা করে দেয়া জায়গায় নেমেছে দুটো হেলিকপ্টার।

এইমাত্র সামনের যান্ত্রিক ফড়িং থেকে নেমেছে এলেনা হিউবার্ট। দেখে নিল চারপাশ। একটু দূরে ঝোপঝাড়, কে বলবে আজ থেকে এক হাজার বছর আগে ওখানে ছিল মায়াদের সরু সব পথ। অবশ্য এ বিষয়ে ওর সঙ্গে তর্ক করবে না অতিথিরা। ম্যাচেটি হাতে ঝোপঝাড় কেটে সামনে বাড়ল এলেনা। একবার পিছন ফিরে দেখে নিল।

ওর পিছু নিয়েছে পনেরোজন সাংবাদিক। প্রত্যেকের হাতে জটিল সব ক্যামেরা, ইকুইপমেন্ট, রেকর্ডার ও স্যাটালাইট ফোন। বোঝা কঠিন, কেন বাঁদরের মত কিচমিচ করছে সবাই। যেন কারও খেয়াল নেই দুর্গম এ এলাকায় তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণে ডেকে আনা হয়েছে।

আগেই পরিষ্কার করা পথে পৌঁছে থামল এলেনা। গলা উঁচিয়ে বলল, 'মনোযোগ দিন! খেয়াল করুন, এটা মায়াদের বহু পুরনো গলি। এটা বাঁধাই করা।' পেভমেন্টের ছবি তুলবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সরে গেল এলেনা। মাত্র কয়েকজন ছবি নিল। সামনে গেছে সাদাটে কোবল পাথরের পথ। বেশিরভাগ সাংবাদিক ছবি নিল এলেনার। সে জঙ্গলের মাঝে ম্যাচেটি হাতে এগিয়ে চলেছে বীর দর্পে।

ওর ছবি তুলছে বলে খুশিই হয়েছে এলেনা। আরেকবার পিছনে দেখে নিল। ওর আর্মড় লোকগুলো পাহারা দিচ্ছে সবাইকে। হাতে বেলজিয়ান রাইফেল। এদেরকে কাজে নেয়ায় বহু টাকা খরচ হয়ে গেছে ওর। আর্ট ডগসন পাঁচ লোককে পাঠিয়েছিল হেলিপ্যাড পরিষ্কার করতে, কিন্তু উধাও হয়েছে তারা। ঠেকে শিখেছে এলেনা, যথেষ্ট লোক এনেছে, চাইলেও কেউ এসে ঝামেলা করতে পারবে না। আগেই ওকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে,

মায়াদের ওই ধ্বংসস্তূপ মাত্র কয়েক মাইল দূরেই। নতুন উদ্যমে লতা-পাতা ছাঁটতে ছাঁটতে চলেছে এখন।

একঘণ্টা পর পৌঁছে গেল মস্ত প্লাযার এক পাশে। 'ওই দেখুন আমার আবিষ্কার করা সেই হারিয়ে যাওয়া শহর!' গলা উঁচু করল এলেনা। খুশি চেপে প্লাযার মাঝে চলে এল। দু'পাশে মস্ত সব পিরামিড। সবচেয়ে দূরেরটা সবচেয়ে বড়। ওই দালান সম্পর্কে কিছুই জানে না সাংবাদিকরা। কিন্তু এলেনা আগেই দেখে নিয়েছে মন্দিরের উপরে আছে সাদা রং করা ঘর। ওখানে রয়েছে অনেক দেবতার চিত্র। এ ছাড়া, ঘরে আঁকা রয়েছে শহরের নানা দৃশ্য। একসময় এ শহর ছিল ব্যস্ত জনপদ। নরম্যানরা ইংল্যাণ্ডে হামলা করবার অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে এ শহর।

লুকানো জায়গায় রয়ে গেছে দুর্মূল্য সব আর্টিফ্যাক্ট। এত বড় শহরে নিশ্চয়ই থাকবে রাজকীয় সব সমাধি। দেখবার মত হবে ওগুলো। ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে এলেনা, এখানে আছে এক্সকেভেশনের দারুণ সুযোগ। এবার ওকে প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখবে সাংবাদিকরা। কিছু ছবি এবং ফুটেজ দেখানো হবে ইউরোপ ও আমেরিকার টিভি চ্যানেলে। নাম ফেটে পড়বে ওর। নানা কারণে ধরে নেয়া হয়েছেঃ মস্ত বড়লোকের বখে যাওয়া মেয়ে সে, কিন্তু এবার সবাই জানবে, এই মেয়ে নতুন সব মায়ান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করছে। সবাই মানতে বাধ্য হবে, আসলে সে-ই দুনিয়া-সেরা আর্কিয়োলজিস্ট। কেউ জানবে না এসব আবিষ্কার এসেছে ওই মায়ান কোডেক্সের কল্যাণে। আর কে জানে, কয়েক বছর পর হয়তো মায়ান কোডেক্সও আবিষ্কার করবে সে!

নিখুঁত টেইলর্ড এক্সপ্লোরার আউটফিট পরেছে এলেনা। এপিউলেটসহ ট্যান শার্ট, কনুইয়ের কাছে গুটিয়ে রেখেছে হাতা। একই কাপড়ের প্যান্ট। চকচক করছে বুট। গটগট করে হাঁটছে অ্যাকশন সিনেমার নায়িকাদের মত, সবার আগে চলেছে প্রকাণ্ড

পিরামিডের দিকে। ভঙ্গি এমন, বিজয় করে নিয়েছে চারপাশের সব। কিন্তু ঠিক তখনই পিছনে হৈ-চৈ করে উঠল কারা যেন। কী যেন বলছে। থমকে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর দিয়ে চাইল এলেনা।

মস্ত প্লাযার তিরিশ গজ পেরিয়ে হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সাংবাদিকরা। শহরের সবচেয়ে বড় পিরামিড এবং অন্যান্য দালান দেখেই বোধহয় বিস্মিত। ঝোপঝাড় ও গাছে ঢাকা পড়েছে বেশিরভাগ দালান। অবশ্য বোঝা যায়, ওসবের নীচে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন।

কিন্তু কোথায় যেন গোলমাল বেধে গেছে।

সাংবাদিকরা পিছু নিয়ে আসছে না কেন?

কে কার আগে হ্যাণ্ডশেক শেষে কংগ্র্যাচুলেশন্স বলবে, সেজন্য সবারই তো ছুটে আসা উচিত!

এ শহর সম্পর্কে একগাদা জিজ্ঞাসা কোথায়?

জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা। ফোন করছে যার যার সম্পাদকের কাছে, বা ওদিকের কথা শুনছে। কেউ কেউ আলাপ করছে মুখোমুখি হয়ে। যার যার দেশের ভাষায় ঝড়ের গতিতে কথা চলছে। মনে হচ্ছে অদ্ভুত কোনও খবর পেয়েছে।

বসে নেই তাদের ফোটোগ্রাফাররা। কিন্তু তারাও মস্ত সব পিরামিড বা দালানের ছবি তুলছে না— ভিডিয়ো করছে বিস্মিত সাংবাদিকদের।

বেশ কিছু সাংবাদিক গলা চড়িয়ে আপত্তির সুরে কথা বলছে।

তাদেরই একজনের প্রতি খেয়াল দিল এলেনা। ওই লোকের নাম জিম কারমাইকেল, কাজ করে লণ্ডনের দ্য টাইমস দৈনিক পত্রিকায়। ইটনে ওর বড় ভাই টনির সঙ্গে পড়ত ওই লোক। টনি তাকে ডাউনিং স্ট্রিটের দশ নম্বর বাড়িতে ঢুকবার সুযোগ করে দেবে, তাই এলেনার সঙ্গে এসেছে সে।

এলেনার বড় আশা, জিম কারমাইকেল ইংল্যাণ্ডে ওর জন্য

সম্মানের স্থান তৈরি করে দেবে। সে-ই এখন সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ইংরেজ ভাষাভাষী বলেই তার ঠোঁটের নড়াচড়া আঁচ করতে পারল এলেনা। ওর মনে হলো লোকটা বলছে, 'এ তো উন্মাদের কাণ্ড! এ কী করে হয়! পাগল নাকি! মেয়েটার মাথা নষ্ট হয়ে যায়নি তো!'

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলেনা। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে, কোথাকার কোন্ আমেরিকান নায়িকা এমনই অদ্ভুত কাজ করেছে, যে ওর কথা ভুলেই গেছে সাংবাদিকগুলো!

ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে রওনা হয়ে গেল এলেনা।

প্যারিস সান পত্রিকার শাসা এবেলহার্ড এসেছে, কারণ ইউরোপে একের পর এক পার্টিতে গরম খবর তৈরি করে এলেনা।

ওর দিকে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে এল মেয়েটি, হাতে ছোট ভিডিয়ো ক্যামেরা। 'এলেনা! এলেনা, এক মিনিট!'

মৃদু হাসল এলেনা। ভাল হয়ে গেল মনটা। ভাবতে দারুণ লাগল, সত্যিকারের সেলেব্রিটি হয়ে উঠছে। এমনিতেই বড়লোক তরুণী হিসাবে সবাই চেনে ওকে; এমন এক মেয়ে, মধ্য আমেরিকায় বিপুল সম্পত্তি আছে যার; দক্ষিণ ফ্রান্সে বা মেডিটারেনিয়ানের দ্বীপগুলোতে দুই হাতে টাকা ওড়ায়— কিন্তু এবার ওকে শুধু আকর্ষণীয় তরুণী ভাববে না কেউ; অন্তর থেকে বলবেও আসলে অপরূপা সুন্দরী এক জ্ঞানী মহিলা। আবারও স্মিত হেসে ফেলল এলেনা, মিষ্টি করে বলল, 'হ্যাঁ, বলো, শাসা?'

'ওরা সবাই বলছে তুমি জঘন্য এক প্রতারক। আগেই এই সাইট আর্কিয়োলজিকাল অর্গানাইযেশনগুলোয় রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। তুমি এটা আবিষ্কার করোনি, ওটা করেছে অন্য কেউ।'

রাগে লালচে হয়ে গেল এলেনার মুখ। খেয়াল করল, কথাগুলো বলবার সময় এবং এখনও লাল বাতি জ্বলছে ভিডিয়ো ক্যামেরায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বিস্মিত হাসল এলেনা। 'অবাক

কাণ্ড তো, কেন এমন-কাজ করব আমি?'

'এটা দেখো,' বলল জার্মান কলামিস্ট বার্নড্ ব্যাচমেয়ার। হাতে আইপ্যাড, স্ক্রিনে দেখা গেল মস্ত প্লাযার প্রকাণ্ড পিরামিড। 'এ ছবি দিয়েছে সোসাইটি ফর আমেরিকান আর্কিয়োলজি। পুরো সাইট ফোটোগ্রাফ শেষে চার্টার করা হয়েছে।'

ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকের আমেরিকান লোক গ্রেগ ম্যাককেবে বলল, 'এ কাণ্ড ঘটালে কীভাবে? তুমি কি এই ফিল্ডের নামকরা সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখো না?'

'নিশ্চয়ই রাখি,' গত বেশ কিছু দিন বড় ব্যস্ত ছিল, কোনও সংগঠনের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতে পারেনি এলেনা।

'মনে হচ্ছে এসব সংগঠনের সঙ্গে তুমি নেই। এই সাইটের কথা তুলে দেয়া হয়েছে প্রতিটি লিস্টে।'

'আপনারা এসব কী বলছেন?' বলল আহত এলেনা, 'নিশ্চয়ই কৌতুক করছেন? এই সাইট ঘুরে দেখার জন্যে অল্প কয়েকজন সাংবাদিককে আমন্ত্রণ দিয়েছি, যাতে তারা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা পেতে পারে। আর আপনারা বলতে চাইছেন আমি প্রতারক?' দু'হাত তুলে চারপাশের দালান দেখাল সে। 'আপনাদের কি ধারণা বোকা বানানোর জন্যে এসব দালান আমিই তৈরি করেছি? এসব দালান মাস্টার পিস; শেষবার যারা পা ফেলেছে এখানে, তারা মারা গেছে এক হাজার বছর আগে।'

'মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এখান থেকে ঘুরে গেছে কেউ,' বলল জিম কারমাইকেল। 'এটার কথা তুলে নেয়া হয়েছে আবিষ্কারের ব্রিটিশ ক্যাটালগে।' স্যাটালাইট ফোন বাগিয়ে ইমেজ দেখাল সে। 'বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে তারা। ম্যাপের কোঅর্ডিনেট্স্ ঠিক। সবুজ-লাল পতাকা পুঁতে গেছে সিঁড়ির সামনে।'

'তিন সপ্তাহ আগে কারা এসেছিল?' জানতে চাইল অপমানিত এলেনা।

'তাদের নাম মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরী।'

‘ওরা!’ খেপে গেল এলেনা, ‘ওরা ক্রিমিনাল! ওদের কোনও অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নেই! ওই দুটো সত্যিকারের ট্রেজার হান্টার! ওরা আমাকে ফাঁকি দিয়েছে!’

‘এই সাইটের কথা লিস্টে তুলে দেয়া হয়েছে, শুধু তাই নয়, ওই দু’জন কাজ করেছে ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়ার আর্কিয়োলজিকাল প্রজেক্টের হয়ে,’ বলল নিউ ইয়র্ক টাইমসের করেসপণ্ডেন্ট জে. ডি. কার্লটন। ‘মেয়ে, তুমি বললে তো চলবে না, ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়ার নাম আছে অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের জন্যে। উপযুক্ত মানুষ ছাড়া কাউকে কাজে নেয় না ওরা।’

‘ওই দু’জন সম্পর্কে আর একটা কথাও বলার নেই আমার,’ বলল এলেনা। ‘একঘণ্টা পর এখান থেকে রওনা হব আমরা। দয়া করে যে যার মত গিয়ে হেলিকপ্টারে উঠবেন। রাত নেমে গেলে হেলিকপ্টার আকাশে তুলবে না পাইলট।’

ঘুরে রওনা হয়ে গেল এলেনা, ফিরছে জঙ্গুলে পথে হেলিপ্যাডের দিকে। চকচকে স্বর্ণালী চুল নিয়ে মাথা উঁচু করে নীরবে হাঁটছে, যদিও বুকের পাঁজর টনটন করছে ভয়ানক কষ্টে।

বাছাই করা সব সেরা সাংবাদিক পিছু নিল ওর। ছুটতে ছুটতে এলেনার সামনে চলে গেল ফোটোগ্রাফাররা, ক্লিক-ক্লিক আওয়াজে পটাপট ছবি তুলছে। অশ্রু বা ক্রোধ যদি থাকে মেয়েটার চোখে-মুখে, দারুণ বিক্রি হবে পত্রিকা!

ছাব্বিশ

পরদিন বিকেলে বেডরুমে বসে আছে এলেনা হিউবার্ট, চেয়ে আছে

কোলে রাখা ল্যাপটপ কমপিউটারের স্ক্রিনে। ওর উপর ভিডিয়ো প্রচারিত হচ্ছে ইউ টিউবে। দারুণ সুন্দরী ও গর্বিতা দেখাচ্ছে ওকে, ম্যাচেটি হাতে গাছপালা ও ঝোপঝাড় কেটে চলেছে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে, তারপর পা রাখল প্রাচীন শহরের প্রকাণ্ড প্লাযায়। তারপরই পাল্টে গেল দৃশ্য, শুরু হলো এলেনাকে ঘিরে সাংবাদিকদের কঠোর অভিযোগ। কয়েক ভাষায় বলছেঃ এলেনা আসলে দুনিয়া-সেরা প্রতারক। সব ভাষা বুঝতে হবে না দর্শক-শ্রোতাদের, শুধু ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলেছে কয়েকজনঃ

'তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদিনী, এলেনা হিউবার্ট, আগেই এই সাইট আবিষ্কার করেছে অন্য কেউ।'

'এ শহর আগেই সব আর্কিয়োলজিকাল লিস্টে তুলে দেয়া হয়েছে।'

'আগেই রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এই শহর।'

'কাদের বোকা বানাতে চাইছ, এলেনা হিউবার্ট?'

কথাগুলো বারবার বাজছে কানে। সাংবাদিকদের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে জঙ্গুলে পথে হনহন করে হাঁটছে এলেনা। পিছু নিয়েছে হৃদয়হীন মানুষগুলো। নিষ্ঠুর টিটকারি দেয়া হচ্ছে, ছবি তোলা হচ্ছে, গা জ্বালিয়ে দেয়া হাসি হাসছে কেউ কেউ।

কমপিউটারের দিকে চেয়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত নিজের ছবি দেখে কাঁদতে ইচ্ছা হলো এলেনার। ফুরিয়ে গেল ভিডিয়ো, সেখানে দেখা দিল লেখাঃ 'সুন্দরী ব্রিটিশ যুবতী ধরা পড়েছে গুরুতর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতারণা করতে গিয়ে।' এখন পর্যন্ত দর্শক দেখেছেন ৭,২৯,৯৮১ জন। হতবাক হয়ে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল এলেনা। বদলে গেল দর্শক সংখ্যা। এখন দেখাচ্ছেঃ ৮,১১,৯১৮ জন। স্ক্রিনের কোনার এক্স বাটন টিপে দৃশ্যটা মনিটর থেকে দূর করে দিল এলেনা। উঠে দাঁড়িয়ে সরে এল ল্যাপটপ কমপিউটার থেকে।

টেবিলের পাশে থেমে তুলে নিল ফোনের রিসিভার, ডায়াল করল নির্দিষ্ট নম্বরে। ভীষণ নার্ভাস। আগেও দু'একবার ফোন করেছে ওই নম্বরে।

'হ্যালো?' ওদিক থেকে ধরল তরুণী এক মেয়ে।

এই মেয়ে অন্য মেয়েদের একজন, ভাবল এলেনা।

মাঝে মাঝে পার্টি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে এদেরকে নিয়ে হাজির হয় অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো, তারপর আর কখনও তাদেরকে দেখা যায় না তার পাশে।

'হ্যালো,' মিষ্টি করে হাসল এলেনা, স্প্যানিশে বলছে। 'আমি এলেনা হিউবার্ট। সেনর অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো কি আছেন?'

'দেখছি,' পাত্তা না দেয়া সুরে বলল মেয়েটি। কোনও টেবিলে খটাস্ করে নামিয়ে রাখা হলো রিসিভার।

এলেনার ধারণা: ওই মেয়ে মেক্সিকো বা দক্ষিণের দেশগুলোর কোনও বিউটি কনটেস্ট বিজয়িনী অথবা সিনেমা নায়িকা। ওর ভাবতে অবাক লাগে, এদের মত মেয়েরা টাকা ও সুনামের লোভে এসে ভিড় করে গুয়াতেমালা সিটিতে, তারপর একদিন হারিয়ে যায় নোংরা কোনও গলির বেশ্যা-বাড়িতে। তবুও আসতে থাকে এদের মত নতুন মেয়েরা।

'সেনোরিটা এলেনা,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো।

এলেনার মনে হলো ওই কণ্ঠ যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ।

'গুড আফটারনুন, অ্যালবার্ট। ভাবছিলাম আগামীকাল একটু আলাপ করা যাবে কি না।'

'আসতে চান আমার বাড়িতে?'

'ভাল হয় আপনি আমার বাড়িতে এলে, খুবই খুশি হব। আপাতত বাইরে যেতে চাই না, বাজে পাবলিসিটির মুখে পড়ে গেছি। বাইরে গেলেই হামলে পড়বে সাংবাদিকরা। বাধ্য হয়ে ঘরে

বসে থাকতে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি।'

'আপনার দাওয়াত থাকল দুপুর বারোটায়।'

পরদিন সাড়ে এগারোটায় সব তৈরি রাখল এলেনা হিউবার্ট। বাগানে যে টেবিল, ওটা দুর্লভ অ্যান্টিক। ব্যবহার করা হয়েছিল লর্ড ক্লাইভকে নিমন্ত্রণের সময়। টেবিলে ধবধবে সাদা চাদর। তার উপর ঝকঝক করছে ক্রিস্টালের গ্লাস, ওয়েজউড অফ হোয়াইট বাসন, বুকে ল্যাভেণ্ডার পাতার ছবি, কিনারা সোনা দিয়ে বাঁধানো। ঝিকমিক করছে রুপার সব চামচ। সবই আঠারো শতাব্দীতে মুম্বাইয়ের এক ওয়্যার হাউসে পেয়েছিল ওর পরিবার। কিশোরী বয়সে এসবের প্রতি ভীষণ ঝোঁক এসেছিল এলেনার। ভারতে আসা জাহাজের পুরনো চায়না পটারি সংগ্রহ করত ওর এক পূর্বপুরুষ, তার কাছ থেকেই পেয়েছে শখটা। ওই লোক বাড়িতে সংগ্রহ করত পুরনো চিত্রকর্ম, বই ইত্যাদি। আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় বহু কিছুই কম দামে কিনে নিয়েছিল ওর পরিবার। সব পড়ে ছিল ওদের কোম্পানির ওয়্যার হাউসে। পরে সবই কাজে এসেছে মস্ত সব বাড়ি পাল্টে হোটেল শুরু করবার পর।

টেবিল থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে সুগন্ধী ফুলের কারুকার্যময় বেড। গোপন আলাপের জন্য উপযুক্ত জায়গা মিগুয়েরোদের স্প্যানিশ ধাঁচের বাড়ির প্রকাণ্ড বাগান। চারপাশে গাছের ছায়া, কোনও দিক দিয়েই চোখ রাখতে পারবে না কেউ। এখানে কাজ করবে না রিমোট সেন্সিং ডিভাইস বা টেলিফোটো লেন্স।

শীতল চোখে চারপাশ দেখে নিল এলেনা। সঠিক জায়গায় আছে টেবিল, ঠিক জায়গায় রাখা হবে খাবার। কোথাও কোনও খুঁত নেই। অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়োর মত লোক খুঁতখুঁতে চোখে এসব দেখে, বুঝে নিতে চায় তাকে যথেষ্ট সম্মান দেয়া হচ্ছে কি

না।

ঠিক বারোটা বাজতেই খুলে গেল বাগানের দিকের ফ্রেঞ্চ ডোর। প্রায় কুঁজো হয়ে অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়োকে বাগানের পথ দেখাল হেক্টর। ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে এলেনা। ড্রাগ লর্ডের বয়স পঞ্চান্ন, কিন্তু ফিট রেখেছে নিজেকে। মাথায় কালো ব্যাণ্ডের পানামা হ্যাট, পরনে হলদেটে শার্ট, নীল টাই ও বেইজ লিনেন সুট। আকর্ষণীয় ইটালিয়ান পুরুষের মতই দারুণ সুন্দর লাগছে তাকে, ভাবল এলেনা। দু'পাশে দুই বডিগার্ড।

অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়োর হাঁটবার সহজ ভঙ্গির প্রশংসা না করে পারল না এলেনা। যেন মনেই নেই দুই বডিগার্ডের কথা। পৌঁছে যেতেই তার এক বডিগার্ড আগে ঢুকেছে এ বাড়িতে। চারপাশ দেখে নিয়ে বসের জন্য খুলে দিয়েছে দরজা। আর অ্যামব্রোসিয়ো ঘরে ঢুকবার পর পিছনে রয়ে গেছে দ্বিতীয় গার্ড। প্রথমজন থেমেছে স্ট্র্যাটেজিক কোনও স্পটে, জানালা বা স্টেয়ারকেসের আড়ালে। যেন কোনও দিকে খেয়াল নেই ড্রাগ লর্ডের, জানেই না তাকে দেখছে ঠাণ্ডা চোখের দুই খুনি।

টেবিলের কাছে পৌঁছে এলেনার দুই হাত দু'হাতে তুলে নিল অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো, চট্ করে চুমু দিল গালে। 'ভাল লাগছে, এত অপরূপা এবং অভিজাত ভদ্রমহিলা আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন; সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। আর আজ চারপাশ আলোকিত বুঝি আপনার রূপেই।'

মুখে স্বীকার করবে না এলেনা, কিন্তু সত্যিই খুব খুশি হলো প্রশংসা পেয়ে। আজ অ্যামব্রোসিয়োর জন্যই চারকোনা টেবিল সরিয়ে সে জায়গায় রাখা হয়েছে গোল টেবিল। ওদের জন্য রয়েছে মাত্র তিনটে চেয়ার, অন্যগুলো উধাও। অ্যামব্রোসিয়োর মত লোক টেবিলের মাথায় বসতে অভ্যস্ত, কিন্তু তাকে ওই সুযোগ দেয়া বিপজ্জনক। সবসময় সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে রাখতে চায় ড্রাগ

লর্ড। কিন্তু নিজের অবস্থানও বুঝিয়ে দিতে হবে এলেনার। মুখে কিছু না বলেও টের পাইয়ে দিতে হবে, এই প্রাসাদ এবং চারপাশের সব আসলে তারই নিয়ন্ত্রণে।

'বসুন দয়া করে,' ড্রাগ লর্ডকে চেয়ার টেনে দিল এলেনা। বসে পড়ল পাশের চেয়ারে।

পাশাপাশি বসেছে ওরা। আস্তে করে মাথা দোলাল এলেনা।

ওদের জন্য গ্লাসে দামি ওয়াইন ঢেলে দিল ওয়েইটার।

ঠোঁটে গ্লাস তুলে ছোট্ট চুমুক দিল এলেনা। 'আপাতত তোমরা বিদেয় হও। দরকার পড়লে বেল দেব।' কিচেনের দিকে রওনা হয়ে গেল চার ওয়েইটার। এবার বলল এলেনা, 'আমার বিশ্বস্ত এক ভদ্রলোক লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছেন। তাঁর নাম আর্ট ডগসন। আমি কি তাঁকে আসতে বলব?'

'নিশ্চয়ই,' স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য জোরে বলল ড্রাগ লর্ড। বডিগার্ডদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আরও সতর্ক হতে হবে। একটা কথাও বলল না তারা, চলে গেল বাড়ির ভিতর। এক মিনিট পর আর্ট ডগসনকে নিয়ে ফিরে এসে আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। আগেই সার্চ করে দেখেছে নতুন লোকটাকে।

'ইনি মিস্টার আর্ট ডগসন, আর ইনি মিস্টার অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়ো,' পরিচয় করিয়ে দিল এলেনা। 'মিস্টার ডগসন আমার এবং আমাদের পরিবারের বেশ কয়েকটি কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। নিজ জান দিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করি বলেই আজ এখানে নিমন্ত্রণ করেছি।'

বরফ দেয়া বাকেট থেকে ওয়াইনের বোতল নিল ড্রাগ লর্ড, কঠোর চোখে চাইল আর্ট ডগসনের দিকে। নিজেও কঠোর চোখেই ডগসনকে দেখল এলেনা। বুঝতে পারছে, কী ভাবছে অ্যামব্রোসিয়ো। হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল এলেনার, চমকে ভাবল: ভুল দেখলাম নাকি? ডগসনের মুখে সামান্য নীল রং রয়ে গেছে?

নিজের চেয়ারে বসে পড়েছে ডগসন, নিজের গ্লাস বাড়িয়ে দিল ড্রাগ লর্ডের দিকে। গ্লাস ভরে দিল অ্যামব্রোসিয়ো। পরস্পরের চোখে চেয়ে আছে দুই পুরুষ। কেউ হ্যাণ্ডশেক করল না। 'ধন্যবাদ,' বলল ডগসন।

'জেন্টলমেন,' বলল এলেনা, 'আসুন, ড্রিঙ্কের ফাঁকে বলি আমার সমস্যা। তারপর খাবার সার্ভ করবে ওয়েইটাররা।'

'চমৎকার কথা,' বলল ড্রাগ লর্ড। 'সরাসরি কাজের কথায় যাওয়াই ভাল।'

'কয়েক সপ্তাহ আগে দুই বাংলাদেশি, তাদের নাম মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী; এরা আমার উপর চোখ রাখতে শুরু করে। হাজির হয় গিয়ে আমার এস্টেটে। তারাই গোপন সেনোটের কাছে আপনার সিকিউরিটির লোকদের খুন করে। আমার ভুল না হয়ে থাকলে খুন হয় বারোজন।'

'হ্যাঁ,' বলল ড্রাগ লর্ড। 'ওরা বেড়াতে গিয়েছিল বলে বহু টাকা খরচ হয়েছে আমার।'

'পরে হাজির হয় এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে। তাদের চোখে পড়ে পপি, কোকা ও গাঁজার গাছ। আমার বাড়িতে এসেও নালিশ করে গেছে।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'আরও কিছু সমস্যা তৈরি করেছে এরা। একটা মায়ান কোডেক্সের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে যা-তা বলতে শুরু করেছে। খুন করার চেষ্টা করেছে মিস্টার ডগসনকে। উল্টো আমার এবং মিস্টার ডগসনের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে। অবশ্য, ওই মামলা খারিজ হয়ে গেছে। কিন্তু সবার সামনে সাধারণ একটা আদালতে গিয়ে অপমানিত হতে হয়েছে আমাকে।'

'ভাল লাগার কোনও কারণ নেই, বুঝতে পারছি,' ওয়াইনে চুমুক দিল অ্যামব্রোসিয়ো।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমার জন্যে মস্ত বিপজ্জনক মানুষ হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে তারা। এভাবে যা খুশি করবে, তা হতে দিতে পারি না। তবে আপনার জন্যে আরও বেশি বিপজ্জনক তারা। এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে গিয়ে আপনার খামার ভাল করে ঘুরে দেখেছে। জানি, আপনি বলবেন, যার যার ঝামেলা নিজেরই সামলে নেয়া উচিত; আপনাকে বিরক্ত করে তোলা উচিত নয়, কিন্তু আপনি এবং আমি একই সমস্যার মুখে পড়েছি।'

'যথেষ্ট খোঁজ নিয়েছেন আমার বিষয়ে,' হাসল অ্যামব্রোসিয়ো, 'আপনি অনুভূতি-সম্পন্ন ভদ্রমহিলা, সত্যিকারের ব্রিটিশ লেডি।'

পাল্টা মৃদু হাসল এলেনা। 'চেয়েছি নিখুঁত ভদ্রমহিলা হতে, হয়তো তা-ই হয়েছি।' ড্রাগ লর্ডের গ্লাস ভরে দিল ও।

'ঠিক আছে, এবার বলুন আমি কী করতে পারি। তারপর লাঞ্চ করব আমরা। লাঞ্চ শেষ হওয়ার আগেই বলে দেব কী করতে পারব।'

'মিস্টার ডগসন? আপনি কি দয়া করে আমার হয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবেন?'

মনে মনে চতুর মেয়েটার প্রশংসা না করে পারল না আর্ট ডগসন। মেয়েটা এমন ভঙ্গি নিয়েছে, উল্টে খেতে জানে না ভাজা মাছ। কোটিপতির লাডলা মেয়ে, নিষ্পাপ, বোকা আর অসহায়। আর তাই তার হয়ে কথা বলবে ডগসন। তা হবে সংক্ষেপে। বুঝিয়ে দেবে কী করা উচিত। 'মায়াদের সাইটের একটা লিস্টি করেছেন মিস হিউবার্ট, সেগুলোর একটায় গিয়েছিলেন। তার আগে পাঁচজন লোককে পাঠানো হয়েছিল হেলিপ্যাড পরিষ্কার রাখতে। পরে ওখানে নামকরা সব সাংবাদিকদেরকে নিয়ে যাবেন মিস তাঁর আবিষ্কার করা ধ্বংসস্তূপ দেখাবার জন্যে। আগে পাঠানো ওই পাঁচজন সম্পূর্ণ সশস্ত্র ছিল। তবুও মিস ওখানে যাওয়ার আগেই উধাও হয়েছে। আর আমরা এখন জানি, আগেই ওই সাইটে

গিয়েছিল মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী।'

'বুঝলাম,' বলল অ্যামব্রোসিয়ো। ঘুরে চাইল এলেনার দিকে। 'এবার আপনার অপূর্ব টেবিলের সম্মানে লাঞ্চ সার্ভ করতে বলুন।'

ছোট্ট রুপালি ঘন্টি তুলে মিষ্টি আওয়াজ করল এলেনা। দু' মিনিট পেরোবার আগেই হাজির হলো লাঞ্চ। পোচ করা স্যামন, সঙ্গে ক্যাপার সস ও অ্যাসপারাগাস। খাবারের সঙ্গে এল উনিশ শ' আটানব্বুই সালের ভিউভ ক্লিকত্ লা গ্রাঁ দেম। ফ্রেঞ্চদের কায়দায় সালাদ দেয়ার আগে সরবেট দিয়ে পরিষ্কার করা হলো প্লেট। শেষে এল ছোট কিন্তু দুর্দান্ত স্বাদের পেস্ট্রি, সঙ্গে কড়া এসপ্রেসো কফি।

কফি শেষে আরাম করে চেয়ারে হেলান দিল সেনর অ্যামব্রোসিয়ো।

বেয়ারাদের দিকে সামান্য ইশারা করল এলেনা, ব্যস্ত হয়ে টেবিল পরিষ্কার করে বাড়ির ভিতরে চলে গেল তারা। তাতে লাগল বড়জোর এক মিনিট।

ড্রাগ লর্ডকে আরেক কাপ এসপ্রেসো কফি দিল এলেনা।

আর্ট ডগসনের দিকে বরফ-ঠাণ্ডা চাহনি দিল অ্যামব্রোসিয়ো, মনে হলো অপরিচিত লাশ দেখছে। 'আমি জেনে নেব আপনার ওই পাঁচজনের কী হয়েছে। জঙ্গল বিপজ্জনক জায়গা। আমার লোক ছাড়াও অনেক লোক আছে, যারা সঙ্গে অস্ত্র রাখে। আর মাসুদ রানা বা সোহানা চৌধুরী দায়ী হয়ে থাকলে আপনার লোক বোধহয় এখন কোনও জেলখানায়।' কোটের পকেট থেকে কার্ড বের করে ডগসনকে দিল সে। 'নিন, আগামীকাল বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনাকে সাহায্যের জন্যে একদল পেশাদার লোক দেব, ওরা ভয় পাবে না বাংলাদেশি কোনও টুরিস্ট দেখলে।'

সাতাশ

জিপের পিছনে যার যার ব্যাকপ্যাক তুলে ফেলেছে রানা ও সোহানা। এবার ভাড়া গাড়ি নিয়েছে। প্রায় নতুন। কিছুক্ষণ পর সরু, আঁকাবাঁকা পথে স্যাণ্টা মারিয়া দে লস রকাস লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল ওরা। ওই শহরের কাছেই ড্রাগসের ট্রাক থেকে নেমে পড়েছিল ওরা, পরে সাহায্য পেয়েছিল এক যাজক ও ডাক্তারের কাছ থেকে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর জানতে চাইল সোহানা, 'তোমার কী মনে হয়, আক্কেল হয়েছে ওই মেয়ের?'

'হওয়ার তো কথা,' বলল রানা। 'এলেনা হিউবার্ট যাওয়ার আগেই পরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টা বড় সাইট আবিষ্কার করেছি আমরা। প্রতিটা সাইট রেজিস্ট্রি করেছি। গা জ্বলে যাওয়ার কথা তার। কোনওভাবেই ওগুলো দাবি করতে পারবে না।' ড্রাইভ করছে রানা, এক মিনিট পর বলল, 'বেলিযের পুলিশ বলেছে, পাইলট জনের ওপর হামলাকারী ওই পাঁচজন এখনও মুখ খোলেনি। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, এলেনা তাদেরকে কাজ দিয়েছিল, যাতে করে মায়ান সাইট পরিষ্কার করে।'

'জানি, ভীষণ রেগে গেছে ওই মেয়ে,' বলল সোহানা। 'আর যাই হোক, ইউরোপের ম্যাগাযিনগুলো যেভাবে ওকে ছিলে দিয়েছে; বারবার ওর মনে হবে, আত্মহত্যা করলেই ভাল হতো। বড়লোকের মেয়েদের হিংসা করে অনেকেই, তবুও তাদের কীর্তি পড়ে ট্যাবলয়েডে; অবশ্য হিংসা তো আর প্রশংসা নয়। মানুষের মনে অনেক অনুভূতি একইসঙ্গে কাজ করে। ওই মেয়ে যখন কষ্ট পেল,

বা বিব্রত হলো, দারুণ মজা পেয়েছে বেশিরভাগ মানুষ। ওই একই মেয়ে যদি ভাল কোনও কাজ করত, কষ্ট করে প্রশংসা করত না অত লোক। আসলে...'

'আমি কী দোষ করলাম?' করুণ সুরে বলল রানা। 'গাড়িতে তুললাম সুন্দরী প্রেমিকা, এখন দেখছি ডাইনীর মত ভয়ঙ্কর এক মানসিক রোগের পাকা ডাক্তারনী— জটিল মানুষের কঠিন কঠিন সব অনুভূতির ব্যাখ্যা ঝাড়ছে অসহায় আমার ওপর!'

'আহ্, আমার কথা শেষ হয়নি,' ফিক করে হেসে ফেলল সোহানা। 'এসব বুঝতে হয়। নতুন কেনা বইতে এসবই বলেছে।'

'মরুক শালীর বই! কুষ্ঠ হোক শালীর!'

'ঠিক আছে, বাদ থাকুক সেসব,' বলল সোহানা, 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি, আমরা কিন্তু সত্যিই একটা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছি এলেনার সঙ্গে। আর এই কাহিনির শেষ অংশ আনন্দের না-ও হতে পারে।'

'ইচ্ছে করলেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে, তাকে কে বলেছে আর্কিয়োলজিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করতে?' বলল রানা। 'মেক্সিকান সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিক কোডেক্স। ব্যস, খেল্ খতম, পয়সা হজম।'

'তোমার কি সত্যিই মনে হয় পিঠ যথেষ্ট বাঁকা হয়েছে ওর?'

'না, তা হয়নি।'

'শেষে হয়তো ওর কাছ থেকে কোডেক্স চুরি করতে হবে আমাদের।'

'আমিও তা-ই ভেবেছি।'

'সত্যিই? তা-ই ভেবেছ?'

'হ্যাঁ। তবে তার আগে জানতে হবে কোথায় রেখেছে ওটা।'

বিকেলে স্যান্টা মারিয়া দে লস রকাসের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। নীচের উপত্যকা থেকে ওই শহরে উঠতে হলে ব্যবহার

করতে হবে খাড়া পাহাড়ি পথ।

রাস্তার এক পাশের ঝোপঝাড় দেখাল সোহানা। 'ওখানে নেমেছিলে তুমি। পা কেটে গিয়েছিল।'

'বুকে জমিয়ে রাখো সব স্মৃতি, একদিন নাতী-নাতনীদের বলবে, "তোদের দাদা..."'

'থাক এ প্রসঙ্গ,' গম্ভীর হয়ে গেল সোহানা। অন্তর থেকে জানে, ওরা যে পেশায় আছে, যে-কোনও দিন যে-কোনও মুহূর্তে আসবে নিষ্ঠুর মৃত্যু।

কিছুক্ষণ পর বলল সোহানা, 'চার্চে থামবে কিন্তু। ফাদার দিয়েগো স্যান মার্টিনের সঙ্গে দেখা করব।'

'দেখা তো করতেই হবে,' বলল রানা। 'আমরা কথা দিয়েছি, এলেনা হিউবার্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানাব কী ঘটল।'

জিপ নিয়ে উঠে আসবার পর ছোট শহরটা দেখতে পেল ওরা। প্রাচীন চার্চের সামনে গাড়ি রাখল রানা। নেমে পড়ল ওরা, হেঁটে চলে এল চার্চের পিছনের ছোট দালানে। এখানেই বাস করেন ফাদার, তাঁর অফিসও এটাই।

দরজায় টোকা দিতেই ওদিক থেকে এগিয়ে এল পায়ের শব্দ। কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল দরজা, রানা ও সোহানাকে দেখে হাসি ফুটে উঠল ফাদারের মুখে। 'সেনর-সেনোরা রানা, খুবই খুশি হলাম আপনাদেরকে আবারও দেখে।'

'মনে রেখেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ, ফাদার,' বলল রানা। 'যাওয়ার পথে আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে থেমেছি।'

'আপনাদের গম্ভীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ভাল কোনও খবর পাব না,' বললেন ফাদার। 'কথাই যদি শুনব, তবে চলুন চা হয়ে যাক।' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

'চায়ে আপত্তি নেই,' বলল সোহানা। 'ধন্যবাদ।'

অতি সাধারণ অফিস, ভিতরে ঢুকল রানা ও সোহানা।

আসবাবপত্র কালো কাঠের। টেবিলের উপর ল্যাপটপ কমপিউটার না থাকলে মনে হতো ওরা প্রবেশ করেছে ষোলো শ' শতাব্দীর কোনও ঘরে। পথ দেখিয়ে রানা ও সোহানাকে ছোট ডাইনিং রুমে আনলেন ফাদার। হাতের ইশারা করে বসতে বললেন লম্বা, কালো কাঠের টেবিলের পাশে। চেয়ার নেই, দু'দিকে দুটো বেঞ্চি। ওরা বসতে না বসতেই ওদিকের একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল এক বয়স্কা মহিলা। বাদামি ত্বক বলে দিল সে মায়া জাতির মানুষ, চুলগুলো পুরু বেণী করা।

ফাদার মার্টিন বললেন, 'সেনোরা অব্রিগন, এঁরা সেনর রানা আর সেনোরা রানা, আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।'

আলমারি থেকে সস্তা চায়নিজ প্লেট ও তশতরি নিল মহিলা, সেগুলো রানা ও সোহানার সামনে রাখলেন ফাদার। তিন মিনিট পর রান্নাঘর থেকে চা ও বিস্কুট নিয়ে এল মহিলা।

'আমাদের সঙ্গে বসবেন না, সেনোরা অব্রিগন?' জানতে চাইল সোহানা।

'অস্বস্তিবোধ করেন,' বললেন ফাদার। 'ছোট শহর, যাজকের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে চায় না আশপাশে কেউ থাকুক। অভ্যস্ত হয়ে গেছেন সেনোরা অব্রিগন। সেনোরা রানা, আপনি কি আমাদেরকে চা ঢেলে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই,' বলল সোহানা। হাজার বছর ধরেই এ কাজটি মহিলাদের উপর ন্যস্ত করেছে পুরুষজাতি। সোহানার নরম হাতেও সামান্যতম ছলকে গেল না চা।

কাপ ঠোঁটের কাছে তুলে ফাদার বললেন, 'এবার বলুন, এলেনা হিউবার্টের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কী হলো?'

সেই শুরু থেকে বিস্তারিত সব জানাল রানা ও সোহানা। ওদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এলেনা, কিনে নিতে চেয়েছিল মায়ান কোডেক্স, আর শেষে জঙ্গলে মস্ত শহর আবিষ্কার করতে গিয়ে

একেবারে বোকা বনে গেছে।

'এলেনা হিউবার্ট সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি আমরা,' বলল রানা। 'সে ওই মায়ান কোডেক্স ব্যবহার করে সবচেয়ে ভাল সাইট আবিষ্কার করতে চাইছে। আমরাও ওই একই তথ্য পেয়েছি ফাদার লাস কাসাসের কপি থেকে, ফলে প্রতিটি সাইটে ওর আগে হাজির হয়েছি। স্যান ডিয়েগো শহরের ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়ার এক প্রফেসরের মাধ্যমে পেয়েছি ফোটোগ্রাফ ও জিপিএস ডেটা, আর জায়গাগুলো ওই মেয়ের আগেই পেয়ে যাওয়ায় রেজিস্ট্রি করেছি আন্তর্জাতিক সমস্ত আর্কিয়োলজিকাল সংগঠনে।'

চিন্তিত দেখাল ফাদারকে। 'শুনে খারাপ লাগছে, ওই মেয়ে এত বড় চরম স্বার্থপর। ভুল পথে চলেছে। আপনাদের কী মনে হয়, এবার কি নার্কোটিক ট্র্যাফিকারদের ওই জমি ব্যবহার ঠেকাতে তার ওপর চাপ দেবে সরকার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'গুয়াতেমালায় কারও কারও সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা বলেছে ভবিষ্যতে ভাল হবে পরিস্থিতি। ওই খামারের কাছেই আছে মায়াদের প্রাচীন শহর। বহু মানুষ জানবে এ কথা। তারা আসবে দেখতে। আর এলেই তাদের চোখে পড়বে ড্রাগসের মাঠ। তারা যোগাযোগ করবে ন্যাশনাল পুলিশের সঙ্গে। কিন্তু পরিবেশ ভাল হতে সময় নেবে। ভুললে চলবে না, সরকারের উঁচু পর্যায়ের মন্ত্রী আর অফিশিয়ালদের সঙ্গে খাতির আছে এলেনা হিউবার্টের। তারা নানাভাবে উন্নয়নে বাধা দেবে।'

'আপনারা এত কষ্ট করে এখানে এসে সব বললেন, সেজন্যে সত্যিই অনেক ধন্যবাদ,' বললেন ফাদার মার্টিন।

'শুধু সেজন্যে আসিনি আমরা,' বলল রানা, 'আরেকটা কারণও আছে।'

'আপনি জানেন, আমরা ব্যস্ত হয়ে মায়ান কোডেক্সের সব সাইট ভেরিফাই, ফোটোগ্রাফ, সেই সঙ্গে রেজিস্ট্রি করছি,' বলল

সোহানা। 'আর সেই কারণেই এবার এখানে এসেছি।'

'এখানে?' অবাক হলেন ফাদার মার্টিন। 'এই স্যান্টা মারিয়া দে লস রকাসে?'

'শহরে নয়,' বলল রানা। 'আমরা ধারণা করছি শহরের ওপরের পাহাড়ি অধিত্যকায় ওই সাইট। মানচিত্রে ওটা দেখানো হয়েছে টাওয়ার বা দুর্গ হিসেবে।'

'আশ্চর্য,' বললেন ফাদার, চিন্তিত মনে হলো তাঁকে। 'আপনারা কি চান গাইড জোগাড় করে দেব? পাহাড়ে হারিয়ে গেলে মস্ত বিপদ হবে।'

'ধন্যবাদ, ফাদার, তবে গাইড লাগবে না,' বলল সোহানা। 'আমাদের কাছে ওই লোকেশনের জিপিএস আর এরিয়াল ফোটোগ্রাফ আছে। আর ঘুরতে ঘুরতে নানা জায়গা খুঁজে নেয়ারও অভ্যেস হয়ে গেছে। উপকৃত হব, যদি জানান কোথায় রাখতে পারব আমাদের গাড়ি।'

'বেশ,' বললেন ফাদার, 'মারাভের গ্যারাজে রাখতে পারবেন। সে-ই শহরের মেকানিক, প্রায়ই রাতের জন্যে অন্যের গাড়ি রাখে।'

'গুড,' বলল রানা। 'পাহারাও দেবে, আবার মোবিলও পাল্টে দেবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে খালি তশতরি ও কাপ তুলে নিতে শুরু করেছে সোহানা, টুকটাক কথা বলছে ফাদার ও রানা। রান্নাঘরে ঢুকতেই সোহানা দেখল, চমকে পিছিয়ে গেল সেনোরা অব্রিগন। মনে হলো কান পেতে শুনছিল। মিষ্টি করে হাসল সোহানা, মহিলার হাতে তুলে দিল কাপ-তশতরি। পাল্টা হাসল না সেনোরা অব্রিগন।

ফাদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে সেনোরা অব্রিগনের প্রসঙ্গ তুলল সোহানা, 'মনে হলো মন দিয়ে কথাগুলো গিলছিল মহিলা।'

'ক্ষতি নেই,' বলল রানা, 'চাইলে আমাদের সঙ্গে বসেই শুনতে পারত।'

'জানি। এ শহরের সবাই জানে, কী করে তাদের কথা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।'

সহজেই পেয়ে গেল ওরা মারাভের গ্যারাজ। ওটা তার বাড়ির পাশেই। একটা ফুটো চাকা মেরামত করছিল লোকটা। গাড়ির মোবিল বদল এবং পাহারার জন্য তাকে ত্রিশ ডলার দিল রানা।

মারাভ জানাল, তার পাশের বাড়িটা কোয়াদিরের, চাইলে ওখানে রাতের জন্য সামান্য পয়সায় গেস্টরুম ভাড়া নিতে পারে। কোয়াদিরের সঙ্গে দেখা করে রুম নিতে রাজি হয়ে গেল ওরা। বিকেল হয়ে গেছে, ছোট রেস্টুরেন্টে থেমে খেয়ে নিল দু'জন। ওখানেই প্রথমে ফাদারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওদের।

পরদিন সকালে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই হাঁটাপথে রওনা হয়ে গেল ওরা। খুঁজে বের করতে হবে মায়ান কোডেক্সের ওই পাথুরে দুর্গ। সুন্দর পরিবেশে চমৎকার কাটছে ওদের সময়। নতুন ফসল বুনবার জন্য তৈরি মাঠের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছে। একটু পর ঢুকে পড়ল ঘন জঙ্গলে। দশ মিনিটের মাথায় পেয়ে গেল শহর-সমতল থেকে অধিত্যকায় উঠবার সরু পথ।

এক শ' ফুট উঠবার পর সোহানা বলল, 'এদিকটা দেখো।'

থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ও। বামদিকে বাঁক নিয়ে আরও উপরে উঠেছে পথ। এখান থেকে পরের স্তরে যেতে হলে প্রায় খাড়াই পথে চলতে হবে। বড় কথা হচ্ছে, সামনের দিক পাথরের স্ল্যাব দিয়ে রিএনফোর্সড্, যেন ওই পথে গেলে পড়বে কোনও প্রাচীন দুর্গ।

'আমরা ঠিক পথেই আছি,' বলল রানা। সোহানার পাশে রওনা হয়ে গেল ও।

পথের বাঁক নিল ওরা।

‘একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ,’ বলল সোহানা, ‘আগে যেসব জায়গায় গেছি, ওখানে পাথরের ওপর ঘন ঝোপঝাড় ছিল। কিন্তু এখানে তা হয়নি।’

পাশাপাশি হেঁটে উঠছে ওরা খাড়াই পথে। রানা বলল, ‘এই সাইট মানুষের সভ্যতা থেকে কাছে। আর বেশিরভাগ সময় সম্ভব হলে পুরনো পথেই চলে সবাই। নতুন ট্রেইল তৈরি করার দরকার কী?’

পাহাড়ি পথে কিছুক্ষণ চুপচাপ উঠল ওরা, কোথাও চোখে পড়ল না ঘন ঝোপ বা কয়েক শতাব্দীর ভূমিধস।

‘এ পথে কারা চলে?’ আনমনে বলল সোহানা, ‘আর যায় কোথায়?’

‘হয়তো ওপরে এমন কিছু আছে, যে-কারণে যেতে হয়,’ বলল রানা। ‘হয়তো ফসলের মাঠ আছে।’

‘এই সরু আর খাড়া পথে ভারী ফসল বইতে হলে ভয়েই মরে যেতাম,’ বলল সোহানা।

‘তা হলে তুমিই বলো ওপরে কী আছে?’

‘হতে পারে অন্য গ্রামের শর্টকাট এই পথ,’ হাসল সোহানা। ‘আর ওখানে আছে এয়ারকণ্ডিশণ্ড ফাইভ স্টার হোটেল আর রেস্টুরেন্ট।’

‘তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। গোসল সেরে লাঞ্চ শেষে তোমাকে নিয়ে বিছা...’

‘যথেষ্ট হয়েছে!’

‘বৈজ্ঞানিক কাজে...

‘আর একটা কথাও শুনব না!’

বেসুরো শিস শুরু করে চট্ করে একবার সোহানাকে দেখে নিল রানা, ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি।

‘জলদি হাঁটো!’ ধমক দিল সোহানা।

আরও খাড়া হয়েছে পথ। চুপ হয়ে গেল ওরা। দশ মিনিট পর পৌঁছল অধিত্যকায়। দেখে নিল চারপাশ। দিল্লির ওল্ড ফোর্টের মতই, তবে ছোট জায়গা, বড় কিছু ঢিবিও আছে। হতে পারে মাটি চাপা দালান। কিন্তু মায়াদের অন্য সব শহরের দালানের কাছে কিছুই নয়। অতটা উঁচু বা খাড়াও নয়। কোথাও প্রকাণ্ড কোনও সমাধির নির্মাণশৈলী দেখা গেল না। জায়গাটা এক মাথা থেকে আরেক মাথা হবে বড়জোর তিন শ' গজ।

অন্য একটা বিষয় খেয়াল করেছে ওরা।

এই অধিত্যকা ঘিরেছে মাত্র কয়েক ফুট উঁচু, বৃত্তাকার টিলা। যেন গামলার কিনারা। হাঁটতে শুরু করে ওখানে পৌঁছে গেল ওরা, ছবি তুলছে চারপাশের। এক জায়গায় থেমে গেল রানা। টিলা থেকে খসে পড়েছে এক অংশ। পরিষ্কার দেখল, ওই টিলা স্রষ্টার কীর্তি নয়, পাথর-মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল মানুষ।

'এটা আসলে দেয়াল,' মন্তব্য করল রানা, 'ইউরোপের পুরনো রোমান দুর্গের মত— পাথর দিয়ে দেয়াল করেছিল শত্রু ঠেকাতে। যুদ্ধের জন্যে তৈরি।'

'আমাদের দেখা অন্য সাইটের মত নয়,' সায় দিল সোহানা। 'মনটাও কেমন যেন করছে। এখানে যেন বাস করে না কেউ।'

'ভয়-ভয় লাগছে? ভূত আসতে পারে? মটকে দেবে ঘাড়?'

'না, তা বলছি না আমি,' চুপ হয়ে গেল সোহানা।

হাঁটতে শুরু করে সমতল অধিত্যকা ঘুরে দেখছে ওরা। মাঝামাঝি জায়গায় এসে মাটি ও পাথরের আরও কিছু ঢিবি দেখল। ছোট ছোট ঝোপঝাড় বা ঘাস জন্মেছে ওখানে। পাহাড়ের এত উপরে হালকা হাওয়ায় পাতা নড়বার সরসর আওয়াজ ও পাখির কিচিরমিচির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই। কিন্তু কখনও কখনও একেবারে নীরব হয়ে উঠছে চারপাশ। তখন জুতোর আওয়াজ বড় বেশি কানে লাগছে ওদের।

'কখনও মানুষ বাস করবে না এখানে,' বলল সোহানা। 'ওই সেনোটের কথা মনে আছে? ওটার দেয়ালও তৈরি করা হয়েছিল শেষ লড়াইয়ের জন্যে।'

'বুঝতে পেরেছি কী বলতে চাও,' বলল রানা। 'সত্যি, ওই সেনোটে আর এই দুর্গ—দুটোই সে-আমলের শহরের লড়াইয়ের কারণেই তৈরি।'

হাঁটতে শুরু করে পৌঁছে গেছে ওরা একটা খাদের কাছে। বড়জোর তিন ফুট গভীর ওটা। চওড়ায় এতই কম, দাঁড়াতে পারবে স্রেফ একজন। অধিত্যকার কিনারার পাথুরে দেয়াল থেকে শুরু হয়ে তিন শ' ফুট গিয়ে মিশেছে কয়েকটা ঢিবিতে।

'এই নালা কীসের মনে হয়?' জানতে চাইল সোহানা।

'পট হাণ্টার আর কবর খোদকরা এসেছিল, মাটি খুঁড়ে ঢুকেছে পাতাল সমাধিতে,' বলল রানা। স্যাটালাইট ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে কয়েকটা ছবি তুলল। পাঠিয়ে দিল সালমা আলীর কাছে। নালার পাশ দিয়ে হাঁটছে ওরা। চোখ রেখেছে নীচের জমিতে। 'তবে সুবিধে হয়নি তাদের। সামনে কোথাও বড় কোনও গর্ত দেখছি না।'

মাঝারি এক ঢিবিতে গিয়ে মিশেছে খাদ। শেষ মাথায় পৌঁছে থামল ওরা। সোহানা বলল, 'নালা কিন্তু এখানে শেষ নয়, বুজে দেয়া হয়েছে। ঢিবির পাথর অন্য জাতের। মনে হয় এখানে গর্ত করেছিল কেউ, কাজ শেষে আবারও বন্ধ করে দিয়েছে।' চারপাশ দেখল। 'জায়গাটা কেমন ভুতুড়ে না?'

'বড় চুপচাপ,' বলল রানা। নালার ভিতর নেমে ঢিবির গা থেকে সরাতে শুরু করেছে পাথর।

'তুমি কি খুঁড়তে শুরু করলে? আমরা তো এ কাজে আসিনি। সঙ্গে কোদালও নেই। সাইটের লোকেশন আর ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিলেই রেজিস্ট্রি করবেন ডক্টর আক্তার রশিদ।'

‘ওদিকটা না দেখে সালমা আলী বা ডক্টর রশির্দকে জানাতে পারব না কী আছে,’ বলল রানা, ‘যে-কোনও কিছুই থাকতে পারে।’

‘হয়তো কোনও সমাধি। কিন্তু নালা দেখে মনে হচ্ছে আগেই এখানে কেউ এসেছিল।’

‘কে জানে, হয়তো মুঠো-সমান সব পাথর রেখেছিল হামলাকারীদের ঠেকাতে। অথবা নীচে আছে পটের সব টুকরো। এদিকের আর্কিয়োলজিকাল সাইটে এসব অনেক পাওয়া যায়।’

বড় করে শ্বাস ফেলে রানার পাশে কাজে নেমে পড়ল সোহানা, ঢিবির গা থেকে সরাতে শুরু করেছে পাথর-খণ্ড। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল পাথরের চারকোনা এণ্ট্র্যান্স। ‘একসময় ছোট কোনও দরজা ছিল এখানে,’ বলল সোহানা। ‘পাথরের টুকরো আর পট থিয়োরি বাদ।’

‘গা শিউরে ওঠা অনুভূতিটা বিদায় নিয়েছে?’

‘আরও বেশি অস্বস্তি হচ্ছে,’ বলল সোহানা। ‘তুমি পাশে আছ বলে, নইলে দেরি না করে ফিরতি পথ ধরতাম।’

‘দেখা যাক ওদিকে কী আছে,’ বলল রানা।

প্রবেশদ্বার থেকে সরে গেল সোহানা। শেষ কিছু পাথর সরিয়ে ফেলল রানা, তারপর বলল, ‘এবার চলো।’ ব্যাকপ্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল ও, বাতি জ্বেলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল সংকীর্ণ সুড়ঙ্গে।

ভিতরে বদ্ধ, থমথমে নীরবতা।

সুড়ঙ্গের মুখে পুরো এক মিনিট চুপ করে বসে রইল সোহানা, পেতে রইল কান। অবশ্য অস্বস্তিবোধ হার মানল কৌতূহলের কাছে, নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে জ্বেলে রওনা হয়ে গেল রানার পিছনে।

খানিকটা গিয়েই সুড়ঙ্গ শেষ, উঠে দাঁড়িয়ে সোহানা দেখল

সামনের ছাত বেশ উঁচু। ফাঁপা বড় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও। দূরে দেখা গেল সাদা স্টাক্কো দেয়াল। তাতে আঁকা মায়াদের ভয়ঙ্কর সব রঙিন ছবি। পাশেই অসংখ্য গ্লিফ। এক জায়গায় পালকের মুকুট মাথায় চোদ্দজন মানুষের ছবি, প্রত্যেকের পরনে জাগুয়ারের চামড়া, হাতে খাটো বর্শা, গদা, অবসিডিয়ান ছোরা ও গোল ঢাল। যুদ্ধে চলেছে তারা।

সমাধির মেঝের দিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক হতেই চমকে গিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোল সোহানার মুখ থেকে। একটু দূরে পড়ে আছে লাশ। ভালকান টাকানার সেই মায়ান লোকটার মতই মামিফায়েড হয়ে গেছে। চামড়া বাদামি, মাংস বলতে কিছুই নেই। হাড় জিরজিরে। পরনে ছেঁড়া পোশাক, কোমরে বেল্ট, পায়ে বুট, মাথার পাশেই পড়ে আছে চওড়া ব্রিমের ফেল্ট হ্যাট।

ওদিকের দ্বিতীয় দরজা গলে এদিকে এল রানা। 'সরি, তোমাকে আগেই সাবধান করা উচিত ছিল।'

মৃত লোকটার পাশে বসে মুখটা দেখল সোহানা। চাপা স্বরে বলল, 'খুন হয়েছে জাগুয়ারের হামলায়? ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে পোশাক। শরীরে নানা জায়গায় ক্ষত।'

'রিভলভারটা দেখো।'

লাশের ডানদিকে লম্বা নলের রিভলভার দেখল সোহানা। এক হাতে সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'ছয়টা গুলি করেছে।'

'কিন্তু জাগুয়ারের দেহ বা হাড় নেই।'

'কোন্ জাতের রিভলভার চিনতে পারছ?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'সিঙ্গল অ্যাকশন আর্মি কোল্ট, ওটা তৈরি করা হয়েছে আঠারো শ' তেয়াত্তর সালে। আর এই লোক এখানে এসেছে তার পর।'

'করোটির বামদিক ছেঁচে গেছে,' বলল সোহানা।

'জানি। ভেবেছিলাম দিনের আলোয় বেরিয়ে বলব।'

'মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে মারা যায়,' নিচু স্বরে বলল সোহানা। 'খুন করা হয়।'

সোহানা উঠে দাঁড়ানোর পর সমাধির মাঝের চেম্বারের দিকে পা বাড়াল রানা।

কাঠের বড় দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পাথরের মস্ত এক শবাধার দেখল সোহানা। উপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে লম্বা একটা কঙ্কাল। বুকে সোনার ব্রেস্টপ্লেট, পালকের মুকুটে সোনা ও জেড পাথরের কারুকাজ, কানে জেডের প্লাগ। পাশেই অবসিডিয়ান ছোরা, গদা এবং আধ মন ওজনের খাঁটি সোনার পেটা গহনা।

'ডাকাতি হয়নি এই সমাধি,' বলল সোহানা। 'কিন্তু তা কী করে হয়? যারা ওই লোককে খুন করেছে, তারা ভাল করেই জানত, এখানে আছে এত গহনা। কোটি কোটি টাকার সোনা। আর আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে এগুলো অমূল্য।'

পাতাল কবরখানার থমথমে নীরবতায় পা ঘষে যাওয়ার খস-খস আওয়াজ পেল ওরা। আবারও হলো ওই শব্দ। দরজা পেরিয়ে এদিকে চলে এল রানা ও সোহানা। বাইরের চেম্বারে হাজির হয়েছে কমপক্ষে ছয়জন। সবাই কাছের ওই শহরের মানুষ। সেনোরা অব্রিগন, মেকানিক মারাভ, রেস্টুরেণ্টের মালিক সেনর জেইম সালাযার, তার ছেলে, আরও দু'জন। শেষের দু'জনকে চিনল না রানা-সোহানা। সবার সঙ্গে নানান অস্ত্র। কারও হাতে ছোরা, কারও হাতে পিস্তল বা রিভলভার। সবাইকে উত্তেজিত মনে হলো।

'হ্যালো লেডিয অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন,' হালকা সুরে বলল রানা।

'বেরোন এখান থেকে,' ধমকের সুরে বলল রেস্টুরেণ্টের মালিক সেনর সালাযার, 'খুব সাবধান। ভুলেও চালাকি করবেন না।'

'আমরা কারও ক্ষতি করতে আসিনি,' বলল সোহানা, 'আপনারা...

'চুপ করুন! কথা বললে ওই লোকের মত মরবেন!'

সশস্ত্র শহরবাসীদের পাশ কাটিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকল রানা ও সোহানা, কয়েক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল দিনের আলোয়। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদেরকে। স্যান্টা মারিয়া দে লস রকাসের কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোক উপস্থিত। সবার হাতে অস্ত্র হিসাবে কিছু না কিছু আছে। কয়েক জনের হাতে ম্যাচেটি, অন্যদের হাতে কুঠার বা হ্যাচেট। দু'একজনের হাতে বেসবল ব্যাট। গুরুত্বপূর্ণ লোকদের হাতে হাণ্টিং রাইফেল, শটগান ও রিভলভার। শেষে জিনিসটা সমাধির মাঝে খুন হয়ে যাওয়া ওই লোকের রিভলভারের মতই প্রাচীন।

সোহানা ও রানা বুঝল, ওদেরকে খুন করতেই এসেছে এরা। রাইফেল, শটগান বা রিভলভারগুলোর নল তাক করা ওদের বুকে। দু'জনের হাতে পাকানো দড়ি। ওই জিনিস আনা হয়েছে ফাঁসি দেয়ার জন্য। আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে সোহানার কাছে ঢের বেশি বিপজ্জনক মনে হলো দড়ি।

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল এক লোক। রোদে পোড়া মুখ, খামারে কাজ করা রগ ওঠা হাত। কঠিন অবসিডিয়ানের মতই শীতল চোখে রানা-সোহানাকে দেখল। 'কবর লুটেরাদের কবর দিতে ভলাণ্টিয়ার হব আমি। এখান থেকে ঘাড় ধরে নীচে ফেলে দিলেই হবে। পরে পুঁতে দেব লাশ। এসো, কারা আমাকে সাহায্য করবে?'

আটাশ

ভিড় থেকে এক পা সামনে বেড়ে বলল আরেক লোক, 'আমিও

কবর খুঁড়ব।'

দ্বিধা কেটে গেল বেশ কয়েকজনের, হাত তুলে জানাল তারাও কবর দেয়ার কাজে সাহায্য করবে।

ভিড়ের মাঝে গিয়ে ঢুকল মেকানিক মারাভ। 'মনে রেখো, আমরা বাড়তি কষ্ট দেব না। হান্টিং রাইফেল দিয়ে মাথায় গুলি করো কেউ। চট্ করে মরবে।'

'বুঝলাম খুন করতে চাও, কিন্তু তার আগে বলবে না, কী কারণে মরতে হবে?' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল রানা। ফিসফিস করে সোহানাকে বলল, 'অপেক্ষা করে দেখা যাক।'

'দু'বার এ শহরে এসেছি আমরা,' বলল সোহানা। 'দু'বারই বলেছি কী চাই। কিছুই গোপন করিনি। গতকাল ফাদার মার্টিনকে বলেছি এখানে আসব। কোনও লুটপাটের ইচ্ছেও আমাদের নেই। আমরা শান্তি চেয়েছি তোমাদের শহরের।'

'সত্যিই খারাপ লাগছে আপনাদেরকে মরতে হবে,' বলল রেস্টুরেন্টের মালিক সেনর সালাযার। 'আমরা আপনাদেরকে ঘৃণা করি, তা নয়, কিন্তু আপনারা এই জায়গা দেখে ফেলেছেন। এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। আমরা বড়লোক নই, কিন্তু আমাদের আছে দীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাস। এই শহরের গোড়া-পত্তন হয়েছিল দুই হাজার বছরেরও আগে। বিশ মাইল দূরের ওই শহরের পতনের পর এখানে এসেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। আর এই অধিত্যকা আলটা ভেরাপাযের অন্যতম উঁচু জায়গা। অবশিষ্ট মানুষগুলোকে নিয়ে এখানে থেমে শেষ লড়াই করেন রাজা। তাঁর হারতে হয়নি। কিন্তু তারপর এক শ' বছর পর আবারও শুরু হলো লড়াই। তারপর বারবার। প্রতিবার একের পর এক শহরের রাজাকে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে। হারতে হয়েছে তাদেরকে। প্রতিবার এখানে এসে ব্যূহ তৈরি করেছেন সেই সময়ের রাজা। আর এখানে রয়েছে আমাদের চোদ্দজন বড় রাজার সমাধি। এরপর যখন এল

স্প্যানিয়ার্ড সৈনিক, শেষ লড়াইয়ের জন্যে এখানে উপস্থিত হলেন রাজা। হারতে হলো স্প্যানিয়ার্ডদেরকেও। তারা বুঝে গেল, কখনও কেড়ে নিতে পারবে না এ এলাকা। শেষে যাজকের মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ল তারা। পাহাড়ের মাথা থেকে ভেঙে ফেলা হলো পাহারা দেয়ার কেল্লা। ওখানে গড়ে তোলা হলো চার্চ। তবে কখনও গোপন কথা ফাঁস করেনি এ শহরের কেউ।'

'কিন্তু বেশি দিন লুকিয়ে রাখা যাবে না এ গোপন তথ্য,' বলল রানা। 'আমরা মেক্সিকোর এক আগ্নেয়গিরিতে পেয়েছি মায়াদের বই। ওখানে পরিষ্কারভাবে এঁকে দিয়েছে মানচিত্র। স্যাটালাইট ফোটোগ্রাফ দেখেও ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা জেনেছেন এখানে আছে সমাধি।'

'আপনারা এসে আমাদের পূর্বপুরুষদের কবর ঘেঁটে সব নিয়ে যাবেন, তা সহ্য করব না আমরা,' বলল সেনোরা অব্রিগন। 'আপনারা কলাম্বাস বা স্প্যানিয়ার্ডদের মতই লোভী। কিছু জানলেই আপনারা ধরে নেন ওটা আপনাদের হয়ে গেছে।'

'আপনাদের পবিত্র সমাধি লুট করার সামান্যতম ইচ্ছে নেই আমাদের,' বলল সোহানা। 'আমরা এখানে উঠে আসি এটা যদি না চাইতেন, ফাদার মার্টিনের ওখানেই সব বলে দিতে পারতেন। আমরা ভেবেছিলাম কেউ জানে না এমন একটা জায়গা আবিষ্কার করছি।'

কথা শুনে টিটকারি ও বিদ্রূপের হাসি-মুখে সোহানাকে দেখল ওরা। একজন রেগে গিয়ে বলল, 'আপনারা স্যাটালাইটের ছবি দেখেই ধরে নেবেন, অন্যের কবর খুঁড়লে কী-ই বা হয়? সে অধিকার আপনাদেরকে দিয়েছে কে? একবার ভেবেছেন, স্থানীয় আমরা আগে থেকেই সব জানি? এসব সমাধি তৈরি করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষ, তাঁরাই এই মেসায় দুর্গ গড়েছেন। ন্যাংটা-কাল থেকে এখানে আসি আমরা। আপনারা কী ভাবেন দেয়াল বা ঢিবি

চিনি না? আপনাদের কি ধারণা, আমাদের বাপ-দাদার কবর খুঁড়ে সব ধনরত্ন বিক্রি করে না দেয়া বোকার কাজ?' কাছের একজনের কাছ থেকে রাইফেল নিয়ে রানা ও সোহানার দিকে নল ঘোরাল সে। টেনে নিল বোল্ট, গুলি পৌঁছে গেছে চেম্বারে।

'থামো!' জোর ধমকের সুরে বলল কে যেন। হাঁফিয়ে চলেছে বেদম।

ঘুরে চাইল সবাই।

খাড়া অধিত্যকায় উঠে এসে থেমেছেন বৃদ্ধ ফাদার মার্টিন। ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ বেরোচ্ছে নাকের দুই ফুটো দিয়ে। দু'হাত উপরে তুলে বললেন, 'থামো! এ কাজ কোরো না! ওবাসি, রাইফেল সরিয়ে রাখো। তোমরা মানুষ খুন করবে নাকি! তারপর কী জবাব দেবে ঈশ্বরের কাছে?'

রাগী লোকটা নিজের পায়ের দিকে চাইল। তারপর বোল্ট খুলে অস্ত্র ধরিয়ে দিল ওটার মালিকের হাতে।

একটু স্বস্তি পেলেন ফাদার। তবে তিনি জানেন, এখানেই সব শেষ নয়।

মেকানিক মারাভ বলল, 'ফাদার, আপনি তো এই শহরের মানুষ নন! কাজেই আমাদের মন বুঝবেন না! এরা এসেছে সব লুটপাট করতে!'

মনে হলো এক লোক সেনোরা অব্রিগনের আত্মীয়, কথা বলে উঠল সে, 'রাজাদের সেই সময় আজ নেই, শেষে রয়ে গেছে শুধু আজকের এই জায়গাটা। ওই দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করেছেন সাহসী সব পুরুষ ও নারী। ওই ঢিবিগুলোর ভেতরে আছেন মস্ত বড় সব নেতা, বীর ও বীরাঙ্গনারা। এখানে এসে তাঁদেরকে অসম্মান দেখানো বা কবর খুঁড়ে লুটপাটের সাহস পায়নি কেউ। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে দ্বিতীয় রাজা এখানে সবাইকে নিয়ে উঠে এলে প্রথম রাজার কবর অসম্মান করেননি, তারপর

অন্যসব রাজাও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন আগের রাজাদের প্রতি।'

থামল লোকটা, তারপর রানা ও সোহানা যে ঢিবিতে ঢুকেছিল, ওটার দিকে আঙুল তাক করল। 'মাত্র একবার এখানে উঠে এসেছিল এক আগন্তুক। সে এখন কুকুরের মত ঘুমিয়ে আছে রাজার পায়ের কাছে। তাও এক শ' বছরেরও বেশি হলো। যাঁরা তাকে দেখেছিলেন, তাঁরাও আজ বেঁচে নেই। আজ ওই লোককে দেখলাম আমরা। সবাই আমরা জানি, ছোরা আর নিড়ানি দিয়ে ওই লোককে খুন করেছিল শহরের মানুষ। এভাবেই গোপন থেকেছে আমাদের রাজাদের দীর্ঘ ইতিহাস ও সমাধি।'

'দয়া করে থামো, বাছা!' বাধা দেয়ার সুরে বললেন ফাদার মার্টিন। 'আমি হয়তো জন্ম নিইনি এই শহরে, কিন্তু তোমাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি দিন ধরে এখানে আছি। তোমাদের অনেকেই শিশুকালে আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছ। আর তোমাদের অন্তরের জন্যে দায়ী থাকতে হবে আমাকে। তোমরা কি জানো না, যারা ওই লোককে খুন করেছিল, তারা এখন পুড়ছে দাউ-দাউ নরকের আগুনে?'

মাটিতে চোখ রাখল বেশ ক'জন, বেশিরভাগ ক্রুশ চিহ্ন আঁকল বুকে। মাত্র কয়েকজন থুতু ফেলল মাটিতে।

মেকানিক মারাভ ক্ষোভ নিয়ে বলল, 'শত শত বছর ধরে মাদ্রিদ বা গুয়াতেমালা সিটির ক্ষমতাশালীদের দয়ার ওপর ভর করে বাঁচতে হচ্ছে আমাদেরকে। তারা কাগজে সই দিলেই অন্যরা এসে আমাদের শাসক হয়ে ওঠে, সব কেড়ে নিয়ে যায়— এমন সব অত্যাচারী লোক, যারা নিজ চোখে কখনও দ্যাখেওনি আমাদেরকে! আমরা এদেরকে যেতে দিলে এখানে হাজির হবে তারা, কেড়ে নেবে সব। আমরা শুধু রক্ষা করছি নিজেদের বাপ-দাদার কবর, এ ছাড়া আছেই বা কী আমাদের!'

বড় করে দম নিয়ে শুরু করতে গেলেন ফাদার মার্টিন, কিন্তু

কথা বলে উঠল রানা, 'এক মিনিট, ফাদার।' মানুষগুলোর দিকে ঘুরে চাইল ও। 'আমি বা আমার স্ত্রী এখান থেকে কিছুই সরিয়ে নিইনি। আমরা কাজ করি ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের হয়ে, আর তাঁরা চাইছেন শুধু মায়াদের দেশের মানুষের গভীর জ্ঞান। এবং এ কারণেই এখানে এসেছি আমরা। কিন্তু আমাদের মত নয় সবাই, তাদের কারও কারও হাতে পৌঁছে গেছে ওই মানচিত্র। তারাও জেনে গেছে এখানে আছে বেশ কিছু সমাধি। আর তাদেরই একজন হচ্ছে এলেনা হিউবার্ট। আপনারা যদি আমাদেরকে খুনও করেন, ওই মেয়ে একদল খুনি নিয়ে এসে এই জায়গা খুঁজে বের করবে। যা আছে, সবই খুঁড়ে নিয়ে যাবে। থাকবে শুধু ওই মাটি।' নালার শক্ত মাটি দেখাল রানা।

ওর কথাগুলো ভাবিয়ে তুলতে শুরু করেছে সবাইকে। সবার মনে সন্দেহ ও দ্বিধা। বিড়বিড় আওয়াজে নিজেদের মাঝে কথা চালু হলো। আরও যেন রেগে উঠছে সবাই। তর্ক-বিতর্ক চলছে।

অধিত্যকার শুরু থেকে ভেসে এল নতুন কণ্ঠ: 'সেনর রানা ঠিকই বলেছেন। ওঁর কথা মেনে নাও তোমরা।'

ঘাড় ফিরিয়ে সবাই দেখল উঠে এসেছেন ডাক্তার কার্লোস প্যাডিয়ো।

'আপনি এখানে কী করছেন?' জানতে চাইল মুদি দোকান মালিক র‍্যাডবার্ন ইউবিনা।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর প্যাডিয়ো। 'টের পেলাম শহরে লোক অনেক কম, তাই বাচ্চাদের কাছে জানতে চাইলাম এর কারণ কী। আর আগেও খেয়াল করেছি, একদল লোক আগ্নেয়াস্ত্র বা ধারালো জিনিস নিয়ে রওনা হলে ডাক্তারের কাজের শেষ থাকে না।'

'এরা কি আপনার বন্ধু নাকি?' জানতে চাইল ইউবিনা।

'দ্বিতীয়বারের মত তাঁদেরকে দেখছি,' বললেন ডাক্তার। 'কিন্তু পছন্দ করার মতই মানুষ এঁরা। এর কারণ জানতে চাও?

দেখাচ্ছি।' হাঁটতে শুরু করে রানার পাশে পৌঁছে গেলেন তিনি। রানার শার্টের তলা থেকে আস্তে করে বের করলেন সেমি-অটোমেটিক পিস্তল।

নিচু স্বরে আলোচনা শুরু হয়েছে সবার মাঝে।

বাটন টিপে পিস্তলের ম্যাগাযিন বের করে নিলেন ডাক্তার, ওটা দেখে নিয়ে আবারও সড়াৎ আওয়াজে পিস্তলে জিনিসটা ভরে রেখে দিলেন রানার শার্টের নীচের ব্যাণ্ডে। সোহানার শার্ট সামান্য উঁচু করে দেখিয়ে দিলেন পিস্তল। 'বহু বছর ধরে ডাক্তার বলেই, অনায়াসেই চোখে পড়ে মানুষের শরীরের কোন্ জায়গাটা তার নিজের নয়।' শহরবাসীর দিকে ফিরলেন। 'তোমাদের কেউ কেউ এঁদেরকে খুন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। কিন্তু এঁরা চাইলে তোমাদের বেশিরভাগকেই খতম করে দিতে পারতেন। তা তাঁরা চাননি। বন্ধুত্বপূর্ণ কাজে এসেছেন, তাই বলি এমন কিছু কোরো না, যাতে ওই মনোভাব পাল্টে যায়।'

রানার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, অন্য হাত সোহানার কাঁধে, হাঁটতে শুরু করলেন পাহাড়ি পথের দিকে। নেমে যাবেন শহরে।

'দাঁড়ান!'

থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরে চাইল ওরা তিনজন।

আবারও সেনর ইউবিনা। 'সত্যিই হয়তো এঁদের ছেড়ে দেয়াই উচিত। কিন্তু সিদ্ধান্তের জন্য সময় লাগবে আমাদের।'

হৈ-হৈ করে উঠল প্রায় সবাই। কেউ কেউ খুশি, আবার কেউ স্বস্তি পেয়েছে, এখনই ভয়ঙ্কর কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে না। ছুটে এসে ডাক্তার, রানা ও সোহানাকে ঘিরে ফেলল তারা, নিয়ে চলল উপরের এই দুর্গ থেকে নীচের শহরে।

প্রধান সড়কে পৌঁছে রানা ও সোহানাকে পুরনো একটা অ্যাডোবি দালানে নিয়ে গেল লোকগুলো। বাইরের দিকে রয়েছে একটা বড় ঘর। আসবাবপত্র বলতে একটা টেবিল ও কয়েকটা

চেয়ার ছাড়া কিছুই নেই। আরেক দেয়ালে বড়, ভারী একটা দরজা। ওটার ওপাশে লোহার শিকওয়ালা তিনটে সেল। প্রতিটি সেলের লোহার দরজায় একটা করে প্যাডলক। ডানদিকের সেলে রানা ও সোহানাকে ঠেলে দেয়া হলো। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল এক লোক। কিছুক্ষণের ভিতর ফাঁকা হয়ে গেল দালান।

এবার সেলব্লকে এসে ঢুকলেন ফাদার মার্টিন, বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, 'রানা, সোহানা, আমি সত্যিই খুব লজ্জিত। ওদের সবার হয়ে ক্ষমা চাইছি। ওরা ভাল মানুষ, ঠিকই বুঝবে অন্যায় হয়েছে।'

'আমিও তা-ই আশা করি,' বলল সোহানা।

রানা বলল, 'ফাদার, দয়া করে দেখবেন, যেন হাওয়া না হয়ে যায় আমাদের ব্যাকপ্যাক?'

'সবই বাইরের ঘরে রাখা হয়েছে। কিছু লাগলেই সেনোরা অব্রিগনকে বলতে দ্বিধা করবেন না।'

'ধন্যবাদ,' বলল সোহানা।

'আরেকটা কথা,' বললেন ফাদার, হাত বাড়িয়ে দিলেন শিকের ফাঁক দিয়ে।

শার্টের তলা থেকে পিস্তল নিয়ে যাজকের হাতে দিয়ে দিল রানা ও সোহানা। সব চলে গেল তাঁর কোটের পকেটে। ফিরতি পথে রওনা হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ। এসব নিরাপদেই থাকবে চার্চে।'

ফাদার মার্টিন যাওয়ার এক মিনিট পর বড় কাঠের দরজা খুলে হাজির হলো সেনোরা অব্রিগন, হাতের ট্রেতে সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক ও গ্লাস। শিকের নীচের ফাঁক দিয়ে ট্রে ঠেলে দিল।

'গ্র্যাসিয়াস, সেনোরা অব্রিগন,' নরম স্বরে বলল সোহানা।

'একঘণ্টা পর ডিনার আনব. আর সারারাত বাইরেই পাবেন.' বলল মহিলা। 'ডাক দিলেই হাজির হব।'

'কষ্ট করে রাত না জেগে বাড়ি ফিরে ঘুম দিন,' বলল রানা।

'না, এখানে পাহারা দেয়া আমার দায়িত্ব,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল মহিলা। অ্যাপ্রন সরিয়ে দেখিয়ে দিল পুরনো কিন্তু ঠিকভাবে তেল দেয়া লম্বা ব্যারেলের .৩৮ ক্যালিবারের রিভলভার। ওটা তৈরি উনিশ শ' ত্রিশ সালে। 'যদি পালাতে চান, কাউকে থাকতে হবে গুলি করার জন্যে।' অ্যাপ্রন ঠিক করে নিল সে, খালি ট্রে নিয়ে বেরিয়ে গেল। পাঁচ সেকেণ্ড পর ধুপ্ আওয়াজে বন্ধ হলো বাইরের কাঠের দরজা।

উনত্রিশ

ভোরে ঘুলঘুলি দিয়ে সূর্যের কাঁচা সোনালী রোদ পড়ল জেলখানার ভিতর। মাতালের মত দুলছে ফ্যান, কিন্তু সামান্য হাওয়া নেই। ওদের জন্য দু'দিকের দেয়ালে কাঠের দুটো বাঙ্ক আছে, রাতে কোনও একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে রানা ও সোহানা। তবে চোখে আলো পড়তেই জেগে গেল রানা, আধবসা হয়ে দেখল নিজের বাঙ্কে বসে আনমনে ধবধবে ফর্সা পা দোলাচ্ছে সোহানা।

'আবারও তোমাকে বিপদে ফেলে দিলাম, না?' বলল রানা। একটু অবাক হলো। 'এভাবে দেখছ কেন? আমি কি খাঁচার বাঁদর?'

'ভাবছি, ঘুমিয়ে থাকলে কচি বাচ্চার মত দেখায় তোমাকে,' মৃদু হাসল সোহানা। 'কপাল খারাপ, ছবি তুলতে পারলাম না।'

শার্টের বোতাম আটকে নিতে শুরু করেছে রানা। 'মনে হয় না এই জেলখানা ব্যবহার করে। মারাত্মক সব ছারপোকা. এতকাল পর মানুষ পেয়ে গুবরে পোকার মত বড় হয়ে উঠেছে রক্ত খেয়ে।' প্রসঙ্গ পাল্টে নিল, 'এখনও কেউ আসেনি?'

'না। তবে কয়েকবার সামনের দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েছি। কড়া মহিলা বোধহয় ভালভাবেই পাহারা দিচ্ছে।'

কয়েক সেকেণ্ড পর জোর টোকার আওয়াজ হলো সেলব্লকের কাঠের দরজায়। 'আসুন!' গলা উঁচু করল সোহানা।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সেনোরা অব্রিগন, এক হাতে ট্রে, ওটার উপর ঢেকে রাখা দুটো বাসন ও দুই গ্লাস কমলার জুস।

'নক করে ঢুকেছেন বলে ধন্যবাদ,' বলল সোহানা।

'আপনাদের প্রাইভেসি থাকবে না, এমন কথা কেউ বলেনি,' বলল সেনোরা অব্রিগন। 'তবে এখনই ছাড়া পাবেন না।'

'কী ভাবছে সবাই?' জানতে চাইল রানা।

'আপনাদের ব্যাপারে বলা ফাদার মার্টিন আর ডাক্তার প্যাডিয়োর কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে সবাই। বোধহয় দুপুরের পর সভা হবে। তারপর ছেড়ে দেয়া হবে আপনাদেরকে।'

'কপাল ভাল, নাস্তার আগেই ছেড়ে দেয়নি,' মৃদু হাসল রানা। 'খাবারের দারুণ সুবাস আসছে প্লেট থেকে।'

মহিলা শিকের নীচের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঠেলে দিল ট্রে। ওটা তুলে নিয়ে সোহানার বাঙ্কে রাখল রানা।

'চেয়ার থাকলে সুবিধে হতো, কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওই জিনিস কোনও জেলেই নেই।'

'যা করেছেন, সেজন্য অনেক ধন্যবাদ,' বলল সোহানা।

সেলব্লকের দরজা আটকে ওদিকে চলে গেল মহিলা। ঘটাং করে বন্ধ হলো ভারী বল্টু।

মাত্র শেষ হয়েছে ওদের নাস্তা, এমন সময় ভেঙে গেল ছোট্ট শহরের থমথমে নীরবতা। পাহাড়ি উঁচু পথে গুঙিয়ে উঠছে কোনও ট্রাক। একটু পর দেখা দেবে চার্চের পাশের রাস্তায়। ঘ্যাং-ঘ্যাং আওয়াজ তুলছে ট্র্যান্সমিশন। শেষ পথ উঠতে ভীষণ আপত্তি ইঞ্জিনের। তারপর উঠে এসে চার্চের সামনে থামল ট্রাক। কয়েক

সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর গলা ছাড়ল এক লোক। ধুপ-ধাপ আওয়াজে রাস্তায় নামছে কারা যেন। শোনা গেল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

চট্ করে পরস্পরের দিকে চাইল রানা ও সোহানা।

উঁচু, ছোট্ট জানালার কাছে পৌঁছে হাঁটু ভাঁজ করে দাঁড়াল রানা। সিঁড়ির ধাপের মত সামনে রেখেছে দু'হাত। আস্তে করে দুই তালুর উপর উঠল সোহানা। সহজেই ওকে উপরে ঠেলে তুলল রানা।

খপ্ করে জানালার শিক ধরল সোহানা, উঁকি দিল বাইরে।

ট্রাক থেকে নেমেছে ক্যামোফ্লেজ্‌ড্ ফেটিক, টি-শার্ট, খাকি প্যাণ্ট অথবা নীল জিন্স প্যাণ্ট পরনে বেশ কয়েকজন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সদর দরজায় লাথি দিচ্ছে, চিৎকার করে বলছে, সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে রাস্তায়।

'সবাইকে জড় করছে,' বলল সোহানা।

চিন্তিত ও দ্বিধান্বিত চেহারায় যার যার বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে পুরুষ ও নারী, সঙ্গে শিশুরা। রাস্তায় দেখা হচ্ছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে। বড় হয়ে উঠছে ভিড়। পাশের রাস্তাগুলো ধরে ছুটে গেছে একদল সশস্ত্র লোক, তাড়িয়ে আনছে সবাইকে।

'পুরো শহরের সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করাচ্ছে।'

খুলে গেল ট্রাকের ক্যাবের দরজা, বেরিয়ে এল দুই লোক।

'ওই দু'জন!' ফিসফিস করে বলল সোহানা।

'কাদের কথা বলছ?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদেরকে খুন করতে যাদেরকে পাঠিয়েছিল এলেনা। ওই যে স্পেনের দু'জন। একজনের মুখ নীল করে দিয়েছিলে তুমি।'

'কী অবস্থা ওর?'

'রোদে পুড়ে কালো হয়েছে, কিন্তু এখনও মুখ নীলচে, যেন পানিতে ডুবে মরা আরব।'

'এবার দেখা হলে প্রথম সুযোগেই ওকে লাল করে দেব।'

আছড়ে-পিছড়ে ট্রাকের বেডে গিয়ে উঠেছে অ্যাডেলমো লোপেয ও আর্ট ডগসন। মনে হলো ওটাকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করবে। জ্যাকেট থেকে আইনী কিছু কাগজ বের করে স্যাঙাতের হাতে ধরিয়ে দিল ডগসন। আরেক হাতে দিল বুলহর্ন, ওটা মুখে তুলে চেঁচিয়ে উঠল লোপেয, 'টেস্টিং!' ওদিকের পাহাড় থেকে ফিরল প্রতিধ্বনি। এবার কাগজের স্প্যানিশ ভাষা পড়তে শুরু করল সে, 'স্যান্টা মারিয়া দে লস রকাসের সুশীল নাগরিক, এ শহর আছে গুরুত্বপূর্ণ বড় এক আর্কিয়োলজিকাল সাইটের মাঝে। এবং সে কারণেই আগামী পাঁচ দিন পর তোমাদেরকে সরিয়ে নেয়া হবে এই জমি থেকে। কয়েক মাইল দূরের আরেক শহরে বসত করে দেয়া হবে। থাকার বাড়ি পাবে, চাকরি পাবে, আর বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকবে শহরের মালকিনের কাছে।'

ভিড় থেকে সরে কয়েক পা সামনে বাড়লেন এক বৃদ্ধ। পরনে বেকায়দা ফিটিঙের নীল স্পোর্টস কোট ও পুরনো খাকি প্যান্ট। বুড়ো হলেও কণ্ঠে জোর আছে, বললেন, 'আমি নাদিম বেযারানো, স্যান্টা মারিয়ার মেয়র।' শহরবাসীদের দিকে ঘুরে গেলেন তিনি। 'এরা চাইছে আমরা যেন চলে যাই এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে। আমাদেরকে কাজ দেবে ড্রাগসের মাঠে। বাস করতে হবে ব্যারাকে। ওই ব্যারাক তৈরি করেছিল ড্রাগ লর্ড এসে। আর ওখানে থাকার জন্যে যে ভাড়া ধরবে, তাতে কারও পকেটে ফুটো পয়সাও থাকবে না। ফলে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না ওখান থেকে। আমরা আজ যে জমিতে বাস করছি, দু'হাজার বছর ধরেই ওটা আমাদের। কাজেই জমি বিক্রি করে দিয়ে ক্রীতদাস হতে যেয়ো না কেউ।'

বুলহর্নে বলল লোপেয, 'কাগজে সই করবে সবাই, বদলে পাবে নতুন বাড়ি, সেই সঙ্গে নিশ্চিত চাকরি। সেজন্যে স্যান্টা মারিয়া দে লস রকাস শহরের সব জমির দাবি ছাড়তে হবে।'

ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে এল ডগসন, হাতে কাগজ। বৃদ্ধ নাদিম বেযারানোর সামনে থামল সে, পকেট থেকে কলম বের করে কাগজ ও কলম, দুটোই বাড়িয়ে দিল মেয়রের দিকে।

'নাও। তোমাকে দিয়েই শুরু হোক।'

'মেয়রের জমি লিখিয়ে নিতে চাইছে,' বলল সোহানা।

অস্বাভাবিক জোর কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ, 'সই আমি করব না! মরে গেলেও না!'

ট্রাকের উপর থেকে হাতের ইশারা করল একজন। ছুটে গিয়ে মেয়রকে জাপ্টে ধরল চারজন লোক। তাদের একজন মেয়রের দুই বগলের নীচে আটকে দিল দড়ির ফাঁস। টাইট করা হলো ওটা। উঁচু একটা গাছের ডাল থেকে ঘুরিয়ে আনা হলো দড়ির আরেক প্রান্ত।

'হায়, আল্লা!' ফিসফিস করল সোহানা।

'কী করছে?' নীচ থেকে জানতে চাইল রানা।

যে লোক ইশারা দিয়েছিল, তার হাতে উঠে এসেছে পিস্তল, দেরি না করেই গুলি করল মেয়রের মাথায়। শহরের সবার সামনে নেতিয়ে গেলেন মেয়র, মৃত। ভীষণ ভয়ে কেঁদে উঠল কয়েকটা বাচ্চা। গুঞ্জন তুলছে বেশিরভাগ লোক। নীরবে কাঁদছে মহিলারা।

'গুলি কীসের?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা মেয়রকে মেরে ফেলেছে,' বলল সোহানা।

বুলহর্নে বলে উঠল লোপেয, 'কেউ যেন ওখান থেকে লাশ সরিয়ে না নেয়। পাঁচ দিন পর আবার আসব আমরা। যদি দেখি ওখান থেকে সরানো হয়েছে লাশ, তার বদলে অন্য পাঁচজন লোককে লটকে দেব। তোমাদের একজন সই না করলে তার বদলে দশজন লোককে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। তারপর আবারও অনুরোধ করব।'

'কথাটা বুঝতে পেরেছ?' রানাকে বলল সোহানা।

'পরিষ্কার।'

কাছের দালানের সামনে থামল ডগসন। ওটা চার্চ। সামনের দরজায় পিন দিয়ে আটকে দিল কাগজটা। দলের সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকে। চার্চের প্রাঙ্গণ থেকে ঘুরিয়ে নেয়া হলো ট্রাক, টিলা পেরিয়ে রওনা হয়ে গেল ঢালু পথে এসতেনসিয়া মিগুয়েরোর উদ্দেশে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল মহিলারা, পরিষ্কার সবই শুনল রানা-সোহানা।

লাফ দিয়ে মেঝেতে নামল সোহানা। 'ওরা চলে গেছে।'

আধঘণ্টা পর বাইরের অফিসে কয়েকটা পায়ের আওয়াজ পেল ওরা। খুলে গেল সেলব্লকের দরজা। ভিতরে এসে ঢুকেছে সেনোরা অব্রিগন, ফাদার মার্টিন, ডক্টর প্যাডিয়ো, মেকানিক মারাভ, রেস্টুরেন্টের মালিক সেনর জেইম সালাযার এবং আরও দুই খামার মালিক। শেষের এরা রানা ও সোহানার কবরের জন্যে মাটি খুঁড়বে বলেছিল। সবার আগে মুখ খুললেন ফাদার মার্টিন, 'আপনারা কি জানেন কী হয়েছে?'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল সোহানা।

ওদের সেলের দরজার তালা খুলে দিল সেনোরা অব্রিগন, সরিয়ে দিল লোহার কবাট। ওরা সবাই এসে ঢুকল বাইরের অফিসে। টেবিলের পাশে রানা ও সোহানার ব্যাকপ্যাক। বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার প্যাডিয়ো, তাঁর অফিস দুই দালান দূরে। ফিরলেন চাকাওয়ালা স্ট্রেচার নিয়ে। ওটা ঠেলতে শুরু করে চলে গেলেন গাছের নীচে। যাওয়ার আগে গাছের উঁচু ডালে মেয়রের লাশ ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে ডগসনরা। লাশটা উঁচু করল রানা ও ডাক্তার, ছোরা দিয়ে দড়ি কেটে দিল এক খামার মালিক। শুইয়ে দেয়া হলো মেয়রের লাশ। মৃতদেহের উপর বিছিয়ে দেয়া হলো সাদা চাদর। নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তারের ক্লিনিকে। পুরো সময় চুপ করে সব দেখল শহরের মানুষগুলো।

অফিসে ঢুকেই বলল সোহানা, 'এদিকে স্থানীয় সরকার নেই? তাদেরই তো এই সমস্যা মোকাবিলা করার কথা।'

'স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি সেনাবাহিনী,' বললেন ফাদার মার্টিন।

'পুলিশ?'

'তাদেরকে দেখেছেন আপনারা,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। 'তারাই ড্রাগসের মিথ্যা নালিশ শুনে আপনাদেরকে জেলে ভরতে চেয়েছিল। তারা খুনিদের হয়ে কাজ করবে।'

'সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন গুয়াতেমালা সিটির ন্যাশনাল পুলিশের সঙ্গে,' বলল রানা।

'একটু আগে স্যাটালাইট ফোনে তাদের সঙ্গেই কথা বলেছি,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। 'তারা জানাল, দুই-এক মাসের ভেতর এখানে কোনও ইন্সপেক্টর পাঠাবে।'

'একজন ইন্সপেক্টর?' অবাক হলো সোহানা।

'হ্যাঁ, একজন। আসতে সময় লাগবে তার।'

'ও, ভুলে গিয়েছিলাম,' বললেন ফাদার মার্টিন। 'আপনাদের জিনিস বুঝে নিন।' কোট থেকে পিস্তল ও ম্যাগাযিন বের করলেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন রানা ও সোহানার দিকে।

'ধন্যবাদ,' পিস্তল নিল সোহানা। গুঁজে রাখল কোমরে।

রানারটা চলে গেল পেটের ব্যাণ্ডের নীচে।

'কিছুক্ষণ পর তৈরি থাকবে আপনাদের গাড়ি,' জানাল মেকানিক মারাভ। পকেট থেকে ত্রিশ ডলার নিয়ে রানার হাতে দিতে চাইল। 'সার্ভিসিঙের জন্যে কিছু লাগবে না। আমরা যা করেছি সেজন্য আমি দুঃখিত। আপনারা যখন বড় শহরে ফিরবেন, হয়তো মানুষকে বলবেন আমরা অত খারাপ লোক নই।'

টাকা নিয়ে আবারও মেকানিকের শার্টের পকেটে গুঁজে দিল রানা। 'বিনা পয়সায় কাজ করিয়ে নিলে আমার ওপর ভীষণ

রাগবেন সেনোরা রানা।'

দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকল ক'জন। তাদের চিনল রানা ও সোহানা। মনে হলো সবার হয়ে কথা বলবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রেস্টুরেণ্ট মালিক জেইম সালাযারের উপর।

'সেনর-সেনোরা মাসুদ রানা,' শুরু করল সে, 'আপনারা আগেই বলেছিলেন এমনই হবে। ওই লোকগুলো এসেছিল এসতেনসিয়া মিগুয়েরো থেকে। শান্তিপূর্ণভাবে পুরনো দুর্গ না চেয়ে চোখের সামনে খুন করেছে আমাদের মেয়রকে। কেড়ে নিতে চায় এই শহর। আমাদের পরিবার, বাড়ি, জমি ও দুর্গ— সবই চাই তাদের। কখনও সরকারের কাছে নালিশ করতে পারব না, কারণ তারা আমাদেরকে আটকে রাখবে এসতেনসিয়ায়। যদি কারও কাছে সহায়তা চাই, খুন করে ফেলবে আমাদের সবাইকে। নালিশ করার মত কেউ থাকবে না। আমরা ভাবছিলাম... যদিও আমাদের সেই অধিকার নেই, তারপরও... সেনর রানা, সেনোরা রানা, আপনারা কি সাহায্য করবেন আমাদের লড়াইয়ে?' শেষদিকে এসে করুণ হয়ে গেল লোকটার চেহারা।

একবার রানাকে দেখে নিয়ে জোর দিয়ে বলল সোহানা, 'যা ঘটল, তারপর অবশ্যই সাহায্য করব! আমরা থাকছি এই শহরে।'

'আমরা কিন্তু সৈনিক নই, আর সঙ্গে একদল সৈনিকও নেই,' বলল রানা। 'তবে নিজেদের সাধ্যমত করব।'

'আপনারা ওই ড্রাগসের মাঠে লড়াই করেছেন,' বললেন ডাক্তার প্যাডিয়ো। 'এবং ওরা জিততে পারেনি।'

'ওরা হামলা করেছিল, আর তারপর প্রথম সুযোগে বেরিয়ে এসেছিলাম,' বলল সোহানা।

'বারোজন সশস্ত্র ডাকাতকে শেষ করে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু আপনাদের কিছুই হয়নি,' বললেন ডাক্তার। 'এটা কিন্তু মুখের কথা নয়।'

'কিন্তু একটু আগে যারা এল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'হেভিলি আর্মড় তারা। সঙ্গে আধুনিক সব অস্ত্র। অনেকেই সেনাবাহিনী থেকে প্রশিক্ষিত, হামলা করবে সংগঠিত দল নিয়ে। এই শহর টিকিয়ে রাখতে চাইলে দেশের কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইতে হবে।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন প্যাডিয়ো, 'হয়তো পাব সহায়তা। অন্তত চেষ্টা তো করবই। কিন্তু নিজেদেরও লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

'ঠিক,' বলল জেইম সালাযার। 'আমরা লড়তে রাজি, মাত্র পাঁচ দিন পর আবারও ফিরবে ওরা। তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে সবাইকে।'

'আমার কাজ শুরু করব কয়েকটা ফোন কল দিয়ে,' বলল রানা। সোহানার কাঁধ জড়িয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

'আপনারা সত্যি এই শহরে আমাদের পাশে লড়বেন?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার প্যাডিয়ো।

'মনে কোনও সন্দেহ রাখবেন না, ডক্টর,' বলল সোহানা। 'সেনর রানাকে এত গম্ভীর দেখেই বুঝতে পারছি, পথ বের করার জন্যে গভীরভাবে চিন্তা করছেন তিনি।'

মহিলাদের সঙ্গে সোহানা গেছে মেয়রের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে। এ সময়ে কয়েক জায়গায় ফোন শেষে গুয়াতেমালা সিটির বাংলাদেশ এমব্যাসিতে ফোন দিল রানা। কথা বলতে চাইল সেকেণ্ড অফিসার মুস্তাফিজা হোসেন মুক্তার সঙ্গে।

এক মিনিট পর শুনল মেয়েটির কণ্ঠ: 'মাসুদ ভাই! কী খবর? সব ঠিক তো?'

'কিছুই ঠিক নেই, মুক্তা।'

'কী হয়েছে, মাসুদ ভাই?'

'আমরা আছি স্যাণ্টা মারিয়া দে লস রকাস শহরে, এসতেনসিয়া মিগুয়েরো থেকে বিশ মাইল দূরে।' এবার এলেনা হিউবার্টের পাঠানো ট্রাক ভরা সশস্ত্র দলের কথা জানাল রানা। বাদ পড়ল না মেয়রের লাশের খবর। 'ভারতীয় ধচাপচা সিনেমার অট্টহাসি দেয়া ভিলেনের মতই এসে শহর, শহরের মানুষের জান, তাদের জমি, সবই কেড়ে নিতে চাইছে।'

'বলেন কী, মাসুদ ভাই!' গম্ভীর হয়ে গেল মুক্তা, 'বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। সময় বেঁধে দিয়েছে বললেন। কবে চলে যেতে হবে?'

'পাঁচ দিন পর। চুক্তি করতে হবে তার আগে। তারপর সবাইকে ছাগলের মত তাড়িয়ে নিয়ে ভরবে ওই ড্রাগসের খামারে।'

'পাঁচ দিন...' বিড়বিড় করল মুক্তা। কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায ছাড়া আপাতত কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে তিরিশ দিনের জন্য। রানাকে জানাল কথাটা।

'ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়,' বলল রানা।

'এসব কাকতালীয় বিষয় সৃষ্টিতে দক্ষ অঘটন পটীয়সী এলেনা হিউবার্ট,' বলল মুক্তা, 'পুলিশের হাই র‍্যাংকিং অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলব। কিন্তু এলেনার সঙ্গে আন্দ্রিয়াযের বিরোধের পরিণতি দেখে সতর্ক হয়ে গেছে সবাই। মনে হয় না কেউ কচ্ছপের খোলস থেকে ঘাড় বের করবে।' চুপ হয়ে গেল মেয়েটি, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'অস্ত্র জোগান দেব, তাও তো পারব না। লাইসেন্স ছাড়া ওই জিনিস জোগাড় করতে গেলেই আমাদের এমব্যাসিকে এ দেশ থেকে বের করে দেবে সরকার। এমনিতেই আদালতে এলেনার মামলার শুনানিতে গেছি বলে আমাদের উপর খাপ্পা হয়ে আছে সরকারী-বেসরকারী দলের

হেডমরা। অনেক দূরের দুর্গম, ছোট কোনও গ্রামে সাধারণ মানুষের বারোটা বাজলে তাদের কী?'

'বুঝলাম,' বলল রানা, 'সরকারের কাছ থেকে সাহায্য মিলবে না। যা করার নিজেদেরই করতে হবে। ঠিক আছে, মুক্তা, সময় দিলে বলে অনেক ধন্যবাদ।'

'মনটা ছোট হয়ে গেছে আমার, মাসুদ ভাই,' অন্তর থেকে বলল মুক্তা। 'কিছুই করতে পারলাম না। ...আপনারা তো চলে আসছেন ওখান থেকে?'

'না। আমরা থাকব।'

'কিন্তু...'

'এটা সোহানা আর আমার সিদ্ধান্ত। ওদের ছেড়ে পালিয়ে এলে ছোট হয়ে যেতাম নিজেদের কাছেই।'

চুপ করে আছে বুদ্ধিমতী মেয়েটি। বুঝতে পারছে, বিনা দ্বিধায় নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিচ্ছে মাসুদ ভাই আর সোহানা আপা।

'ভাল থাকো, মুক্তা,' সহজ সুরে বলে ফোন ছেড়ে দিল রানা।

ত্রিশ

এসতেনসিয়া মিগুয়েরো।

মিগুয়েরোদের হিসাব বিভাগের প্রাচীন, প্রকাণ্ড অফিসঘরে অপেক্ষা করছে অধৈর্য এলেনা হিউবার্ট, সামনে মস্ত বড় ডেস্ক। মাথার উপরে ছাতে মস্ত ফ্যান। ওটার সঙ্গে আছে লম্বা দণ্ড, গেছে বাইরে, আর ওখানে আছে দীর্ঘ ফিতা— আগে ওই ফিতা টেনে ফ্যান ঘোরাত ক্রীতদাসরা। আজকাল অবশ্য ফ্যান চলে ইলেকট্রিক

মোটরে। আরামদায়ক নরম চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে ভাবছে এলেনা। বড় করে বারকয়েক দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করতে চাইল। আধঘণ্টা আগে ফোন করেছে আর্ট ডগসন। বেশিক্ষণ লাগবে না তার ফিরে আসতে। একটু পর নিজের আন্দাজ ঠিক দেখে খুশি হয়ে উঠল এলেনা। ওই যে, হাইওয়েতে ট্রাকের আওয়াজ!

ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে নেমে এল ড্রাইভওয়েতে।

বেশিরভাগ সময় নীরব থাকে এই বাগানবাড়ি। ব্যস্ত সময় কাটে শুধু ফসল বোনা আর তোলার সময়। এক সপ্তাহ আগেই ফসল কেটে নিয়ে গেছে ড্রাগ লর্ডের চাষীরা।

চেয়ার ছেড়ে একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এলেনা। দূরে গহীন সবুজ অরণ্য। ওরই মত রহস্যময়।

এলেনার পরনে ঢিলা সাদা সিল্কের ব্লাউস, সুতির কালো প্যাণ্ট, পায়ে হাঁটু সমান রাইডিং বুট, মাথার পিছনে ঝুলছে চ্যাপ্টা ব্রিমের হ্যাট। কোমরের কালো চামড়ার বেল্ট ঠিক করে নিল। ডান উরুর পাশেই হোলস্টারে পিস্তল, যেন কুইক ড্র গান ফাইটের জন্য তৈরি। ঘর থেকে বেরিয়ে কাঠের চওড়া বারান্দায় আসতেই থেমে গেল ওর চামড়ার বুটের হিলের ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ।

নুড়ি পাথরের ড্রাইভ ধরে আসছে ট্রাক। থামল বাড়ির সামনে। ট্রাকের বেড থেকে লাফিয়ে নেমে এল একদল লোক। সমর্থ মনে হলো তাদেরকে দেখে। সবার সঙ্গে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। কোমরের খাপে ছোরা। ট্রাকের পাশে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। লোভী চোখ এলেনার উপর। ক্যাব থেকে নেমে ওর দিকে হেঁটে এল আর্ট ডগসন ও অ্যাডেলমো লোপেয।

'আপনার কথার সুরে মনে হলো কোনও সমস্যা হয়নি,' বলল এলেনা।

'মন্দ হয়নি আমাদের রেকি,' বলল ডগসন। 'সবাইকে জড়

করে জানিয়ে দিয়েছি, চাইলেই যা খুশি করতে পারবে না ওরা।'

'গুড।'

নিচু স্বরে বলল ডগসন, 'এক বুড়ো বলছিল সে মেয়র, বক্তৃতাও শুরু করেছিল, কিন্তু গুলি করে মেরে তাকে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছি। বলে দেয়া হয়েছে, কেউ যদি লাশ সরায়, পাঁচ দিন পর গিয়ে আরও পাঁচটা লাশ ঝোলাব।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এলেনার চোখ। বাচ্চাদের মত বার কয়েক হাত তালি দিল। 'চমৎকার! এই বুদ্ধি আমার মাথায়ই আসেনি। ওরা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে?'

'বলা কঠিন। পুরুষদের মুখ পাথরের মতই কঠিন ছিল।'

'কয়েক দিন মেয়রের লাশ পচলে নরম হয়ে আসবে সবাই,' ডগসনের সঙ্গী লোকগুলোর দিকে ঘুরে স্প্যানিশে বলল এলেনা, 'আপনারা আপাতত বিশ্রাম নিন। মিস্টার লোপেয আপনাদের সম্মানী বুঝিয়ে দেবে, আর এদিকে মিস্টার ডগসনের সঙ্গে জরুরি কথা সেরে নেব আমি। মিস্টার লোপেয, ডেস্কের ওপর পাবেন টাকার কালো ব্রিফকেস।'

ডগসনকে নিয়ে লাল মার্সিডিসের দিকে পা বাড়াল এলেনা। গাড়িটা আছে বেশ দূরে। 'আপনার এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ছাড়া একেবারেই পানিতে যেত আমার সব টাকা। ভালভাবেই জানি, খুব খাটুনি দিতে হচ্ছে আপনাকে। তবে প্রতিটি কাজের জন্যে পাবেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক। শুধু তা-ই নয়, যে বিশ্বস্ততা অর্জন করেছেন, সেজন্যেও দেয়া হবে কয়েক গুণ মুনাফা।'

'আমার এসব ঝুঁকি আপনাকে অর্থনৈতিকভাবে সন্তুষ্ট করবে, তা-ই চাই।'

'যেভাবে হোক জিততে হবে আমাদেরকে। এসব অশিক্ষিত ইণ্ডিয়ানরা বসে আছে মস্ত এক মায়ান সাইটের বুকের ওপর। ওই সাইট থেকে বহু কিছুই পাওয়ার আছে। আর ওটার খবর প্রকাশ

হয়ে যাওয়ার আগেই ঝটপট সব সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'আমি ভাবছি, সব সরিয়ে আনার পর ঝামেলা করতে পারে অ্যামব্রোসিয়ো। কেড়ে নিতে পারে সব। এখানে তার পাঠানো মার্সেনারিদের কারণে আমরা থাকব দুর্বল অবস্থানে।'

'ভাববেন না,' বলল এলেনা। 'তাকে যতটা দরকার আমার, তার চেয়ে ঢের বেশি আমাকে দরকার তার। আমার জমি পেয়েছে বলে ব্যবসা চালাতে পারছে। আপনি যতক্ষণ আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকছেন, মনে রাখবেন আপনি পুরো নিরাপদ।' থমকে দাঁড়িয়ে গেল এলেনা। 'আমার ড্রাইভার নতুন, এখনও জানি না ওকে বিশ্বাস করা যায় কি না। কাজেই আরও কিছু বলার থাকলে এখানেই বলে ফেলুন।'

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এলেনা, আর ওই কয়েক মুহূর্তে নতুন কিছু দেখল ডগসন তার চোখে-মুখে।

ওই মেয়ের রূপ, অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা, ব্যাঙ্ক ভরা টাকা, মস্ত সব ব্যবসা ও বিপুল সম্পত্তি... ডগসন বুঝে গেল, মাত্র একবার সুযোগ পেয়েছে মেয়েটার অন্তরের খুব কাছে যাওয়ার, এবং কয়েক সেকেণ্ড পর এ সুযোগ না-ও থাকতে পারে। যদি ঝুঁকি নিতে হয়, এখনই। কিন্তু ওই দু' সেকেণ্ডে এলেনার হাত ধরল না ডগসন, আবেগঘন সুরে বলল না, 'এলেনা, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল হতাশ এলেনা, ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়ার আগে নিজেই গিয়ে উঠল পিছনের সিটে। আর দেখা গেল না তাকে টিণ্টেড কাঁচের ওপাশে।

মার্সিডিস নিয়ে বড় একটা অর্ধচন্দ্র তৈরি করে নুড়ি পাথরের রাস্তায় গিয়ে উঠল ড্রাইভার। ফিরে চলেছে গুয়াতেমালা সিটি লক্ষ্য করে।

একত্রিশ

শহরে এমন কেউ রইল না যে উপস্থিত হলো না মেয়রের শেষকৃত্যে। কোনও বিষয়ে কাউকে বিব্রত করতেন না বলে জনপ্রিয় ছিলেন মেয়র নাদিম বেযারানো, তাঁর একমাত্র কাজ ছিল প্রতি বছর গুয়াতেমালা সিটিতে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো দরকারী কাগজে সই করে দেয়া। এতই ভরসা করত সবাই, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলল: আমাদের মেয়র এখনও অফিসের দায়িত্বে থাকবেন না?

বহু বছর হলো কোনও নির্বাচন হয়নি, সবাই ধরে নিয়েছিল, ঝামেলার ভোটাভুটি করবার দরকার কী, আছেই তো মেয়র।

মৃতের জন্য যা কিছু বলা উচিত, সবই বললেন ফাদার মার্টিন, তারপর গ্রামের সবাইকে নিয়ে গেলেন হাজার বছরের পুরনো গোরস্তানে। এ বছরের জন্য তৈরি নতুন কবরের সারির একটা কবরে শুইয়ে দেয়া হলো মেয়রকে। মাথার কাছে পাথরের স্ল্যাবে রইল তাঁর নাম ও মৃত্যুর তারিখ। সবার উদ্দেশে এখানেও বক্তৃতা দিলেন ফাদার মার্টিন। জানালেন, মেয়র ছিলেন সাহসী মানুষ, সৎ ছিলেন, কখনও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হননি, কারও প্রতি সামান্যতম পক্ষপাত ছিল না তাঁর মধ্যে; কাজেই সন্দেহ নেই অচিরে তাঁর আত্মাকে স্থান করে দেয়া হবে স্বর্গে।

সময় এলে মেয়রের ভাই বৃদ্ধ মাফটালি মাটি দিয়ে ভরে দিলেন ভাইয়ের কবর। এরপর সবাইকে আবারও চার্চে ফিরতে বললেন ফাদার মার্টিন। হঠাৎ করে ঘাড়ে এসে পড়া মস্ত বিপদের বিষয়ে ওখানে সভা হবে।

চার্চের প্রাঙ্গণে পৌঁছবার পর সবাই মাটিতে বসে পড়লে ফাদার মার্টিন দু'চার কথা শেষে বললেন, 'এবার জরুরি বিষয়ে কথা বলবেন ডাক্তার প্যাডিয়ো।'

কোনও জটিলতার দিকে না গিয়ে সহজ সুরে কথা শুরু করলেন ডাক্তার, 'আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলে দিয়েছে, ইন্সপেক্টর পাঠাতে লাগবে কমপক্ষে এক মাস।'

'কিন্তু, স্যর, আমাদের হাতে আছে মাত্র পাঁচ দিন,' ডুকরে কেঁদে উঠল এক মহিলা।

আরেকজন বলল, 'আমরা এখন কী করব?'

'মাত্র দুটো কাজ করতে পারি। কাগজে সই করে চলে যেতে পারি এসতেনসিয়াতে কাজ করতে, অথবা লড়তে পারি আমরা। তোমাদেরই ঠিক করতে হবে কী করবে। সিদ্ধান্ত তোমাদের। কিন্তু নিজ চোখে দেখেছ, কীভাবে খুন করেছে মেয়রকে। আমি হলে এক পয়সা দিয়েও ওদেরকে বিশ্বাস করতাম না। একবার এসতেনসিয়ায় তোমাদেরকে বাগে পেলে আর কোথাও যেতে পারবে না। তার চেয়েও বড় কথা, আর কখনও লড়তে পারবে না। রুখে দাঁড়াতে চাইলেই খুন করবে।'

'আমাদেরকে লড়তে হবে!' বলে উঠল বেশ কয়েকজন। 'এ ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই!'

'তৃতীয় একটা উপায় আছে,' বললেন ফাদার মার্টিন। 'আমরা সব গুছিয়ে নিয়ে অন্য কোনও শহরে পালিয়ে যেতে পারি। হয়তো দুই-তিন মাস লুকিয়ে থাকলাম। আশা করলাম, এর ভেতরে ব্যবস্থা নেবে সরকার।'

'সেক্ষেত্রে দুটো শহরের মানুষ বাড়ি-ছাড়া হবে,' বলল মেকানিক মারাভ। 'আর একবার আমরা শহর ছাড়লে আমাদের বাপ-দাদার কবর খুঁড়ে সব নিয়ে যাবে ওরা। পুড়িয়ে দেবে আমাদের বাড়িঘর আর মাঠের ফসল। আর কখনও মাজা সোজা

করে দাঁড়াতে পারব না আমরা।'

এই কথার পর আরও কয়েকজন তাদের বক্তব্য দিল। সবার কথা মোটামুটিভাবে একই, পালিয়ে গিয়ে লাভ নেই, বরং সব ফেলে যাওয়া আরও বিপজ্জনক। চিন্তাই করা যায় না, এক লোভী মেয়েলোকের কারণে শহরের সব লিখে দিতে হবে, কাজেই পথ থাকছে মাত্র একটা— বাঁচতে চাইলে লড়তে হবে ওদেরকে।

সবার মতামত তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার প্যাডিয়ো বললেন, 'এবার আমরা শুনব সেনর-সেনোরা মাসুদ রানা কী করতে চান।'

আলাপের সময় একটা কথাও বলেনি রানা বা সোহানা, এবার উঠে দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'আপনারা যদি লড়তে চান, পাশেই পাবেন আমাদের দু'জনকে। সেক্ষেত্রে আগামীকাল সকাল সাড়ে ছয়টার সময় উপস্থিত হবেন চার্চে। যাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, অস্ত্র আর গুলি সঙ্গে রাখবেন। আমাদের ঠিক করে নিতে হবে রণকৌশল।'

পরদিন সকাল সোয়া ছয়টায় চার্চের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল রানা ও সোহানা। তার কয়েক মিনিট পর হাজির হলো কয়েকজন। এরা মাথা-গরম সেই দল, যারা অধিত্যকায় রানা ও সোহানাকে খুন করতে চেয়েছিল। একটু পর এল শহরের আরও অনেকে। তাদের মাঝে রয়েছে ব্যবসায়ী ও খামার-মালিক। সঙ্গে করে স্ত্রী নিয়ে এসেছে এরা। বাদ পড়েনি ছেলে-মেয়েরাও। মজুর থেকে শুরু করে বৃদ্ধরাও এসে জড় হলো চার্চের প্রাঙ্গণে।

সাড়ে ছয়টার সময় ভরে গেল প্রাঙ্গণ ও সড়কের এক অংশ। মার্সেনারিরা এলে এত লোক হয়নি। সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। দীর্ঘ হলো লাইন। এবার রানা বলল, 'আপনারা এক এক করে চার্চের সিঁড়িতে এসে আমাদের দু'জনের সঙ্গে কথা

বলবেন। আমরা বাছাই করে নেব কারা লড়াই করবে।'

পাঁচ মিনিট পর শুরু হলো ইণ্টারভিউ।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনার আগ্নেয়াস্ত্র আছে? দেখান। আপনি কি শিকারি? ঠিকভাবে গুলি লাগাতে পারেন?'

যখন কারও কাছে শুনল, তার অস্ত্র নেই, জানতে চাইল, 'আপনি এক ছুটে এক মাইল দৌড়াতে পারেন? লড়তে চান? যদি কোনও জাগুয়ারের সঙ্গে লড়তে হয়, আগে কোন্ অস্ত্র হাতে তুলে নেবেন?'

মহিলারা কথা বলবার জন্য বেছে নিল সোহানাকে।

জেনে নিল সোহানা: 'আপনার বয়স কত? আপনি কি বিবাহিত? বাচ্চা আছে? ওদের নিরাপদ রাখতে লড়তে চান? আপনি কি সুস্থ এবং নিজেকে শক্ত মনে করেন? আগে কখনও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছেন?'

সবচেয়ে কঠিন হলো কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীদের ইণ্টারভিউ নেয়া। তবে হাল ছাড়ল না রানা ও সোহানা। অতীতে প্রতিটি দেশের সেনাবাহিনীতে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হতো পনেরো থেকে বিশ বছরের তরুণদেরকে। কাজেই তাদের দিকে বেশি মনোযোগ দিল ওরা।

সকাল দশটার সময় চার্চের সিঁড়িতে রইল শুধু রানা ও সোহানা। শহরে আগ্নেয়াস্ত্র বলতে সাতটা রাইফেল, এক শ' চারটা গুলি, আঠারোটা শটগান, প্রতিটির জন্য পঁচিশটা শেলের একটা করে বাক্স— বেশিরভাগই পাখি মারা কার্তুজ। এ ছাড়া রয়েছে নয়টা হ্যাণ্ডগান। একটা .৩৮ কে ফ্রেম রিভলভার, অনেক আগে ব্যবহার করত পুলিশ বাহিনী। সেনর সালাযারের কাছে পাওয়া গেল পুরনো .৩৮ ক্যালিবারের কোল্ট, দুটো .৩২ ক্যালিবারের পিস্তল।

গ্রামবাসীর দিকে চেয়ে আছে রানা ও সোহানা, হতাশ।

'ঠিক আছে,' সবার উদ্দেশে বলল রানা, 'এবার ঠিক করতে হবে কীভাবে লড়ব আমরা। প্রশিক্ষিত সৈনিক, তাদের কৌশল বা আধুনিক অস্ত্রের কাছে আপনাদের এসব অস্ত্র টিকবে না। আপনারা, আপনাদের স্ত্রী এবং বাচ্চারা প্রথম হামলার সময়েই খুন হবেন। কাজেই অন্য কৌশল চাই।'

গ্রামবাসীদের চোখে-মুখে বিষাদ দেখল সোহানা। বুকের কাছে বাচ্চা টেনে নিল মা-রা। পরিচিত ও বন্ধুদের দিকে চাইল পুরুষরা। বোবা হতাশা সবার চোখে।

যা অসম্ভব, তা কীভাবে সম্ভব করব? –ভাবল রানা। ডাক্তার প্যাডিয়ো ও যাজক মার্টিনের দিকে ফিরল, 'আসুন, ভেতরে গিয়ে আলাপ করা যাক।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন দু' ভদ্রলোক, রানা ও সোহানার পিছু নিয়ে ঢুকলেন চার্চে। স্প্যানিয়ার্ডদের তৈরি পুরনো টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসল সবাই। সরাসরি রানার উদ্দেশে বললেন ফাদার, 'কী ভাবছেন?'

সামান্য মাথা নাড়ল রানা। 'এখনও জানি না কী করা উচিত। এসব পুরনো অস্ত্র দিয়ে কিছুই করা যাবে না।'

'কোনও কৌশল, বা প্ল্যান?' কালো হয়ে গেল ফাদারের মুখ।

'না, নেই।'

'তা হলে কী করতে বলেন আমাদেরকে?' জানতে চাইলেন ডাক্তার প্যাডিয়ো।

'একমাত্র উপায় পাহাড়ে উঠে ওই ফোর্টে অপেক্ষা করা।'

'কী লাভ তাতে?' সামান্য রেগে গেলেন ডাক্তার। 'ওরা তো সবাইকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তুলবে। তার চেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকাও ভাল। একবার এসতেনসিয়ায় নিয়ে গেলে মাঠে কাজ করাবে সবাইকে, মুক্তি পাবে না কেউ মরার আগে। আর বাচ্চাদের কী হবে? ওদের জন্যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প হয়ে

উঠবে ওই নরক।'

অবাক হয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে সোহানা।

এই রানাকে ও চেনে না। লড়াই না করেই হঠাৎ এভাবে হার মেনে নিল মানুষটা! সোহানা চাপা স্বরে বলল, 'তুমি এটা কী বলছ! পুরনো দুর্গে সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া মানেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়া। তার চেয়ে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াও ভাল।'

'পাহাড়ে উঠতে পারবে না ট্রাক,' বলল রানা।

'কিন্তু ওগুলো থেকে নামবে এক শ'জন সশস্ত্র লোক, শটগান দিয়ে তাদের ঠেকাবে কে, হাসতে হাসতে গুলি করে শেষ করবে সবাইকে— ছাড়া পাবে না শিশুরাও।' ক্ষোভ সোহানার কণ্ঠে।

'কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'তুমি আগেই হেরে গেলে?' রানার চোখে চাইল সোহানা। ছলছল করছে ওর চোখ। 'এই তোমাকে আমি চিনি না। আমি যাকে ভালবাসি, সে অন্য কেউ!'

চুপ রইল রানা। ওর চোখের ওই নির্বিকার দৃষ্টি আগে কখনও দেখেনি সোহানা। বুকে কষ্ট নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল ও, চার্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শুধু বলল, 'তুমিও সারেণ্ডার করছ, রানা?'

পরদিন কাকভোরে গ্রামের সব মা, তাদের বাচ্চা ও বৃদ্ধদের নিয়ে অধিত্যকার দিকে চলল সোহানা। ওখানে পৌঁছে পাথর জড় করবে ওরা, নীচের সরু পথে শত্রুরা উঠে আসতে চাইলে উপর থেকে ওগুলো ছুঁড়বে। নিজে ভাল কোনও অবস্থান খুঁজে নেবে, ঠিক করেছে সোহানা। ওখানে পাথরের দেয়ালের আড়াল থেকে গুলি করবে যতক্ষণ অ্যামিউনিশন থাকে, তারপর বাধ্য হলে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে শেষ করে দেবে নিজেকে।

রানার কথা ভাবতে গিয়ে খচ্-খচ্ করছে ওর মন। কেন

এভাবে পিছিয়ে গেল মানুষটা? বুঝে গেছে মরতেই হবে, তাই এভাবে গুটিয়ে নিল নিজেকে? মহিলাসহ বাচ্চাদের দিকে মনোযোগ দিল সোহানা। ওরা ছেঁড়া পোশাক দিয়ে তৈরি করেছে বেশ কিছু পুতুল, ভিতরে ভরে দেয়া হয়েছে লতাপাতা। দেখতে হয়েছে সত্যিকারের মানুষের মতই।

সবাই অধিত্যকায় উঠে পড়বার পর সোহানা বলল, 'আপনারা যদি চান ছেলেরা একটু নিরাপদে থাকুক, সেক্ষেত্রে ঠিক জায়গায় রাখতে হবে পুতুল। শত্রুরা যেন নষ্ট করে তাদের গুলি। আর সেই সময়ে অন্য দিক থেকে গুলি করব আমরা।'

ওরা খালি বোতল, ক্যান ভরা অকটেন ও ছেঁড়া কাপড় এনেছে। সোহানা ব্যস্ত হয়ে উঠল মহিলাদেরকে মলোটভ ককটেল তৈরি শেখাতে।

'ঠিকভাবে শিখুন। শত্রুরা উঠে আসতে শুরু করলে এটা তাদেরকে কিছুক্ষণ ঠেকাবে। আর রাতে নীচে আগুনের মশাল ফেলব আমরা। ওদিকে কাউকে দেখলেই গুলি করব।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, টুপ করে ডুব দিয়েছে লালচে সূর্য। প্রাচীন দুর্গের পাশের টিলার চূড়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে শহরবাসীদের নেয়া প্রস্তুতি দেখছে মাসুদ রানা। খাড়া পথের প্রথম থেকে শুরু করে উপরের অধিত্যকা পর্যন্ত রয়েছে কমপক্ষে এক শ' পুতুল, কয়েকটা পাথরের দেয়াল। ওগুলোর আড়ালে থাকবে আগ্নেয়াস্ত্রসহ কয়েকজন। শহরের বাড়িগুলোর মাঝে খোঁড়া হয়েছে অন্ধকূপ, একবার চোখা ডাল ভরা ওই বুবি-ট্র্যাপে পড়লে বাঁচবে না কেউ। দুর্গে নেয়া হয়েছে কয়েক সপ্তাহ চলবার মত খাবার ও পানি। ওখানে ছাউনি তৈরি করা হয়েছে বাচ্চা এবং বৃদ্ধদের জন্য। দেয়ালের কাছে কিছু মঞ্চ করে সেখানে রাখা হয়েছে পাথরের স্তূপ ও মলোটভ ককটেল, ছুঁড়ে দেয়া হবে নীচে।

হঠাৎ পাশেই সোহানাকে দেখে সচেতন হলো রানা।

'তুমি নেই তাই কেমন যেন লাগছিল,' নিচু স্বরে বলল সোহানা। 'প্লিয, রানা, গ্রামে একা রয়ে যেয়ো না।'

'কখনও চাইনি অন্ধের মত পিছু নেবে,' নীচে চেয়ে আছে রানা। 'আজ বলছি, অনুরোধ কোরো না, এ-ই আমার অনুরোধ। বিশ্বাস করো, আমি ঠিক থাকব।'

সামনে চলে এসে রানার চোখে চাইল সোহানা। কী যেন দেখল ওর চোখে। 'রানা, আমরা তো কখনও নিজেদের মাঝে কিছু গোপন করিনি।'

'কিছু গোপন করছি না, সোহানা,' নরম সুরে বলল রানা। 'মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছি। তুমিও নিয়েছ। নিয়েছে এ শহরের সবাই। দেখা যাক একসঙ্গে উতরে যেতে পারি কি না।'

'তুমি এমন কিছু জানো, যেটা আমি জানি না— তাই না?'

'এখন কিছুই বলব না, কারণ শেষে হয়তো বোকা বনতে হবে আমাকে।' আস্তে করে সোহানার চুলে আঙুল চালাল রানা। 'তবে যদি বেঁচে থাকি, দেখবে হাজির হয়ে গেছি আমার রাজকন্যাকে পাহাড়ি দুর্গ থেকে নিয়ে যেতে।'

দূরের পাহাড় চূড়ায় এখনও গোলাপি রং, ওদিকে চাইল রানা। 'এবার যেতে হবে আমাকে, সোহানা।'

হাতে হাত রেখে ট্রেইলের কাছে থামল ওরা, এবার নেমে যাবে রানা শহরে। তার আগেই ওর বুকে মুখ গুঁজল সোহানা। কান্নাভেজা স্বরে বলল, 'তুমি খুব নিষ্ঠুর। হয়তো আর কখনও দেখা হবে না আমাদের।'

আলতো করে সোহানার কপালে চুমু দিল রানা, ফিসফিস করে বলল, 'সব শেষ হলে আমাদের জন্যে দারুণ ডিনারের কথা বলে রেখেছি সালাযারকে। ও বলেছে, জীবনের সেরা রান্না রাঁধবে, নইলে ছেড়ে দেবে বাবুর্চিগিরি।'

একবার সোহানার দুই হাত নিজের হাতে নিল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সরু, খাড়া পথে নামতে লাগল শহরের দিকে।

চুপ করে চেয়ে রইল সোহানা। চিন্তামগ্ন রানা জানল না, টপটপ করে অশ্রু ঝরছে মেয়েটির দুই আয়ত চোখ থেকে।

বত্রিশ

ভোর হওয়ার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে রানা। মেয়র মারা পড়বার পর পেরিয়ে গেছে চারটে দিন। আজ পঞ্চম দিন, তাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে স্যাণ্টা মারিয়া দে লস রকাস শহরে হাজির হবে ডগসন ও লোপেয। অবশ্য সেজন্য বসে নেই রানা, শহরেই নেই, ও আছে এসতেনসিয়া মিগুয়েরো থেকে শহরে আসবার খাড়া পথের মাথায়। চোখে জার্মানির তৈরি স্টেইনার ২০ X ৮০ মিলিটারি বিনকিউলার।

দূরে দেখা গেল ধীরে ধীরে আসছে মিলিটারি কনভয়।

একটু আগে এসেছে কয়েকজন। তাদের একজনের কাছ থেকে হেভি মেশিনগান ও আরপিজি পেয়েছে রানা। কানে অত্যাধুনিক ইয়ারপিস। ওটার ফ্রিকোয়েন্সি চট্ করে ধরতে পারবে না কেউ।

'ওরা আসছে,' ভিটেলা রেমারিকের কণ্ঠ শুনল রানা।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওরা। ইটালি গেলে রেমারিকের প্রেজো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে উঠতেই হয় রানাকে, নইলে ভীষণ কষ্ট পায় মানুষটা।

রেমারিকের মতই অন্তরঙ্গ আরও দুই যোদ্ধা-বন্ধু এসেছে রানার ডাক পেয়ে। দরকার পড়লে জান দেবে বন্ধুর জন্য।

চতুর্থজন এক বাঙালি তরুণ। ওর বাপ-মা ছিল বাংলাদেশ আর্মির সার্জেন্ট। মারাও যায় প্রায় একইসময়ে, যদিও যুদ্ধে নয়, ক্যানসারে। তার আগে একমাত্র ছেলেটাকে তুলে দিয়েছিল রানার হাতে। সার্জেন্ট আলতাফ রেযা বলেছিল, 'স্যর, ওর বুদ্ধি আছে, যদি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ওকে একটা চাকরি দিতেন।'

রামিন রেযা ফিযিক্সে অনার্স পাশ করবার পর ওকে নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়েছে রানা। আপাতত কাজ করছে রানা এজেন্সির এজেন্ট হিসাবে।

রানার ইচ্ছা: ওকে সুযোগ করে দেবে বিসিআই-এ।

গগলের কাছ থেকে দরকারী সব অস্ত্র বুঝে নেয়ার পর ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে রওনা হয়ে নানা পথে গুয়াতেমালায় ঢুকেছে চারজন, জড় হওয়ার পর দল বেঁধে ট্রাক নিয়ে হাজির হয়েছে এ শহরের বিশ মাইল দূরে, এসতেনসিয়া মিগুয়েরোর কাছে। মাঝ রাতের পর হাঁটতে শুরু করে পৌঁছে গেছে গন্তব্যে।

আপাতত সবাই যার যার পজিশনে।

'দেখছি, তবে আরও অনেক আসতে হবে ওদের,' মন্তব্য করল ফ্রান্সের গানম্যান, পেঁচা ব্রিয়া ফুলজেন্স। পেঁচা নামটা এসেছে ওর চশমার জন্য। একসময় মস্তান ছিল, গগলের কারণে ওই নোংরা পথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, আর রানার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ওকে মনে মনে মেনে নিয়েছে সত্যিকারের বন্ধু এবং ওস্তাদ হিসাবে।

'আমি পঞ্চাশ গজ আগে, মাঝের দুটো নেব,' জানিয়ে দিল সিম কর্নেলিস। দক্ষ মার্সেনারি সে, কয়েকবার মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে বলে রানার প্রতি ওর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়েও গভীর।

'আপনারা লেজ কেটে দিলে পেট থেকে ওপরের দিক আমার,

তারপর ইচ্ছে হলে মাথা কাটুন মাসুদ ভাই,' বলল রামিন রেযা।

সরু, খাড়া পথে স্ট্র্যাটেজিক কয়েকটা জায়গায় অস্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে ওরা।

'শালারা ক্রীতদাস পাবে ভেবে এখানে এসে হঠাৎ করেই রওনা হবে ঈশ্বরের কাছে, কিন্তু সেখানেও ঠাঁই নেই, বাধ্য হয়ে সেঁধিয়ে যাবে নরকে,' খুকখুক করে কাশল পেঁচা ফুলজেন্স।

'অসহায় মানুষকে ড্রাগসের মাঠে কাজ করাতে চেয়েছিল, তাই না?' বলল সিম কর্নেলিস, 'শালাদের নরকেও জায়গা হবে না।'

'প্রতিটা ট্রাকে দশজন করে, হাতে একে-৪৭,' জানিয়ে দিল ভিটেলা রেমারিক। 'দশ ট্রাকের আগে-পরে দুটো আর্মার্ড কার আসছে। তৈরি হয়ে নাও সবাই।'

'কনভয়ের পেছনে থেকে এস্কোর্ট করছে দুটো রাশান গানশিপ এমআই-৮,' সতর্ক হয়ে উঠেছে রানার কণ্ঠ। চট্ করে একবার দেখে নিল গ্রামের দিকে। আবার চোখ রাখল কনভয়ের উপর।

'শহরে কেউ নেই তো?' জানতে চাইল ফুলজেন্স। 'দু'একটা ওদিকে গিয়ে ফস্কে পড়তে পারে।'

'না, কেউ নেই,' জানিয়ে দিল রানা।

'কনভয়ের লেজ পেরিয়ে গেল, এবার নাস্তা হিসেবে পাবে আস্ত নরক,' বলল রেমারিক, 'জঙ্গলের এদিকের সব পাখি ভাগিয়ে দেয়ার সময় হলো!'

ওর প্রথম দুটো আরপিজি দশ সেকেণ্ডের ব্যবধানে দুই এমআই-৮ গানশিপের ককপিটে গিয়ে ঢুকল। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হলো দুনিয়ার অর্ধেকের বেশি দেশের সামরিক বাহিনী ওই হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। শক্তপোক্ত উড়োজাহাজ হিসাবে নাম আছে, কিন্তু পেটের ভিতরে গ্রেনেড ফাটলে তা হজম করবে, এমন কথা কাউকে দেয়নি নির্মাতারা। প্রলয়ঙ্করী আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো প্রথম হেলিকপ্টার, নানাদিকে ছিটকে গেল হাজারো টুকরো।

আগুনের মস্ত এক-কমলা বল ভুস্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল, ঝরঝর করে ঝরল ভাঙা যন্ত্রপাতি। বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ তুলে পথের উপর আছড়ে পড়ল জ্বলন্ত কাঠামো। দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের ভিতরে শক্তিশালী বিস্ফোরক ছিল, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতেই লক্ষ-কোটি টুকরো হলো এমআই-৮। ওটার ভারী সুপারস্ট্রাকচার পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে নেমে এল পিছনের আর্মার্ড কারের টারেটে। চেপ্টে যাওয়া তেলাপোকার মত হলো ভারী, মজবুত গাড়ি।

পিছনের দুটো ট্রাকে গিয়ে পড়ল পর পর চারটে আরপিজি। বিস্ফোরিত হলো জ্বলন্ত দুই ট্রাক, একটা কাত হয়ে পড়ল ডানদিকে, অন্যটা বামদিকে। ঝরঝর করে বেড থেকে ঝরে গেল কয়েকটা লাশ— বাঁচবার উপায় ছিল না কারও।

থেমে যেতে চাইল পরের দুটো ট্রাক, থেমে গেলও, কিন্তু তখনই পর পর চারটে গ্রেনেড পড়ল পিছনের বেডে। ব্রাশ ফায়ার শুরু হলো ট্রাকের বেড লক্ষ্য করে। বিশ সেকেণ্ড পর সামনের ট্রাকের ক্যাবের কাছে পৌঁছে গেল উদ্যত সাবমেশিনগান হাতে পেঁচা, লাফ দিয়ে উঠল ক্যাবের পাদানিতে। খোলা জানালা দিয়ে পাঠিয়ে দিল এক রাশ গুলি। একই সময়ে নরকে চলে গেল সামনের তিনটা লোক।

লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেই পিছনের ট্রাকের ক্যাব লক্ষ্য করে আরেকটা গ্রেনেড ছুঁড়ল ফুলজেন্স। তিন সেকেণ্ড পর চুর-চুর হলো ক্যাব। ভিতর থেকে ভলকে বেরিয়ে এল লাল আগুন। ট্রাকের পিছনের বেডের আহত কয়েকজন রাস্তার উপর পড়েছে, হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে শুরু করল।

সাবমেশিনগানের গুলিতে ফুটো হলো সিম কর্নেলিসের পাওয়া দুই ট্রাকের চাকা। তবে ট্রাক থামবার আগেই দুই যানের বেডের সামনের দিকের দেয়ালে লাগল দুটো দুটো করে চারটে আরপিজি।

এর কয়েক সেকেণ্ড পর দুই ক্যাব থেকে রাস্তায় ছিটকে নামল পাঁচ ডাকাত, আগেই বুঝে গেছে, পিছনের কেউ বেঁচে নেই। ট্রাকের এদিকের লোকগুলো ঝাঁঝরা হলো সাবমেশিনগানের গুলিতে। পা উড়ে গেল রাস্তার ওদিকের দুই লোকের। চারপাশ ভরে উঠল করুণ আর্তচিৎকারে।

রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে চুপ করে বসে আছে রামিন রেযা, হাতে সাবমেশিনগান, কিন্তু একটা গুলিও করল না— ওকে পাশ কাটিয়ে গেল ওর ভাগে পাওয়া ট্রাক দুটো। সামনে আরও দুটো ট্রাক ও আর্মার্ড কার।

'কী করছ, রামিন!' জানতে চাইল রানা, 'ওরা তো পেরিয়ে যাচ্ছে!'

'যাক-গে, মাসুদ ভাই, চুপ করে বসে থাকব,' গোঁয়ার বিশ্বাসঘাতকের মতই জানিয়ে দিল সে। আর সত্যিই আরপিজি বা সাবমেশিনগান তাক করল না শকটযানের দিকে। অবশ্য পাঁচ সেকেণ্ড পর পকেট থেকে ছোট, কালো একটা রিমোট কন্ট্রোল বের করে টিপে দিল লাল বাটন।

লাল-কমলা-হলুদ-নীল আগুনের মস্ত এক ফুটবল তৈরি হলো সামনের চারটে ট্রাক ঘিরে। যে ভয়ঙ্কর আওয়াজ হলো, তাতে মনে হতে পারে শুরু হয়েছে দুনিয়া জুড়ে কেয়ামত। অন্তত চল্লিশজন মার্সেনারিসহ বিস্ফোরিত হয়েছে চারটে ট্রাক।

'আর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ছিল না, সরি, মাসুদ ভাই,' জানিয়ে দিল রামিন। 'এবার আর্মার্ড কার সামলে নিন!'

'দেখছি,' বলল রানা। বুঝে গেছে, কী করেছে রামিন। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ এবং সময় থাকলে ওই একই কাজ করত ও নিজেও। সাগরেদের কীর্তিতে বুক ভরে গেল রানার গর্বে। এত দক্ষ বন্ধুরাও ভাবেনি কাজে আসতে পারে ওই বিস্ফোরক। কাজেই সঙ্গে আনেনি। আর রাতে ট্রাক রেখে সামান্য বিশ্রামের সময়ে উধাও

হয়েছে রামিন। এসতেনসিয়ায় গিয়ে সামনের চারটে ট্রাকে বোমা বসিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছে।

'গাড়ি থামা, শালা ড্রাইভারের বাচ্চা!' ধমকে উঠল ডগসন। 'কোথায় গেল দুই হেলিকপ্টার! আকাশে এত ধোঁয়া কীসের!'

'আর বিস্ফোরণের আওয়াজের কথা বাদ দিলেও তো চলবে না,' বলল লোপেয। 'আমার মনে হয় শালারা ডেকে এনেছে আস্ত সেনাবাহিনী!'

'লোপেয!' আর্মার্ড কারের টারেট থেকে চিলকণ্ঠে বলল ডগসন, 'লাফ দাও! কোন্ শালা যেন আরপিজি মেরেছে। ওই যে উপর থেকে আসছে!'

পিছনে ধূসর লেজ নিয়ে ছুটছে রানার নিক্ষিপ্ত রকেট।

'লাফ-লাফ-লাফ!' লোপেযের জন্য অপেক্ষা করেনি ডগসন, থেমে পড়া আর্মার্ড কারের টারেট থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়, উঠেই পাঁই-পাঁই করে ছুটল জঙ্গলের দিকে। এক সেকেণ্ড পর পথে নেমেছে লোপেয, কিন্তু এক দৌড়ে ডগসনকে পিছনে ফেলে ঢুকে গেল ঝোপঝাড়ের মাঝে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আকাশে ছিটকে উঠল আর্মার্ড কারের টারেট। বিধ্বস্ত গাড়ির ভিতরে আগুনে ঝলসে মরল আহত ড্রাইভার।

সরু, খাড়া পথের দেড় শ' গজ জুড়ে শুধু পোড়া হেলিকপ্টার, গাড়ি বা ট্রাক, চড়-চড় শব্দে সব পোড়াচ্ছে লাল আগুন।

জঙ্গলের মাঝে অগভীর একটা নালার ভিতর শুয়ে পড়েছে ডগসন ও লোপেয। ঘুরে চাইল। আর্মার্ড কারের আগুনের গনগনে তাপ লাগছে এত দূর থেকেও। হতবাক হয়ে রাস্তা আর পোড়া সব জঞ্জালের দিকে চেয়ে রইল ওরা।

কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে বলল ডগসন, 'কিছুই বুঝতে

পারছি না। ওরা এল কোত্থেকে?'

'গুয়াতেমালান আর্মি না, নইলে আগেই খবর পেত এলেনা,' বলল লোপেয।

'আর এখানে থাকা ঠিক না,' ক্রল শুরু করে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে চলল ডগসন।

'রাত নামার আগে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে,' বলল লোপেয।

'ঠিক,' সায় দিল ডগসন। 'পিছু নাও, সরে যেতে হবে।'

'যাব কোথায়?'

'এসতেনসিয়া মিগুয়েরো,' বলল ডগসন, 'এবার মাথা খাটিয়ে এলেনাকে ভাল কোনও গল্প শোনাতে হবে, নইলে তুলে নেবে পাছার ছাল।'

একের পর এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ আর ভলকে ভলকে ওঠা কালো ধোঁয়া দেখে একেবারে দমে গেছে সোহানার বুক। বাচ্চাসহ মাদের সাহায্য করছে। ভুলিয়ে রাখতে চাইছে শিশুদের মন। কিন্তু হু-হু করে কাঁদছে ওর নিজেরই মন।

সব আওয়াজ থেমে যাওয়ার পর দমফাটা কান্না এল ওর।

রানা নেই!

মানুষটার ওই মিষ্টি হাসি, মায়াভরা চোখ, আর কখনও...

'আমি আসছি!' বলেই ছুট দিল সোহানা, ঝড়ের বেগে নামতে লাগল খাড়া, সরু পথে। উন্মাদিনীর মত এসে দৌড়ে ঢুকল গ্রামে। থমকে গেল রাস্তার মাথায়। অনেকটা নীচে পোড়া সব যানবাহন। চোখে পড়ল জ্বলন্ত হেলিকপ্টারের কাঠামো। হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল।

কোথাও নেই রানা, আছে শুধু থমথমে নীরবতা। সোহানার বুকে উথলে উঠল ভীষণ কষ্ট। ঝরঝর করে নামল অশ্রু।

'বুঝি না মেয়েরা ভালবাসার মানুষ কাছে থাকলেও কেন কাঁদে,' সোহানার পাশ থেকে বলল কে যেন।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল সোহানা, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। পাগলের মত চুমু দিচ্ছে ঠোঁটে, গালে, নাকে, কপালে...

'ব্যস-ব্যস! রিযার্ভে কিছু রাখো,' হেসে ফেলল রানা। জড়িয়ে ধরেছে সোহানাকে।

'তুমি একটা পাগল!' কান্না আর খুশিতে রানার বুকে মুখ গুঁজল সোহানা।

'তা হলে ইনিই সোহানা,' মন্তব্যের সুরে বলল কে যেন। 'রানাই তা হলে জয় করে নিল দুনিয়া-সেরা সুন্দরী মেয়েটাকে? তা হলে আমাদের কী হবে?' উদাস কণ্ঠে বলল সিম কর্নেলিস, হাসছে।

'এঁরা দুনিয়া-সেরা মার্সেনারি, আপা,' বলল রামিন রেযা। 'আর আমি রামিন, কাজেই বুঝতেই পারছেন আমার আকার কত বড়?'

রানার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সোহানা। দেখে নিল মানুষগুলোকে। হাসি-হাসি মুখ সবার। কে বলবে একটু আগে এক শ' খুনি মেরে সাফ করেছে।

সবার সঙ্গে সোহানাকে পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

রামিন ছাড়া অন্যরা চট্ করে চুমু দিল সোহানার গালে।

বন্ধুকে বলল ভিটেলা রেমারিক, 'আমাদের কাজ তো শেষ, রানা, এবার দেরি না করে পালাতে হয়।'

'আটকে রাখব না,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'এখানে যা হলো, জানলেই সেনাবাহিনী আর পুলিশ বাহিনী পাঠাবে সরকার। তার আগেই এই দেশ ছেড়ে তোমাদের বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।'

'ইউরোপে এলে দেখা হবে,' বলল ফুলজেন্স, 'আর টেংরি ভেঙে দেব সোহানাকে ছাড়া এলে!'

'আর দু'জনের বিয়েতে বেস্ট-ম্যান হব আমি,' খুশি মনে বলল রেমারিক।

'হ্যাঁ, আমি বাদ যাই আর কী!' রাগী স্বরে বলল কর্নেলিস। 'তুমি রানাকে আগে থেকে চেনো বলে অন্যায় দাবি করতে পারো না।'

'সবাই বেস্ট-ম্যান হলে কেমন হয়?' জানতে চাইল রানা।

'মন্দ হয় না, তবে বিয়েটা সারতে হবে তাড়াতাড়ি,' সোহানার দিকে চেয়ে চোখ টিপল কর্নেলিস।

একবার রানার চোখে চেয়ে লজ্জা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল সোহানা।

খুবই সাবধানে গ্রামে এসে ঢুকেছে একদল মানুষ, গির্জার কাছ থেকে নীচের রাস্তায় চোখ পড়তেই হতবাক হয়ে গেল।

তাদের মাঝে রয়েছেন ডাক্তার প্যাডিয়ো।

তাঁদের শহরের কিছুই হয়নি, কিন্তু ড্রাগ লর্ডের মস্ত বাহিনী শেষ। অবাক চোখে রানাকে দেখলেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড পর ঢোক গিলে নিয়ে শুধু বললেন, 'কী করে?'

'আর ওই যে দূরে হেঁটে চলে যাচ্ছে, তারাই বা কারা?' জানতে চাইলেন ফাদার মার্টিন।

'ধরে নিন ওরা ঈশ্বরের দেবদূত,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

তেত্রিশ

পিকআপ ট্রাকের ক্যাবে আর্ট ডগসনের পাশে বসে তিক্ত সুরে বলল

অ্যাডেলমো লোপেয, 'মনে হচ্ছে বিমান থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে আমাকে এক হাজার ফুট নীচের রাস্তায়। কাঁধ-পিঠ টনটন করছে। কনকন করছে হাঁটু। মাথায় বেদম যন্ত্রণা। মানতে পারছি না যা দেখলাম।'

সামনের রাস্তায় চোখ রেখেছে ডগসন, বিরক্ত হয়ে বলল, 'অত নালিশ করতে এসো না! কপাল ভাল যে তামাক চাষীর পিকআপ চুরি করতে পেরেছি, নইলে হাঁটতে হতো বিশ মাইল। আমাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে। ফাঁদ পেতেছিল কেউ। কেউ না, একদল ইবলিশ। এক শ' মার্সেনারি মারা পড়েছে। সব অ্যামব্রোসিয়োর লোক। এর মানে বোঝো? আমাদেরকে ছাড়বে না ওই শালা। প্রথম সুযোগেই পালাতে হবে এই দেশ ছেড়ে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল লোপেয। 'এলেনাও ছাড়বে না।'

আধঘণ্টা পর এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে পৌঁছে গেল ওরা। ড্রাইভওয়েতে নেমেই টের পেল, হাজির হয়েছে বাড়ির মালিক এলেনা হিউবার্ট। ওই যে তার লাল মার্সিডিস। হিসাব বিভাগের প্রকাণ্ড অফিসঘরে বাতি জ্বলছে। আর ওই যে জানালায় এলেনা!

পিকআপ ট্রাক বাড়ির সামনে থেমে যেতেই দৌড়ে বেরিয়ে এল মেয়েটা। 'আপনারা এখানে কেন? হেলিকপ্টার ফেরেনি। ট্রাক আর আর্মার্ড কারও নয়। কী হয়েছে?'

ক্যাবের জানালা দিয়ে এলেনার দিকে চাইল ডগসন। 'আমরা ওই শহর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। ইণ্ডিয়ানগুলোকেও সরিয়ে নেয়া হয়নি। শহরের কাছে অ্যামবুশ করা হয়েছে। মারা পড়েছে বেশিরভাগ মার্সেনারি। জানে বেঁচেছে মাত্র কয়েকজন। তাদেরকে আবার বন্দি করা হয়েছে।'

'হেরে গেছেন? এক শ' সৈনিক নিয়ে? একদল চাষার কাছে?' ক্রমেই বিস্ময় বাড়ছে এলেনার। কয়েক সেকেণ্ড পর তিক্ত সুরে বলল, 'আপনারা এটা কী করলেন? শেষ করে দিলেন আমার সব

আশা-ভরসা?'

চট্ করে পরস্পরকে দেখে নিল ডগসন ও লোপেয, আড়ষ্ট দেহে নেমে পড়ল পিকআপ ট্রাক থেকে। ফেণ্ডারে হেলান দিল লোপেয, আর এলেনার উদ্দেশে বলল ডগসন, 'আমরা সত্যিই দুঃখিত, মিস হিউবার্ট। আমাদেরকে ভয়ঙ্করভাবে ঠকানো হয়েছে। গ্রামের লোক নয়, হামলা করেছিল একদল দক্ষ সৈনিক। মিসাইল মেরে আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছে হেলিকপ্টার, রকেট ছুঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে ট্রাক আর আর্মার্ড কার। আমাদের কিছুই করার ছিল না।'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার গনগনে রাগ টের পেল এলেনা। ভয় পেয়ে গেল, এবার বুঝি ওর উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটা। বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, বুঝে গেছে মস্ত বিপদে পড়েছে।

'আমার মনে হয় এখানে আমাদের আর কোনও কাজ নেই,' বলল ডগসন। 'কয়েক মিনিট পর রওনা হব। আপনার ভাল হোক, এ ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। চললাম আমরা।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

'এক মিনিট,' ডাকল এলেনা। 'সরি, আর্ট, ওভাবে আপনাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। দয়া করে রাগ করবেন না। জানি, বোকার মত রেগে গিয়েছিলাম। আবারও বলছি, সরি। বুঝতে পারছি, আপাতত কিছুই আমাদের পক্ষে যাচ্ছে না। কিন্তু চিন্তা করবেন না, ঠিকই এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

বিস্ময় নিয়ে মেয়েটার দিকে চাইল লোপেয ও ডগসন।

'ওই লোকগুলোকে ধার নেয়া হয়েছিল অ্যামব্রোসিয়োর কাছ থেকে,' বলল এলেনা। 'এখন যদি আপনারা পালিয়ে যান, আর আমি তাকে বলি কী হয়েছে, খুন করে ফেলবে সে আমাকে। তারপর খুনি লেলিয়ে দেবে আপনাদের পেছনে। কোথাও পালাতে পারবেন না। ভুলে গেছেন, সে ড্রাগ প্রডিউসার ও স্মাগলার?

ইউরোপ আর আমেরিকায় কানেকশনের অভাব নেই। বুঝতেই পারছেন; পালাবার উপায় নেই। এবার বুদ্ধি করে চলতে হবে। তাকে খুব ভাল কিছু খবর দিতে হবে, তারপর ধীরেসুস্থে জানাতে হবে খারাপ সংবাদ। এখন যদি আপনারা হাল ছেড়ে দেন, আমরা তিনজনই শেষ হয়ে যাব।'

'এই মস্ত দুর্যোগের পর আর কী বলার থাকে?'

'আমি দ্বিগুণ করে দেব আপনাদের টাকা। আর ওই মায়ান সাইটের আর্টিফ্যাক্ট থেকে যা পাব, তার ভাল একটা পার্সেন্টেজও দেব। ওই কোডেক্সে লেখা আছে ওই দুর্গের কথা। শেষ লড়াইয়ের জন্যে ওখানে জড় হতো সবাই। আর তার মানে, সবাই যখন যেত, যার যা আছে, সব নিয়ে যেত ওখানে। শত্রুদের জন্যে নিশ্চয়ই কিছুই ফেলে যেত না? নিশ্চিত থাকতে পারেন, ওখানে আছে সাত রাজার ধন।'

'মিস হিউবার্ট,' বলল ডগসন, 'আজ এক শ' লোক শেষ হয়ে গেছে। কাজেই পুলিশ ডেকে আনবে গ্রামের লোক। কাউকে না কাউকে ওইসব খুনের জন্য গ্রেফতার করবে পুলিশ। আমাদের ছাড়বে কেন? আমরা দু'জনই ওই হামলাকারীদের দলের নেতা ছিলাম। তার ওপর আমরা বিদেশি।'

'এ-ও জানি না কোথা থেকে এসে সবাইকে খুন করে গেল ওই লোকগুলো,' যোগ করল লোপেয।

দু'দিন পর হাতে হ্যাণ্ডকাফ ও পায়ে বেড়ি দিয়ে আর্মির ট্রাকে তুলে দেয়া হলো আর্ট ডগসন ও অ্যাডেলমো লোপেযকে। বাজে রাস্তায় খটর-খটর আওয়াজ তুলে ট্রাক চলল গুয়াতেমালা সিটি লক্ষ্য করে।

লোপেযের কানে ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে ডগসন: 'ভাল হলো সরাসরি নিয়ে যাচ্ছে রাজধানীতে। পচতে হবে না

কোনও বিভাগীয় জেলে। উকিলদেরও ছয় মাস লাগবে না সরকারী অফিসের ঝামেলা পার করে আমাদের কেস আদালতে তুলতে। একবার গুয়াতেমালা সিটিতে পৌঁছুলেই জামিনের ব্যবস্থা করবে এলেনা। একরাত জেলে থাকতে হতে পারে। বা বড়জোর দু'রাত। যেসব অপরাধে গ্রেফতার করেছে, সবই ভুলে যাবে সরকারী অফিসাররা ঠিকভাবে ঘুষ পেলেই। সব ঝামেলা মিটতে বড়জোর দশ দিন। আর সত্যিই যদি ওরা জানত এলেনার হয়ে কী-কী করেছি, বাকি জীবনে আর দিনের আলো দেখতাম না।'

'এটা ভাল হয়েছে যে পালিয়ে গেছে অ্যামব্রোসিয়ো। এটাও আমাদের পক্ষে যাবে।'

'তা ঠিক। তবে সুযোগ পেলে ছাড়বে না। ভয়ঙ্কর ঘৃণা করে সে আমাদের। আর আমি আমেরিকান বলে আরও বেশি। আমাকে অপছন্দ করেছে সৈনিকরাও। তুমি স্থানীয়দের মত দেখতে, কথাও বলো স্প্যানিশ, সবাই ভাববে তুমি আসলে গুয়াতেমালান।'

'অপরাধ যদি বড় হয়, বিদেশি হলে বরং বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। সবাই ভাববে তুমি কাজ করো আমেরিকান সরকারের হয়ে, তাই সহজে ফাঁসি দিতে চাইবে না কর্তৃপক্ষ।'

'এ দেশের সেরা সব উকিলকে নিয়োগ করবে এলেনা,' বলল ডগসন। 'কসম কেটে বলেছে। দরকার হলে নিজের সব টাকা ঢালবে।'

'ওই মেয়ে এটাও বলেছিল, গ্রেফতারই করা হবে না,' বলল লোপেয। 'এখন গ্রেফতার তো করেইছে, তার ওপর শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে।'

এ কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ডগসন, তারপর বলল, 'অ্যামব্রোসিয়োর পোষা মার্সেনারিরা তো প্রায় শেষ। এবার এলেনা আমাদের বের করে না নিয়ে গেলে ওর খবর আছে।'

'খবর আমাদেরও আছে,' বলল লোপেয। 'যাওয়ার পথে

সবসময় একজনকে জাগতে হবে, নইলে দু'জনকে ঘুমের ভেতরে বাগে পেলে বাকি শালারা খুন করবে আমাদেরকে।'

ট্রাকে বসে মাইলের পর মাইল পিছনে যাওয়া রাস্তা দেখতে লাগল ডগসন ও লোপেয। আহত মার্সেনারিদের দিকে মনোযোগ দিল না ডগসন। নোংরা লোকগুলোর চোখে গভীর ভয়। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গা থেকে আসছে ঘামের বোটকা গন্ধ। কিন্তু যখন চোখ পড়ছে ডগসনের চোখে, খেপে উঠছে জলাতঙ্ক ধরা কুকুরের মত।

আবার এলেনা হিউবার্টের দিকে মন দিল ডগসন। কল্পনায় দেখল, মেয়েটার পরনে সাদা সিল্ক ব্লাউস, কোমরে কালো স্কার্ট, পায়ে হাঁটু সমান বুট। দুই শ' বছরের পুরনো ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার উপর ঘুরছে ফ্যান। পনি টেইল করেছে সোনারঙের চুলগুলোকে। একটা চুলও ছাড়া নেই। বামহাতে স্পর্শ করছে হীরার দুল; অন্য হাতে ফোন, চুপ করে শুনছে ওদিকের কথা। দরকার পড়লে ওর সব টাকা, ক্ষমতা আর সুনাম কাজে লাগাবে ওদের দু'জনকে ছুটিয়ে নিতে। সরকারী অফিসারদের অদ্ভুত বা অকল্পনীয় কিছু বলবে, আর বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না তাদের। যেমন, ডগসন আর লোপেয আসলে নিরীহ দুই আমেরিকান কর্মচারী, চাকরির খোঁজে এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। আপত্তি তুলবে না কেউ। দেরি না করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর এলেনার ব্যক্তিগত বিমানে চেপে আরাম করে আমেরিকায় পৌঁছে যাবে ওরা। যেসব মস্ত ঝুঁকি ওরা নিয়েছে ওই মেয়ের জন্য, তারপর ওর কৃতজ্ঞ না হয়ে উপায়ই নেই আসলে।

চৌত্রিশ

এই মুহূর্তে প্রকাণ্ড মিগুয়েরো ভবনের বেডরুমে বসে আছে একা এলেনা হিউবার্ট। পরনে সাদা ব্লাউস, কালো জ্যাকেট, কোমরে কালো প্যান্ট। ব্রিটিশ কাস্টমসের মুখোমুখি হতে হবে, কাজেই বাছাই করে সেরা মুক্তার সেটের গহনা পরে নিল গলা ও কানে। কর্তৃপক্ষ একবার দেখলেই বুঝবে এসব কতটা দামি। মুক্তাগুলো পাওয়া গিয়েছিল আরব সাগরে চোদ্দ শতাব্দীতে। ভারত লুটপাটের সময় বহু কিছুর সঙ্গে এগুলোও দখল করেছিল ওর পরিবার।

দুনিয়ার গাধা ওই ব্রিটিশ কাস্টম্‌স্ অফিসারগুলো, ভাবল এলেনা। তবে বোকা হলেও বুঝতে পারে, কত অভিজাত ও ধনী পরিবারের মেয়ে ও, কাজেই ভুলেও টুকটাক আইনের কথা তুলে বিরক্ত করে না।

এবার ইংল্যাণ্ডে ফিরবার জন্য বিশেষ গোছগাছ করেনি এলেনা। বেশিরভাগ জিনিস রয়ে গেছে ওর ক্লসিট ও সিন্দুকে। শুধু গুছিয়ে নিয়েছে দরকারী কিছু জিনিস। চওড়া, পুরু, বড় জুয়েলারি বক্স, কয়েক বাণ্ডিল পাউণ্ড, প্লাস্টিকের বাক্সে মায়ান কোডেক্স আর টুকটাক কিছু। সবই এঁটে গেছে মাত্র একটা সুটকেসে।

ওটা ঠেলে সিঁড়ির কাছে চলে এল সে। পাশের টেবিল থেকে ঘণ্টি তুলে বাজাতেই দৌড়ে উঠে এল ডোরম্যান। এলেনার পিছনে বয়ে নিয়ে চলল সুটকেস।

সিঁড়ি বেঁয়ে নামতে নামতে একবার ভাবল এলেনা, লোকটা যদি জানত ওই সুটকেসে আছে দশ মিলিয়ন ডলারের গহনা,

আর্টিফ্যাক্ট আর টাকা, হয়তো বিনা দ্বিধায় ওকে খুন করে সব নিয়ে পালিয়ে যেত।

মৃদু হাসল ও। আসলে বেশি বিশ্বাস করতে নেই চাকরকে, বুঝতেও দেয়া উচিত নয়, এই মুহূর্তে কত বড় বিপদে আছে সে।

মার্সিডিসের পিছনের সিটে উঠল এলেনা। পিছনের ট্রাঙ্কে তুলে দেয়া হলো সুটকেস। শুকনো স্বরে বলল ও, 'এয়ারপোর্ট, ড্রাইভার।'

গুয়াতেমালা সিটির সড়কে বেরিয়ে এল দক্ষ ড্রাইভার। খুব সতর্কভাবে চালাচ্ছে গাড়ি। বাধ্য না হলে স্পর্শ করছে না ব্রেক। নীরবে পিছনে পড়ছে রাস্তা। এভাবেই গাড়িতে বসতে পছন্দ করে এলেনা। জানালার ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে শহর। খচ্ করে বুকে কাঁটা বিঁধল ওর। মায়ান কোডেক্স নিজের কাছে রাখতে পেরেছে, আর ওটা বোধহয় দুনিয়ার শেষ মায়ান কোডেক্স। ওটার কারণে গত কয়েকদিনে বিখ্যাত হয়ে উঠবার কথা ছিল ওর। ওয়্যারহাউস ভঁরে ফেলবার কথা ছিল সোনা আর দুর্মূল্য আর্টিফ্যাক্টে। কিন্তু কিছুই করা গেল না দুই ছোটলোকের অত্যাচারে।

এবার নিষ্কলুষ, নিরপরাধী মেয়ে বলে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে অ্যামব্রোসিয়োর কাছে। শতখানেক লোক হারিয়েছে সে। এবার দেখা হলে বলতে হবে, ওই লাঞ্চে আসা আর্ট ডগসনের ভুলেই শেষ হয়ে গেল এতগুলো মানুষ। লোকটা বলেছিল, চিন্তাই করবেন না, মিস হিউবার্ট, আমার ওপর ভরসা রাখুন। কোনও ঝামেলা হবে না। কোনও ঝুঁকিও নেব না। নিশ্চিন্তে থাকুন। অ্যামব্রোসিয়ো লোক দিলে সব নিয়ন্ত্রণে রাখব আমি।

আর কী করতে পারত এলেনা?

অসহায় এক মেয়ে, দুনিয়াদারী বোঝে না।

কে জানত আর্ট ডগসন ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা করছে!

কী বলবে মনে মনে রিহার্সাল দিল এলেনা। একটু পর সন্তুষ্ট

হয়ে নিজেকে এক শ'তে এক শ' দিল। মুচকি হাসল। যতই ড্রাগ লর্ড হোক আর যাই হোক, আর সব বোকা লোকের মতই অ্যামব্রোসিয়ো। নিজের রাগ ঝাড়বার জন্য কাউকে চাই তার। আর সেরকম মেয়ে এলেনা নয়, কাজেই সব রাগ পড়বে গিয়ে ডগসনের উপর। ওই লোকের জন্যই তো লাখ লাখ ডলার দিতে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে। নিজেকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে চোরের মত। স্মিত হাসল এলেনা। ভালই হলো, ডগসন বা লোপেযকে চার আনা পয়সাও দিতে হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল লাল মার্সিডিস, শেকল দিয়ে আটকে রাখা টার্মিনাল পেরিয়ে চলে এল ব্যক্তিগত জেট বিমানের হ্যাঙারের দিকে। ওই গাড়ি দেখে আগেই গেট খুলে দিয়েছে সশস্ত্র গার্ড। মার্সিডিস পেরিয়ে যাওয়ার পর আবারও বন্ধ করে দিল গেট। বাধা দেয়ার কিছুই নেই, এত দামি গাড়ি করে এসে বিমানে বোমা মারবে কোন্ সন্ত্রাসী!

এলেনাকে নিয়ে নির্দিষ্ট হ্যাঙারে চলে এল ড্রাইভার।

এরই মাঝে বিমান বের করবার কাজে লেগে পড়েছে কর্মীরা। প্রিফ্লাইট চেকে ব্যস্ত পাইলট জনসন জেমার। ফিউয়েল দেয়া শেষ করে আরেক বিমানের দিকে চলেছে ফিউয়েল ট্রাক। বিমানের জানালার ওপাশে দেখা গেল এলেনার স্টুয়ার্ড ফিলিপকে। ব্যস্ত হয়ে রেফ্রিজারেটার ও বারে রাখছে খাবার ও পানীয়।

মার্সিডিস থেমে যেতেই ড্রাইভারকে বলল এলেনা, 'কমপক্ষে এক মাস থাকছি না। আগামী মাসের বেতন দিয়ে দেয়া হবে তোমাকে। দরকার পড়লে তখন ডাকা হবে।'

'ইয়েস, ম্যাম,' দরজা খুলে দিয়ে পিছনের ট্রাঙ্ক খুলল লোকটা, বের করে আনল সুটকেস। নিয়ে গেল বিমানের কাছে।

সুটকেস বিমানে তুলল স্টুয়ার্ড ফিলিপ। যত্ন করে রেখে দিল ক্লসিটে। ঘুরে বলল, 'ম্যাম, আপনি কি কোট দেবেন?'

'নাও,' জ্যাকেট খুলে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল এলেনা।

মাত্র কয়েক মিনিট পর বন্ধ করে দেয়া হলো কেবিনের দরজা। ট্যাক্সিং শুরু করে রানওয়েতে বেরিয়ে এল পাইলট।

পরের পাঁচ মিনিটে আকাশে উঠল বিমান। জানালা দিয়ে নীচে চেয়ে ছোট সব বাড়ি দেখল এলেনা। ওর মনে হলো, পিছনে ফেলে এল গত ক'দিনের হতাশা, তিক্ততা ও ক্রোধ।

আরও উপরে উঠছে বিমান। ঢুকে গেল সাদা মেঘের রাজ্যে।

নিজেকে হালকা মনে হলো এলেনার। লণ্ডনের বাড়িতে ফিরছে। ভাল লাগবে বাবার সঙ্গে দেখা হলে। মানুষটা নিজের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দিয়ে আগলে রাখবেন ওকে। আসলে, লণ্ডন মানে লণ্ডনই, তার কি তুলনা আছে?

হয়তো দারুণ মজা লাগবে ওখানে সময় কাটাতে।

বিভাগীয় শহর ফ্রেইজানেসের গম্ভীরদর্শন, প্রকাণ্ড প্যাভোন জেলখানার সামনে ট্রাক থামতেই অস্ত্রের মুখে নেমে এল বন্দিরা।

'আমি তো কোনও উকিল দেখছি না,' বলল লোপেয।

'আসবে-আসবে,' বলল ডগসন, 'আমাদেরকে এই কারাগারে পচতে দেবে না এলেনা হিউবার্ট।'

সৈনিকরা তাড়া করে পাঠিয়ে দিল বন্দিদেরকে মস্ত উঁচু গেটের ওপাশে। দেয়ালের উপর রেযর ওয়্যার দেখে মুখ শুকিয়ে গেল লোপেযের, ফিসফিস করে সঙ্গীকে বলল, 'এমন কী পুলিশও নেই, সবই সেনাবাহিনীর গার্ড! এ কারাগার বোধহয় অন্যরকম। এখানে পুলিশের বদলে অপরাধীদের দিয়েই সব কাজ করিয়ে নেয়া হয়!'

'চিন্তা কোরো না,' আশ্বস্ত করল ডগসন। 'আমাদের ছুটিয়ে না নিয়ে উপায় নেই এলেনা হিউবার্টের।'

'তাই যেন হয়,' বিড়বিড় করে বলল লোপেয। 'তবে যা-ই হোক, আমাদের নিজেদেরই বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

লণ্ডনের আকাশে পৌঁছে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে এলেনা হিউবার্টের ব্যক্তিগত বিমান। একটু পর পৌঁছে গেল শহরের দক্ষিণের বিগিন হিল এয়ারপোর্টে। মসৃণভাবে রানওয়েতে নামল বিমান, গুড়গুড় আওয়াজ তুলে চলল ফ্লাইট লাইনের উদ্দেশে। ওখানে নামতে দেয়া হয় শুধু যাত্রীদের। বিমান থেমে যেতেই চাকাগুলো গোঁজ দিয়ে আটকে দিল কর্মীরা, ইলেকট্রিকাল গ্রাউণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো গ্রাউণ্ডিং ওয়্যায়ার। নীচের দিকে নামিয়ে দেয়া হলো সিঁড়ি।

খোলা হ্যাচ দিয়ে শীতল, ভেজা ব্রিটিশ হাওয়া পেল এলেনা। সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আর তখনই বিমানে এসে ঢুকল ব্রিটিশ কাস্টমসের লোক। এলেনার কাস্টমস ডিক্লারেশন সংগ্রহের জন্য দরকারী ফর্ম পূরণ শুরু করল স্টুয়ার্ড ফিলিপ। বরাবরের মতই বাবার জন্য পঞ্চাশটা কিউবান সিগার এনেছে এলেনা। সবমিলে খরচ তিন শ' পাউণ্ডের কম। বিমানে আছে মাত্র দুই লিটার মদ।

কাস্টমস অফিসারদের নেতা বলল, 'ওই সুটকেস কি আপনার, মিস?'

'হ্যাঁ...' দ্বিধা করল এলেনা। হঠাৎ করেই শুকিয়ে গেল গলা। জ্বলছে চোখ।

'ভেতরে কী আছে দেখতে পারি?'

সাধারণত কাস্টমসের লোক ঘেঁটে দেখতে চায় না সুটকেস। নামকরা মস্ত বড়লোক পরিবারের মেয়ে এলেনা, সবাই জানে বোমা বা কোকেন নিয়ে দেশে ঢোকেনি। একবার ওর মন চাইল বলতে, 'আগে তো কখনও আপনারা সুটকেস দেখতে চাইতেন না!' মুখে কিছুই বলল না। বুঝতে পেরেছে, বিপদে পড়েছে।

সুটকেস নিয়ে বিমানের ছোট, ফোল্ডিং টেবিলের উপর রাখল হেড কাস্টমস অফিসার। খুলে দেখল জুয়েলারি বক্স, বুঝে গেল

স্প্যানিশ ট্রেজার গ্যালিয়নের চেয়ে বেশি আছে ওখানে। সরিয়ে রাখল কয়েক বাণ্ডিল টাকা। এই জিনিসের অভাব নেই এ মেয়ের। থাকতেই পারে। কিন্তু... ওটা কী?

প্লাস্টিকের বক্স খুলল অফিসার, দেখল প্রাচীন ফিগ বাকলের কী যেন। ভিতরে আবার কীসব রঙিন ছবি! প্লাস্টিকের বাক্স বন্ধ করল সে। সহজ সুরে বলল, 'মিস হিউবার্ট, আমার ভুল না হয়ে থাকলে ওটা সত্যিকারের মায়ান আর্টিফ্যাক্ট— কোডেক্স।'

ব্রিটিশ কাস্টমস অফিসকে আগেই জানানো হয়েছে রানা এজেন্সি থেকে, তারা নজর রাখছে এক আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালের উপর— এবং যে-কোনও দিন দুর্মূল্য এক মায়ান কোডেক্স নিয়ে এ দেশে ঢুকবে এলেনা হিউবার্ট নামের এক প্রতারক মেয়ে।

অফিসারের চোখে চেয়ে এলেনা বুঝল, এ শিক্ষিত লোক। এই কোডেক্স আসলে নকল বা কপি বলে পার পাওয়া যাবে না।

এই লোক ভাল করেই জানে জিনিসটা কী।

তিনঘণ্টা পর এলেনার বাবার বিখ্যাত উকিলবাহিনী উদ্ধার করল ওকে। আইনের সব প্যাঁচ জানা আছে তাদের। বেআইনী জিনিস নিয়ে এসেছে বলে আপাতত দেশ ছাড়তে পারবে না এলেনা। কর্তৃপক্ষ বুঝে নিয়েছে ওর পাসপোর্ট। তার চেয়েও অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, তারা কেড়ে নিয়েছে এলেনার অমূল্য কোডেক্স। আর হিস্টরিকাল ট্রেজার সরানোর অপরাধে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ওর বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। কোডেক্স ফেরত দেয়া হবে মেক্সিকান সরকারের কাছে।

এলেনার বাবার উকিলদের নেতা, সেরা ব্যারিস্টার মাইকেল এগেল কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ওকে সরিয়ে নিল, গিয়ে তুলল তার লিমাযিনে। শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল গাড়ি। বিমর্ষ সুরে বলল এলেনা, 'মাইকেল, আমি খুব ক্লান্ত। আপাতত বাড়ি গুছিয়ে নেয়ার সাধ্য নেই। সোজা আমার বাবার বাড়িতে নিয়ে চলো।'

'কিংসব্রিজের বাড়িতে?' আস্তে করে মাথা নাড়ল উকিল। 'সরি। উনি বলেছেন তোমাকে বলতে, এ মুহূর্তে ওখানে যাওয়া চলবে না। আজ ওই বাড়িতে ডিনার থ্রো করেছেন, নামকরা অনেকেই আসবেন।'

'ও,' মুখ শুকিয়ে গেল এলেনার। 'তার মানে আমাকে দেখতে চাইছেন না তিনি।'

'তা নয়, এলেনা,' বলল এগেল। 'তুমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়াও, কিন্তু লণ্ডনের জঙ্গলে বাস করতে হয় তোমার বাবাকে। নীরবে তোমাকে সাহায্য করবেন তিনি। আর তা ছাড়া, ওই পার্টিতে থাকবে সাংবাদিকরা।'

'বুঝলাম।'

এবার ড্রাইভারকে বলল মাইকেল এগেল, 'তুমি মিস এলেনার ব্রম্পটনের বাড়িতে চলো।'

পঁয়ত্রিশ

রোববার গুয়াতেমালান আর্মি উপস্থিত হলো স্যাণ্টা মারিয়া দে লস রকাসে। সোমবার শহর থেকে সামান্য দূরে এক ভুট্টা খেতের পাশে নামল একটা হেলিকপ্টার। ওটা থেকে নেমে পড়ল কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায।

শহরের অনেকেই এসেছে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে। আর তাদের মাঝে রয়েছে রানা ও সোহানা। ওদের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কমাণ্ডার, তবে সে কিছু বলবার আগেই রানা বলল, 'খুশি হলাম আপনাকে দেখে। হঠাৎ এখানে, কমাণ্ডার?'

কাঁধ ঝাঁকাল যুবক অফিসার, হেসে ফেলল। 'লণ্ডনে মায়ান কোডেক্সসহ ধরা পড়েছে এলেনা হিউবার্ট। কাজেই একদল ক্ষমতাশালী লোক সরে গেছে তাদের অবস্থান থেকে। এই বিভাগের সেনাবাহিনীর অ্যাকটিং কমাণ্ডার করা হয়েছে আমাকে।'

'কংগ্র্যাচুলেশন্স,' হেসে বলল সোহানা। 'এবার কী করবেন ভাবছেন?'

'এমন ব্যবস্থা নেব, যাতে করে সাধারণ যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। আপাতত আমার সৈনিকরা আছে এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে। ড্রাগসের মাঠ নষ্ট করছে। ওদিকে গুয়াতেমালা সিটিতে ওই মেয়ের বাড়ি আর অফিস সার্চ করছে আরেকদল। এরই ভেতরে জানা গেছে, আর্কিয়োলজিকাল সাইট নষ্ট করছিল সে।'

'মুখ থাকল না ওই মেয়ের,' বলল সোহানা।

'আপনারা কি এখনও আদালতে সাক্ষ্য দেবেন?' জানতে চাইল কমাণ্ডার। 'উপকৃত হব।'

'খুশি মনে,' বলল রানা। 'এই সুযোগে আবারও ঘুরতে পারব আপনাদের সুন্দর দেশের প্রত্যন্ত এলাকায়।'

'আমাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এ শহরের সবাই,' বলল সোহানা। 'কারিগর দিয়ে সুন্দর সোনার চাবিও গড়ে দিয়েছে শহরে ঢুকবার জন্য। যদিও গেট নেই।'

'ভেরি গুড!' হাসল কমাণ্ডার।

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই ফাদার মার্টিন আর ডাক্তার প্যাডিয়োর সঙ্গে,' বলল রানা। দুই ভদ্রলোকের দিকে ফিরল। 'ইনি সাহসী আর সৎ অফিসার কমাণ্ডার রিকো আন্দ্রিয়ায। ইনি ভাল করেই জানেন এ এলাকার সমস্যা কী ধরনের। আশা করি, আপনারা শীঘ্রি বুঝবেন সৎ অফিসার থাকলে আইনের এদিক ওদিক হয় না।'

'ঈশ্বর আপনার ভাল করুন,' বললেন ফাদার মার্টিন।

ডাক্তার প্যাডিয়ো বললেন, 'সেনোরা রানার কাছে আপনার কথা শুনেছি।'

ছোট মিলিটারি স্যালিউট দিল আন্দ্রিয়ায। 'আপনাদের কথা আমিও শুনেছি সেনর রানার কাছ থেকে। আপনারাই তো রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ড্রাগসের বিরুদ্ধে। আপনাদের সাহসিকতার তুলনা হয় না। গুয়াতেমালার সবার তরফ থেকে বলতে পারি, আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

মনোযোগ অন্য দিকে চলে গেছে সোহানার, আঙুল তুলে দেখাল দীর্ঘ পথের দিকে। বহু দূরে দিগন্তে দেখা গেল ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘ। 'ওই যে দেখো, ওদিকে আগুন ধরেছে!'

ওদিক দেখল কমাণ্ডার আন্দ্রিয়ায, তারপর বলল, 'আমার লোক এসতেনসিয়া মিগুয়েরোতে গিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ড্রাগসের গাছ। ওরা জানিয়েছে, সত্যি ওখানে পপি, গাঁজা আর কোকা গাছের চাষ হচ্ছিল। আদালতে প্রমাণ করার মত সবই পাওয়া গেছে।' ফাদার মার্টিন ও ডাক্তার প্যাডিয়োর কাছ থেকে বিদায় নিল সে। ফিরল দুই এইডের দিকে। 'এবার যাওয়া যাক। বহু কাজ পড়ে আছে।' হাতের ইশারা করল রানা ও সোহানার উদ্দেশে। 'আসুন, কথা বলতে বলতে হেলিকপ্টার পর্যন্ত যাই।' ওরা হাঁটতে শুরু করবার পর বলল, 'একটা কথা বলে রাখি, দুই সপ্তাহ আগে যেসব মার্সেনারিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে পালিয়ে গেছে দু'জন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল দুই পুরনো কয়েদীর, কিন্তু তাদেরকে খুন করে নিজেরা বেরিয়ে গেছে। ধারণা করছি, এ দেশ থেকে পালিয়ে গেছে ওরা।'

'চোখ খোলা থাকবে আমাদের,' বলল রানা।

ওদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে হেলিকপ্টারে উঠল কমাণ্ডার। রোটরের দমকা হাওয়ার ধুলো শুরু হওয়ার আগেই সরে এল রানা

ও সোহানা।

সেল ফোনে সালমা আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই, বলুন,' ওদিক থেকে বলল সালমা। নিজেই বলল, 'ডক্টর আক্তার রশিদ পৌঁছাননি?'

'ডক্টর রশিদ? তাঁর কি আসার কথা?'

'হ্যাঁ। গত শুক্রবার পরীক্ষা শেষ হয়েছে ছাত্রদের। বলছিলেন এবার দেরি না করে ওই সাইটে যাবেন।'

'তা হলে যে-কোনও দিন দেখা হবে।'

নতুন ইঞ্জিন বলে অনায়াসেই উঠে যাচ্ছে খাড়া পথ বেয়ে ল্যাণ্ড রোভার, কনভয়ের শুরুতে প্রথম গাড়িতে আছেন ডক্টর আক্তার রশিদ। মাত্র এক মিনিটে ফুরিয়ে গেল খাড়াই পথ, কনভয় উঠে এল উঁচু পাহাড়ি শহরে। চার্চের প্রাঙ্গণে থামল গাড়িগুলো। লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন প্রফেসর।

অপেক্ষা করছিল রানা ও সোহানা, কিন্তু ওরা কিছু বলবার আগেই প্রায় দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে ওদের হাত ধরলেন ভদ্রলোক, মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ব্রাভো, ইয়ং ম্যান, লেডি! গুয়াতেমালা সিটিতে পৌঁছেই শুনেছি কী করেছেন! আপনাদের সত্যিই তুলনা হয় না!'

জবাবে স্মিত হাসল সোহানা। 'আপনার কলিগরা বোধহয় চমকে যাবেন। গ্রামবাসীরা রাজি হয়েছে ওই সাইট আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাতে। তবে এখনই যেতে পারবেন না। আপনাদের জন্যে পথ সহজ করার কাজে ব্যস্ত ওরা।'

'এটা কী করে সম্ভব করলেন?' মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

'ওরা বুঝতে পেরেছে, ওদের বাপ-দাদার কবর নষ্ট করবেন না আপনারা, তাঁদের প্রতি কোনও অন্যায়ও করা হবে না,' বলল রানা। 'ফাদার মার্টিন, ডাক্তার প্যাডিয়ো আর কয়েকজন বয়স্ক নাগরিক মিটিং ডেকেছেন। ওখানে বলা হবে, এখানে মিউযিয়াম

হলে হাজার হাজার টুরিস্ট আসবে, জমে উঠবে নানান ব্যবসা, ফলে দূর হবে সবার দারিদ্র্য।'

ছত্রিশ

লণ্ডনের বাড়িতে থাকতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছে এলেনা হিউবার্ট। গুয়াতেমালা সিটিতে সবসময় সবার মনোযোগের কেন্দ্র ছিল ও। ইউরোপের শহরগুলোতেও। রোম, এথেন্স, বার্লিন, প্রাগ... যেখানেই গেছে, ওকে দাম না দিয়ে পারেনি কেউ। কিন্তু আদালতের অন্যায় নির্দেশের ফলে এখন কোথাও যেতে পারছে না। বৃষ্টিভরা, শীতল, ভেজা লণ্ডনে থাকতে হচ্ছে বন্দি হয়ে। তার চেয়েও খারাপ দিক আছে। ওকে উষ্ণভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না লণ্ডনের সামাজিক পরিবেশে।

গত কিছু দিন ধরেই পিছনে লেগেছে সাংবাদিকরা। যেখানে গেছে, ওকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে, ও অন্যের রেজিস্ট্রি করা শহর দেখিয়ে নাম করতে চেয়েছিল। চুরি করেছে কোডেক্স, আর ওটার মাধ্যমেই হানা দিয়েছে নানা সাইটে।

শুরুর দিকে এসব ছিল শুধু জল্পনা-কল্পনা। তারপর অনেকেই বলতে লাগল, মধ্য আমেরিকায় ড্রাগস ব্যবসার সঙ্গে ও জড়িত। তখন থেকেই ওর দেয়া পার্টিতে কমে যেতে লাগল বন্ধু-বান্ধবী। আর এখন একজনও আসতে চায় না। ওর সঙ্গে মিশলে লোকে মন্দ বলবে, কাজেই সরে গেছে সবাই। এলেনা যেন হয়ে উঠেছে অচ্ছুত। অথচ, মাত্র কয়েক মাস আগেও পার্টি দিলে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্যে ওর পা ধরতে রাজি ছিল কমপক্ষে এক শ' বন্ধু।

দরজার পাশে টাঙানো মস্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল এলেনা। আটকে নিল নীল কোটের বোতাম। এসব বোতাম খাঁটি সোনার। আর কোট তৈরি অষ্টাদশ শতাব্দীর নেভাল অফিসারের ইউনিফর্মের অনুকরণে। পাশ ফিরে আয়নায় আবারও নিজেকে দেখল এলেনা। খারাপ লাগছে না দেখতে।

দেরি না করে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু যাওয়া হলো না কোথাও, কারণ কপাল মন্দ, কপাল ভেদ করল .৩০৮ ক্যালিবারের একটা বুলেট, বেরিয়ে গেল মাথার পিছন দিয়ে। এত জলদি মরে গেল মগজ, রাইফেলের গুলির আওয়াজও শুনল না এলেনা।

রাইফেলের স্কোপের মাঝ দিয়ে মেয়েটাকে চিত হয়ে পড়তে দেখল আর্ট ডগসন। আবার বুজে আসতে শুরু করল ভারী দরজা, কিন্তু পুরো বন্ধ হলো না এলেনার এক গোড়ালি বেরিয়ে আছে বলে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, কেউ বেরিয়ে গিয়েও আবারও ভিতরে ঢুকে কী যেন নিতে চেয়েছে।

ধীরেসুস্থে রাইফেল নামিয়ে রাখল ডগসন। খুশি মনে জানালা লক করে দিল লোপেয। টেনে দিল পর্দা। ঝটপট রাইফেল খুলে ফেলল তার সঙ্গী, রেখে দিল সুটকেসে। ব্যস্ত পায়ে পিছনের স্টেয়ারকেস বেয়ে নেমে এল ওরা। কিচেন পার হয়ে বেরিয়ে এল বাগানে। মাঝ সকাল, পাশের রাস্তায় একের পর এক গাড়ি, ফুটপাথে পথচারী, কিন্তু রাইফেলের সাইলেন্সারের কারণে কেউ শোনেনি কী হয়ে গেছে।

এই বাড়িটা বিক্রির চেষ্টা করছে মালিক। রাস্তার উল্টো দিকে এলেনা হিউবার্টের বাড়ি। এসব বাড়ির দাম কমপক্ষে চার মিলিয়ন পাউণ্ড। মাত্র এক ঘণ্টা এদিকের বাড়িতে ছিল ডগসন ও লোপেয, হাতে ছিল রাবারের গ্লাভস, কাজেই কোথাও নেই ওদের আঙুলের

ছাপ।

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রাস্তায় চলে এল ডগসন। নিজের শপথ ভুলেছিল এলেনা হিউবার্ট, কাজেই তাকে পেতে হয়েছে উপযুক্ত শাস্তি। খুশি মনে মোড়ে রাখা গাড়িতে উঠল ডগসন, ড্রাইভিং সিটে বসল লোপেয। এক মাইল যাওয়ার পর থামল, আর সে সুযোগে ট্র্যাশ ক্যানে রাইফেলের টুকরো ফেলল ডগসন।

ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছবার পর মেন'স-রুমে পোশাক পাল্টে নিল ওরা। টিকেট কেটে উঠে পড়ল প্যারিসগামী হলদে মস্ত ইউরোস্টার ট্রেনে। তিনঘণ্টা লাগবে গন্তব্যে পৌঁছতে, কিন্তু অসুবিধা নেই। ওরা নিয়েছে প্রিমিয়াম ফার্স্ট ক্লাস টিকেট, আরাম করে যেতে পারবে গোটা পথ। আর গুয়াতেমালার কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবার পর ওদের মনে হয়েছিল, দুনিয়ায় ওটার চেয়ে খারাপ আর কোনও জায়গা হতেই পারে না।

ধীর গতি নিয়ে লণ্ডনের মাঝ দিয়ে চলল ট্রেন। শহরতলী পেরিয়ে বাড়ল গতি। একঘণ্টা পর ইংলিশ চ্যানেলের তলার সুড়ঙ্গে ঢুকল রেলগাড়ি। আঁধার হয়ে গেল জানালার বাইরেটা।

ডগসন ও লোপেয চোখ বুজে বসে আছে, কাজেই দেখল না প্যাসেজওয়ে থেকে ওদেরকে দেখছে রোনাল্ডো ফাইফি। অবাক হয়ে ভাবল সে, অ্যালবার্ট অ্যামব্রোসিয়োর কথা। সত্যি কি এই দুই লোকের কারণে শেষ হয়ে গেছে এক শ'র বেশি লোক? আর শালারা এখানে ইউরোপে এসে মৌজ মারছে! তা মারুক। ওরাই খতম করেছে এলেনা হিউবার্টকে, নইলে কষ্ট করে খুন করতে হতো তাকে।

ডগসন ও লোপেযের কম্পার্টমেন্টের আরেক পাশে এসে বসল রোনাল্ডো ফাইফি। খুলে ফেলল ব্রিফকেসের ডালা, ভিতর থেকে বের করল সিযেড পি-০৭ ডিউটি পিস্তল। উঁচু সাইটের কারণে নলের মুখের সাইলেন্সারের উপর দিয়েও দেখা যায় দূরে। তিন

সেকেণ্ড পর দুই বদমাশের বুকে দু'বার গুলি করল ফাইফি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও দুটো গুলি করতে চাইল মাথায়। তখনই দ্বিতীয় লোকটা স্প্যানিশে বলে উঠল, 'কে তুমি? কেন আমাদেরকে খুন করছ?'

'কেন খুন করছি?' হাসল ফাইফি, 'টাকার জন্যে।' ট্রিগার টিপে দিল সে। ডানদিকের লাশের হাতে ধরিয়ে দিল পিস্তলটা। হাঁটতে শুরু করে চলে গেল দূরের কম্পার্টমেন্টে। একটু পর গ্যাখে দু নর্দে পৌঁছবে ট্রেন। ওখানে নিশ্চিন্তে নেমে পড়বে ফাইফি।

সাঁইত্রিশ

সভা বসল স্যান্টা মারিয়া দে লস রকাসের গির্জায়। সভাপতি রইলেন ফাদার মার্টিন। বক্তৃতার শেষে বললেন, 'তোমরা তো পুরনো দুর্গের বিষয়ে আর্কিয়োলজিস্টদের সব কথাই শুনলে, এবার কাগজে লিখে ফেলোঃ "হ্যাঁ" বা "না"। সব কাগজ ফেলবে এই বাক্সে।'

লাইন করে এসে ভোট দিল সবাই। কাজটা শেষ হতে কাগজ গুনতে হাত লাগালেন ফাদার মার্টিন, ডাক্তার প্যাডিয়ো এবং এ শহরের নতুন মেয়র জেইম সালাযার। দেখা গেল, প্রায় সবাই চেয়েছে রাজাদের সমাধি উন্মোচন করুন ডক্টর আক্তার রশিদ।

পরদিন সকালে সাতটার সময় এক্সপিডিশন টিম নিয়ে ফাদার মার্টিনের সঙ্গে দেখা করলেন প্রফেসর রশিদ। অপেক্ষা করছেন শহরের গণ্যমান্যরা। দেরি না করে অধিত্যকার সরু পথে চলল সবাই।

হাঁটতে হাঁটতে ফাদার বললেন, 'ডক্টর রশিদ, সেনর রানা আপনাকে সবই খুলে বলেছেন, কিন্তু আরও কিছু ব্যাপার জানিয়ে রাখি। আপনি তো জানেন, ওই দুর্গকে পবিত্র জায়গা মনে করে ওরা। আর ওখানে যাঁরা শুয়ে আছেন, তাঁদেরকে শহরের সবাই মনে করে অতি আপন। তাঁরা ওদের পূর্বপুরুষ। আর তাঁরাই ছিলেন কাছের মস্ত শহরের মালিক। লড়াই করেছিলেন সাত শ' নব্বুই খ্রীষ্টাব্দে তিরিশ মাইল দূরের আরেক প্রকাণ্ড শহরের বিরুদ্ধে। যখন বুঝলেন লোকবলে তাঁরা অনেক কম, সেরা সৈনিকদের হাতে তুলে দিলেন নিজেদের মূল্যবান সবই। সরিয়ে রাখা হলো ওই পুরনো দুর্গে।'

'অর্থাৎ বেছে নেয়া হয়েছিল ওই জায়গা শেষ লড়াইয়ের জন্যে?'

'সঠিক ধরেছেন। আর নীচের ওই চার্চের জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল নজরদারীর জন্যে কেল্লা। যুদ্ধ বেধে গেলে সবাইকে নিয়ে উপরের অধিত্যকায় চলে যেতেন রাজা। ওখান থেকে লড়ত সবাই। কেউ মারা গেলে ওখানেই কবরের ব্যবস্থা হতো। কবরের সঙ্গে দেয়া হতো মানুষটার সব মূল্যবান জিনিস— অস্ত্র, গহনা... সবই।'

'তার মানে ওখানে আছে ক্লাসিক আমলের লড়াইয়ের সব কিছু?'

'হ্যাঁ, সবই রয়ে গেছে ওসব সমাধিতে। ওরা চায় না কিছু সরিয়ে ফেলা হোক। আপনি এবং আপনার সঙ্গের মানুষগুলোকে ঘুরে দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, কারণ মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে ওরা। কাজেই আশা করব, আপনারাও ওদের রাজাদের সমাধিকে সম্মান করবেন।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রফেসর।

কিছুক্ষণ পর অধিত্যকায় পৌঁছে গেল সবাই।

'এসব সমাধিতে শত শত মায়ান কোডেক্স পাবেন,' মুখ খুললেন ফাদার। 'আমি অবশ্য দেখেছি মাত্র কয়েকটা। এত উচ্চতার কারণেই নষ্ট হয়নি। আরেকটা কারণ, সে আমলে সব রাখা হয়েছিল আঠা দিয়ে বন্ধ হাঁড়ির ভেতর। ওরকম আছে এক শ' বেয়াল্লিশটা কোডেক্সের হাঁড়ি।'

রানা-সোহানা যে সমাধিতে প্রবেশ করেছিল, সেখানে ফাদার মার্টিনের পর ঢুকলেন প্রফেসর রশিদ। রাজার কঙ্কাল, জেড পাথর ও সোনার বিপুল গহনা দেখে হাঁ হয়ে গেলেন তিনি।

'আসুন, সরিয়ে ফেলতে হবে কঙ্কালের ডালা,' বললেন ফাদার, 'আগেও এ কাজ করা হয়েছে, কেউ কিছু মনে করবে না।'

ফাদার মার্টিন, ডক্টর রশিদ এবং রানা খুব সাবধানে তুলল ভারী ডালা, সরিয়ে রাখল। ঢাকনি নেই, ফলে দেখা গেল সরু সিঁড়ি।

'মহিলা হিসাবে প্রথমে নামার অধিকার সেনোরা রানার,' বললেন ফাদার।

সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামতে লাগল সোহানা। একপাশ থেকে ফ্ল্যাশলাইট ফেললেন ডক্টর রশিদ।

একে একে নেমে এল ওরা পাতাল-ঘরে।

তিন ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝিকিয়ে উঠল পেটানো সোনা— সবই প্রমাণ আকারের দেবতা, মানুষ ও জানোয়ারের মূর্তি। আরও আছে অসংখ্য ব্রেস্টপ্লেট, মুকুট, ব্রেসলেট, অ্যাঙ্কলেট, ইয়াররিং, নাকের গহনা।

ঘরটি বিশ ফুট বাই বিশ ফুট, বেশিরভাগ জায়গা ভরা সোনা ও সবুজ জেড পাথরের মূর্তি দিয়ে।

বেসুরো কণ্ঠে বললেন প্রফেসর রশিদ, 'আমি হতভম্ব! ভাবতে পারিনি মায়াদের রাজ্যে এমন কিছু থাকতে পারে!'

'একই জিনিস পাবেন অন্য রাজাদের সমাধিতেও,' বললেন

ফাদার। 'সে আমলে কোনও শহরের সঙ্গে লড়াই শুরু হলে রাজ্যের সমস্ত সোনা ও জেডের মূর্তি এনে রাখা হতো নীচের এসব ঘরে। এক এক করে সবই দেখবেন।'

'সত্যিই কি শহরের সবাই আমাদেরকে এসব পরীক্ষা করতে দেবেন?' কাঁপা সুরে বললেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ, দেবে,' বললেন ফাদার। 'দেবে, কারণ সেনর-সেনোরা রানার কাছে ওরা চিরকালের জন্যে ঋণী। কখনও ভুলবে না ওদেরকে নতুন জীবন দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের কথা শুনেই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ওরা।'

'তাদের কী বলেছেন, রানা?' রানার দিকে ঘুরে জানতে চাইলেন প্রফেসর।

জবাবটা দিল সোহানা, 'আমরা কথা দিয়েছি, স্যাণ্টা মারিয়া দে লস রকাসে মান-সম্পন্ন জাদুঘর তৈরির জন্যে ওদের সাহায্য করব। এই শহর থেকে কিছুই সরিয়ে নেয়া হবে না গুয়াতেমালা সিটিতে। যোগাযোগ করা কঠিন হয়েছে, তবে শেষে এ বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আমাদের প্রস্তাবে কোনও আপত্তি নেই তাঁর।'

'এবার গোটা দুনিয়ার মানুষ জানবে এখানে কী আছে,' বলল রানা, 'অভাব বলতে কিছুই থাকবে না এ এলাকায়।'

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

আনিস-উজ-জামান, মোবা: ০১৭৭২-৬৮৬২০২
২৯২ উত্তর গোড়ান, সিপাইবাগ, ঢাকা ১২১৯।

প্রিয় কাজীদা,

চিঠির শুরুতে সালাম, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নেবেন। সম্প্রতি সেবা'র *বাউণ্টি হান্টার্স* ১, ২, *পার্শিয়ান ট্রেজার* ১, ২, *সেই কুয়াশা* ১, ২, *গুপ্ত আততায়ী* ১, ২ (মাসুদ রানা সিরিজ), *তিন গোয়েন্দা ভলিউম* ১৩১/২, ১৩২, অনুবাদ *দি আইভরি চাইল্ড, হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং, ফিনিশ্‌ড়,* ওয়েস্টার্ন *একা, লোভের ফাঁদে, ভবঘুরে,* হরর *ওরা আসে নিঝুম রাতে* এবং *কুয়াশা ভলিউম* ১৩, ১৬ পড়লাম। কাজীদা, বইগুলো অসামান্য। পড়ে এত ভাল লাগল যে, প্রশংসা করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে এই সুন্দর, অসাধারণ বইগুলো আপনারা লেখেন!

কাজীদা, আমার কয়েকটি অনুরোধ: (১) প্রতি মাসে নতুন অনুবাদ, হরর, রহস্য উপন্যাস, শিকার কাহিনি বের করুন। (২) সোহানা ও গিলটি মিয়াকে মাসুদ রানা সিরিজে যেন নিয়মিত পাই। (৩) কিশোর, মুসা, রবিনকে ঘন-ঘন বাংলাদেশে আনুন।

সেবা'র সকল লেখককে ঝিঙে, কদম ও হলুদ গোলাপের শুভেচ্ছা।

❋ সেবা'র বইগুলো আপনার অসাধারণ লেগেছে জেনে আমরা সবাই খুশি। আপনার অনুরোধ সব লেখককে জানিয়ে দিলাম। তাঁরা যদি প্রতি মাসে বই দিতে পারেন, ছাপতে আমাদের আপত্তি নেই।

ফরহাদ
রামপুরা, ঢাকা।
শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

আমার অন্যতম প্রিয় কাজ বইয়ের আলমিরা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখা। তা করতে গিয়ে রানার পুরানো বইয়ের আলোচনা বিভাগের চিঠিগুলো আবার পড়লাম, বেশ ভাল লাগল। রানার প্রতি পত্রলেখকদের ভালবাসা এবং ভাল লাগা ঠিক আমার মতই, কিন্তু কষ্ট লাগল তাঁদের অধিকাংশই এখন আর রানায় লেখেন না বলে। তাঁরা কেমন আছেন, জানতে ইচ্ছে করে। আপনারও কি করে, কাজীদা? ...আমার চিঠিগুলো পড়ে বেশ লজ্জাই পেলাম।

মৃত্যুদ্বীপ বরফের রাজ্যে অসাধারণ বিরতিহীন অ্যাকশনে ভরপুর অভিযান। পড়ার সময় চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লবদাকে ধন্যবাদ। *জাপানি টাইকুন* ২ ছিল সত্যিই চমৎকার ও গতিময়, তবে প্রথম খণ্ড ছিল একটু গতিহীন, কিন্তু প্রচ্ছদ দারুণ। ধন্যবাদ আরমান ভাইকে। খারাপ লাগছে আপাতত এটাই শেষ গল্প বলে। জে. ওয়েস্ট জুনি. সিরিজটা কি রানার উপযোগী? জানাবেন আশা করি। সব্বাইকে শুভেচ্ছা। কাজীদা, সুস্থ ও ভাল থাকুন সবসময়।

❋ অতীতের কথা বলে আপনি আমাকে নস্টালজিক করে ফেলেছেন। সত্যিই, তাদের ভাল লাগা ও ভালবাসায় ঠাসা চিঠিগুলোর কথা ভাবলে বুকের ভেতর কোথায় জানি টন-টন করে ওঠে। 'যেদিন গেছে সেদিন কি আর আসে!' –ভাবলে যেমন হয়, তেমনি। হ্যাঁ, আমারও জানতে ইচ্ছে করে তারা কে, কোথায়, কেমন আছে।

তবে নিজের চিঠি পড়ে কেন লজ্জা পেলেন, বুঝলাম না। আমার তো মনে হয় এত ভাল চিঠি খুব কমই আসে আমাদের হাতে। ...জে. ওয়েস্ট জুনি. পড়ে দেখলে বলতে পারব উপযোগী কি না। খুঁজব নেটে।

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

আজম খান
মীরপুর, ঢাকা।
প্রিয় কাজী আনোয়ার ভাই,

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, মাসুদ রানার *শুভ্র পিঞ্জর* বইয়ের শ্যারন চরিত্রটি ভাল লেগেছে, যে কানে শোনে না; লিপ-রিডিং করতে পারে। বিশেষ করে, শ্যারনের গ্রেগুলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং মাসুদ রানার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটি ভাল লেগেছে। এরকম আরও কিছু চরিত্র তৈরি করুন।

❋ চেষ্টা করব।